Dhaka University Institutional Repository

বাংলায় ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক নীতি

এম.ফিল ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক

মো: আতাউর রহমান বিশ্বাস
অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উপস্থাপক

নাসরীন সুলতানা
এম.ফিল গবেষক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, **“বাংলায় ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক নীতি”** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও একক মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমি এ গবেষণা পূর্ণ কিংবা অংশ বিশেষ কোথাও প্রকাশ করিনি।

নাসরীন সুলতানা
এম.ফিল গবেষক
রেজি নং: ২১৮
যোগদান-২৪/০৬/১৩

মো. আতাউর রহমান বিশ্বাস
অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০
ফোন:+৮৮ ০২-৯৬৬১৯২০২-৭৩

Md. Ataur Rahman Biswas
Professor
Department of Islamic History and Culture
University of Dhaka
Dhaka-1000
Phone: +88 02-96619202-73
E-mail: ataurbiswas@gmail.com

Ref............................ Date............................

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের এম.ফিল গবেষক নাসরীন সুলতানা কর্তৃক এম.ফিল ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত **“বাংলায় ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক নীতি”** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে এবং এটি একটি গবেষণালব্ধ মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতোপূর্বে কোথাও এবং কোন ভাষাতেই এই শিরোনামে এম.ফিল ডিগ্রির জন্য কোন গবেষণা সন্দর্ভ লিখা হয়নি। আমি গবেষণা অভিসন্দর্ভটির চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপিটি মনোযোগের সাথে পড়েছি এবং এম.ফিল ডিগ্রি প্রদানের জন্য বিবেচনাযোগ্য বলে মনে করছি।

মো: আতাউর রহমান বিশ্বাস
অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গ কথা

“বাংলায় ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক নীতি” নামক গবেষণা পত্র প্রণয়নে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধীনে (২০১২-২০১৩ শিক্ষাবর্ষ, রেজি নং: ২১৮) নিবন্ধন লাভ করি। গবেষণাকর্মে যারা আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সর্বপ্রথম সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি অত্র গবেষণা অভিসন্দর্ভের সুযোগ্য তত্ত্বাবধায়ক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক মো: আতাউর রহমান বিশ্বাস স্যারের প্রতি। তিনি অভিসন্দর্ভের বিষয় নির্ধারণ থেকে শুরু করে গবেষণা কর্মের শেষ পর্যন্ত অবিরাম উৎসাহ-উদ্দীপনা, অভিসন্দর্ভের বিভিন্ন অধ্যায় ও উপ অধ্যায় বিন্যাস, গবেষণা পদ্ধতি ও তথ্য সংযোজন প্রক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়ে আমাকে সুচিন্তিত মতামত, পরামর্শ ও মূল্যবান দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। অনেক ব্যস্ততার মাঝে তিনি তাঁর অতি মূল্যবান সময় দিয়ে অভিসন্দর্ভের প্রতিটি শব্দ স্বযত্নে পাঠ করে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমার্জন করে অভিসন্দর্ভটিকে এর অবয়ব ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিসহ প্রাণবন্ত স্তরে উন্নিত হতে নিরন্তর সহায়তা করেছেন। গবেষক হিসেবে আমি তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বিভাগীয় সিনিয়র প্রফেসর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য ড. আখতারুজ্জামান স্যার এর প্রতি যিনি আমাকে এম.ফিল ১ম বর্ষের ক্লাসে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্যিক নীতি এ বিষয়ে অনেক খুঁটিনাটি দিক গুলো স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরেছেন। অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সিনিয়র শিক্ষক অধ্যাপক আবদুল বাছির স্যারের প্রতি, তিনিও আমাকে এম.ফিল ১ম বর্ষের ক্লাসে এই গবেষণাকর্মের নানা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা দিয়েছেন। অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি বিভাগীয় সিনিয়র শিক্ষক প্রফেসর মোশাররফ হুসেন ভূঁইয়া, প্রফেসর ড. মো: ছিদ্দিকুর রহমান খান মহোদয়দের প্রতি যারা আমাকে সার্বিকভাবে সহায়তা করেছেন এই গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করার কাজে। এছাড়া আরও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি বিভাগীয় অন্যান্য সকল শিক্ষক, বিভাগীয় কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ যারা আমাকে সার্বিকভাবে সহায়তা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সবশেষে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার সন্তান ও আমার সন্তানের বাবার প্রতি যারা আমাকে বিভিন্নভাবে কাজ চালিয়ে যাবার জন্য সহযোগিতা করেছেন। সকল শুভানুধ্যায়ীর সম্মিলিত সহযোগিতার ফলেই আমার গবেষণাকর্ম সম্পাদন করা সম্ভব হয়েছে। তাই সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় **১-৭**

ভূমিকা ১

দ্বিতীয় অধ্যায় : বাংলার অবস্থান ও পরিচিতি **৮-৬৩**

২.১ বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান ৯

২.২ বাংলার নামকরণ ১১

২.৩ বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা ১৫

২.৪ বাংলার কৃষির সার্বিক অবস্থা ২৩

২.৫ বাংলার শিল্প ও বাণিজ্যিক অবস্থা ২৬

২.৬ বাংলার শিক্ষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা ৫৭

তৃতীয় অধ্যায় : ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী গঠন **৬৪-৯১**

৩.১ ১৬০০ সালের রাজকীয় সনদ ৬৫

৩.২ ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী গঠন অনুযায়ী প্রাথমিক সনদ সমূহ ৬৬

৩.২.১ ১৬০৯ সালের সনদ আইন ৬৬

৩.২.২ ১৬১৫ সালের সনদ আইন ৬৭

৩.২.৩ ১৬২৩ সালের সনদ আইন ৬৭

৩.২.৪ ১৬৫৭ সালের সনদ আইন ৬৭

৩.২.৫ ১৬৬১ সালের সনদ আইন ৬৮

৩.২.৬ ১৬৮৩ সালের সনদ আইন ৬৮

৩.২.৭ ১৬৮৬ সালের সনদ আইন ৬৮

৩.২.৮ ১৬৯৮ সালের সনদ আইন ৬৯

৩.২.৯ ১৭২৬ সালের সনদ আইন ৬৯

৩.২.১০ ১৭৫৩ সালের সনদ আইন ৭০

Dhaka University Institutional Repository

৩.৩ দেওয়ানি উত্তর ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সনদ সমূহ..৭০

৩.৩.১ ১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং এ্যাক্ট ৭০

৩.৩.২ ১৭৮১ সালের সংশোধনী আইন...৭৪

৩.৩.৩ ১৭৮৪ সালের পিটের ভারত শাসন আইন...৭৬

৩.৩.৪ ১৭৯৩ সালের সনদ আইন ৭৮

৩.৩.৫ ১৮১৩ সালের সনদ আইন ৮১

৩.৩.৬ ১৮৩৩ সালের সনদ আইন ৮৪

৩.৩.৭ ১৮৫৩ সালের সনদ আইন ৮৬

৩.৩.৮১৮৫৮ সালের গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া এ্যাক্ট ৮৮

চতুর্থ অধ্যায় : প্রাচ্যে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আগমনের প্রেক্ষাপট................. ৯২-১৩১

৪.১ প্রাচ্যে অন্যান্য ইউরোপীয়দের আগমন ৯৩

৪.১.১ পর্তুগিজ বণিকদের বাণিজ্য বিস্তার...৯৪

৪.১.২ ওলন্দাজ বণিকদের বাণিজ্য বিস্তার..১০০

৪.১.৩ ফরাসি বণিকদের বাণিজ্য বিস্তার ১০৮

৪.২ প্রাচ্যে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আগমন ১১৩

পঞ্চম অধ্যায় : বাংলায় ইলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রাথমিক বাণিজ্যিক কর্মকান্ড ১৩২-১৬৮

৫.১ ভারতে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক কর্মকান্ড...................................১৩৩

৫.২ বাংলায় ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা লাভ...১৪০

৫.৩ বাংলায় ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার.......................১৪৫

ষষ্ঠ অধ্যায় : ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক বিনিয়োগ ও প্রকৃতি ১৬৯-২০৬

৬.১ বিনিয়োগ কি ১৭০

৬.২ বিনিয়োগ পদ্ধতির বিবরণ... ১৭১

৬.৩ ব্যক্তিগত বা বেসরকারি ব্যবসা...১৯২

৬.৪ আর্থিক নিষ্ক্রমণ..১৯৬

৬.৫ সমালোচনা...২০০

সপ্তম অধ্যায় : বাংলায় ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক প্রভাবঃ ২০৭-২৩৬

৭.১ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব ২১০

৭.২ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব ২১৯

৭.৩ সামাজিক ক্ষেত্রে প্রভাব ২২৩

৭.৪ শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রভাব ২২৭

৭.৫ ধর্মীয় ক্ষেত্রে প্রভাব...২৩৫

অষ্টম অধ্যায়...২৩৭-২৪৭

উপসংহার ২৩৮

গ্রন্থপঞ্জি...২৪৮-২৭২

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

ভূমিকা

বাংলায় ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক নীতি শীর্ষক গবেষণা কর্মের মূলকেন্দ্র দক্ষিণপূর্ব এশিয়া বিশেষ করে বাংলা। 'বাংলা' বলতে আদিকাল থেকে ১৪০০ খ্রিষ্টাব্দ অর্থাৎ ইলিয়াস শাহী শাসনামল পর্যন্ত যে বিস্তৃত ভূ-খন্ডকে বোঝাতো তাই আমাদের আলোচ্য ভূ-খন্ড। এতদঞ্চলের জনগণ এক ভাষাভাষী এবং প্রায় অভিন্ন কৃষ্টি-সংস্কৃতির ধারক-বাহক হয়ে ও বাঙ্গালী নামে অতীতে পরিচিত ছিল না। মুসলিম শাসনামল (১৩৪১-৪২ খ্রি) থেকে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষা-ভাষী ভূ-ভাগ 'বাঙ্গালা' নামে পরিচিত লাভ করে। প্রথম দিকে এই ভূ-খন্ডের মধ্যে বিভিন্ন ভৌগোলিক নাম যেমন: উত্তর বাংলা বরেন্দ্র, লক্ষণাবতী ও পুণ্ড্রবর্ধন, উত্তর ও পশ্চিম বাংলার কিছু অংশ গৌড়, পূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব বাংলাকে বঙ্গ, সমতট ও হরিকেল এবং পশ্চিম বাংলা সূক্ষ্ম ও রাঢ় নামে সুপরিচিত ছিল। এই 'বাংলা' ভূ-খন্ডের বেশির ভাগ আবার প্রধানত গঙ্গা, ব্রক্ষপুত্র ও মেঘনা নদীবাহিত পলিমাটি দ্বারা গঠিত সমতল ভূমি।

বাংলা দক্ষিণ এশিয়ায় অবস্থিত ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ একটি দেশ। নদীমার্তৃক এ দেশের মাটি উর্বর হওয়ায় প্রাচীনকাল থেকে এদেশে বিভিন্ন রকম কৃষিপণ্য উৎপন্ন হতো। উৎপাদিত কৃষিপণ্যের মধ্যে ধান, আখ, নীল, রেশম, তুলা, তৈলবীজ ও বিভিন্ন প্রকার মসলা উল্লেখযোগ্য ছিল। প্রধান খাদ্য ধান এবং অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্য দেশীয় চাহিদা পূরণ করেও প্রচুর পরিমাণ বিদেশে রপ্তানি করা হতো। শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে সুতিবস্ত্র, চিনি, রেশমিবস্ত্র, পাটজাত দ্রব্য ছিল প্রধান। বাংলায় বিদেশ থেকে প্রধানত স্বর্ণ ও রৌপ্যের আমাদানি হতো। এছাড়াও মসলা, মূল্যবান পাথর, তৈজসপত্র, কাঁচের জিনিসপত্র, বিভিন্ন রকমের ফল প্রভৃতি আমদানির তালিকায় ছিল। চীন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ, পশ্চিম ভারত এবং মধ্য প্রাচ্যের সঙ্গে বাংলার সরাসরি বাণিজ্যিক লেনদেন হতো। পশ্চিম এশিয়া ও মিশর হয়ে ইউরোপীয় দেশগুলোর সঙ্গেও বাংলার ব্যবসা বাণিজ্য চলত। বাংলার এই ব্যাপক বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড বিদেশি বণিকদের কখনো ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করতে, কখনো বাণিজ্যিক আধিপত্য বিস্তারে, আবার কখনো বাণিজ্যিক উপনিবেশ তৈরি করতে এদেশে আসতে প্রলুব্ধ করে।

প্রাচীনকাল থেকেই বাংলার সঙ্গে ইউরোপের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল।[১] খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বাংলা তথা ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্য আরবদের নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে যায়। ফলে মসলা ও পাশ্চত্যের বিলাস সামগ্রীর সন্ধানে ইউরোপীয় বণিকদের বাংলা তথা প্রাচ্যে আগমনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ইউরোপীয় বিভিন্ন দেশের বণিক ও নাবিকরা প্রাচ্যে আগমনের নতুন পথ আবিস্কারের অনেক প্রচেষ্টা চালায়। ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করে দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত কালিকট বন্দরে অবতরণ করেন। তাঁর এ আগমনের মাধ্যমে পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রাচ্যের জলপথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এই পথ ধরে পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ইংরেজ, ফরাসি, দিনেমারসহ বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতি ভারতবর্ষ এবং প্রাচ্যের অন্যান্য দেশে আগমন করে। শুরু হয় প্রাচ্যের সাথে পাশ্চাত্যের সরাসরি ব্যবসা-বাণিজ্য। পর্তুগিজরা সবার আগে বাংলায় আগমন করে কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দী শেষ হবার পূর্বে তাদের শক্তি হ্রাস পায়। ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট শাহজাহান বাংলার প্রধান ঘাঁটি হুগলি থেকে পর্তুগিজদের বিতাড়িত করলে তাদের জায়গা দখল করে ওলন্দাজরা। তবে তাদের সমসাময়িককালে আগত ইংরেজরা ক্রমান্বয়ে তাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বি হয়ে উঠে।

ভারতীয় উপমহাদেশ তথা বৃটিশ ভারতের ইতিহাসে ইংরেজদের আগমন এক নব অধ্যায়ের সূচনা কার। বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আগমন করলেও পরবর্তীতে ইংরেজ বেনিয়ারা উপমাহদেশের রাজনীতিতে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ে। তৎকালীন স্থানীয় শাসক গোষ্ঠীর দূর্বলতা, বিভেদ, অযোগ্যতা, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ইংরেজদের অধিপত্য বিস্তারের পথকে সহজসাধ্য করে তোলে। বৃটিশ ভারতের তৎকালীন রাজনৈতিক অচলাবস্থার সুযোগ নিয়ে ইংরেজ বেনিয়ারা এক পর্যায়ে সঠিক ক্ষেত্রেই তাদের আধিপত্য চরম ভাবে বিস্তারে সক্ষম হয়। আর এ ক্ষেত্রে মূল নেতৃত্ব দেয় ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী।

চতুর্দশ শতাব্দীতে ইউরোপের রেনেসাঁ, অতঃপর শিল্প বিপ্লব ইউরোপীয় তথা ইংরেজদের মধ্যে অবিশ্বাস্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জাগরণ নিয়ে আসে। এই জাগরণের রেশ ধরেই নতুন ব্যবসা ক্ষেত্র খোঁজার প্রেক্ষাপটে কোম্পানীর এ উপমহাদেশে আগমন, এক পর্যায়ে বাংলাতেও এ বেনিয়া গোষ্ঠির আগমন ঘটে। বাংলা বাণিজ্যে কোম্পানী দাদনী প্রথা, এজেন্সি সিস্টেম, চুক্তি, ব্যবস্থা

---

[১] R.C. Majumdar, H.C. Raychaudhuri & Kalikinkar Datta, *An Advanced History of India* (London : Macmillan and Company Limited, 1963), P. 553.

(Contract system) ইত্যাদি নীতি প্রয়োগ করে স্বল্প সময়ের মধ্যে অভাবনীয় বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি লাভ করে এবং ক্রমেই বাংলা বাণিজ্যে কোম্পানীর পুঁজি বিনেয়োগ বাড়তে থাকে। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাপ্তি পর্যন্ত ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক পদচারণা, প্রতিষ্ঠা লাভ, বিনিয়োগ পদ্ধতি, বাণিজ্যিক বৈশিষ্ট্য এককথায় বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে পুরোপুরি কিভাবে আয়ত্ত্বে এনেছে এবং এর ফলে বাংলায় অর্থনৈতিক যে প্রভাব সৃষ্টি হয় তার উপর আলোকপাত করাই হবে এই গবেষণাকর্মের মূল উদ্দেশ্য। ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কার্যক্রম শুরু হয়। ১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে মুঘল সম্রাট ফররুখশিয়ারের কাছ থেকে ফরমান লাভের মাধ্যমে ইংরেজরা বাংলায় তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তিনটি পর্যায়ে বাংলায় তাদের বাণিজ্য কার্যক্রম শুরু করে। ১৬০০-১৭১৩ খ্রিঃ, ১৭১৩-১৭১৭ ফরুরুখশিয়ারের ফরমান এবং ১৭১৭-১৭৫৭ খ্রিঃ পলাশী যুদ্ধ পর্যন্ত। ২১৭ জন ইংরেজ বণিক নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী। রাণী এলিজাবেথের কাছ থেকে ১৫ বছরের সনদ নিয়ে আসে। যা ছিল নবায়ন যোগ্য, পুঁজি ৬৮ হাজার পাউন্ড, নাম “The Governor and Company of Merchants of London trading into the East indies” ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৬১৮ সালে ভারতে কুঠি স্থাপনের লক্ষ্যে প্রথম জেমস্ের একটি সুপারিশ নিয়ে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সাথে সাক্ষাৎ করে বাণিজ্যিক সুবিধা আদায়ের জন্য। ভারতীয় বণিক ও পর্তুগিজ বণিকদের বিরোধীতার কারণে অনুমতি দিতে বিরত থাকে। পরবর্তীতে ক্যাপ্টেন বেস্টের নেতৃত্ব ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী পর্তুগিজদের পরাস্থ করে সুরাটে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করার অনুমতি লাভ করে সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট থেকে। বাংলায় ইংরেজরা বাণিজ্য করার সুবিধা পায় সুবেদার শাহ্ সুজার আমলে। তারা ১৭৫১ সালে হুগলিতে একটি বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করে। এর পর থেকে বাংলায় বাণিজ্যিক বিনিয়োগ ক্রমাগত বৃদ্ধির মাধ্যমে তারা ইউরোপীয়দের মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দি বণিক হিসেবে আবির্ভূত হয়। এজন্যই হুগলিতে কুঠি স্থাপনের ঘটনাকে বলা হয় ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোর প্রথম মাইল ফলক।[২] ১৬৮৬-৯০ সালে এ্যাংলো মুঘল যুদ্ধের পর বাৎসরিক তিন হাজার টাকার শুল্ক প্রদানের শর্তে জব চার্নককে সূতানুটিতে বসতি স্থাপনের অনুমতি প্রদান করা হয়। ১৬৭২ সালে সম্রাট আওরঙ্গজেব নিযুক্ত গভর্ণর শায়েস্তা খান ইংরেজদের বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অনুমতি দেন। ১৬৯০ সালে জন চাইল্ড ভাগীরথী নদীর তীরে অবস্থিত

---

[২] সিরাজুল ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস: ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো* (১৭৫৭-১৮৫৭), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা-৩২।

সুতানুটি গোবিন্দপুর ও কালিকট নামে তিনটি গ্রাম কিনে নিয়ে কলকাতা নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। পাশাপাশি গোলকুণ্ডার প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র মসলিপট্টম, পাটনা, ঢাকা, রাজমহল ও মালদহ প্রভৃতি স্থানে ইংরেজরা বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে।

১৬৯৮ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারতে বাণিজ্য করার জন্য আরো একটি কোম্পানিকে অনুমতি দেয়। স্যার উইলিয়াম নরিমের নেতৃত্বে গঠিত হয় The New English East India Company। ভারতীয় উপমহাদেশে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রবল প্রতিদ্বন্দী রুপে আবিভূত হয়। এক পর্যায়ে এই দুটি কোম্পানী মিলে একটি যৌথ কোম্পানী গঠন করে যার নাম হয়। The Joint company of Merchants of England Trading into the East Indies. এই কোম্পানী ১৭০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম দূর্গ নির্মাণ করে। এই ফোর্ট উইলিয়াম দূর্গ পরবর্তিতে বাংলাসহ সমগ্র ভারতে কোম্পানীর আধিপত্য বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফররুখশিয়ার ফরমান দ্বারা ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বিনা শুল্কে অবাধে বাণিজ্য করতে থাকে ফলে বাংলায় তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে, রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে ভবিষ্যৎ সাম্রাজ্য স্থাপনে পথ উন্মুক্ত করার প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু বাংলার সুদক্ষ শাসক নবাব মুর্শিদকুলি খান (১৭১৩-২৭) তাদের এই অবাধ বাণিজ্য কার্যকর করতে অস্বীকৃতি জানায়। পরবর্তীতে সুবাদার সুজাউদ্দোলা খান (১৭২৭-৩৯) ও আলী বর্দী খান (১৭৪০-৫৬) তাঁর অনুসৃত নীতি চালু রাখেন। প্রত্যেক সুবাদার অতি কৌশলে কোম্পানীর সঙ্গে সরাসরি দ্বন্দ্ব এড়িয়ে চলেন। কিন্তু আলীবর্দী খানের মৃত্যুর পর ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী পুনরায় আধিপত্য স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু করে। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিদ্যমান থাকলে যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে বাংলায় ওলন্দাজদের শক্তি হ্রাস পায় এবং ১৭৫৯ খ্রিস্টাব্দে বিদারার যুদ্ধে (চন্দন নগর ও চুচুড়ার মাঝখানে) ইংরেজদের নিকট ওলন্দাজরা চুড়ান্তভাবে পরাজিত হয়ে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে চলে যায়। ওলন্দাজদের বিদায় গ্রহণে বাংলার বাণিজ্যে ইংরেজদের একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এক পর্যায়ে বাংলার রাজদণ্ড গ্রহণ করে এবং ক্রমান্বয়ে সমগ্র ভারতে প্রতিভূ হয়ে উঠে তারা সমগ্র ভারত বর্ষে ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা করে।

বাংলায় ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক নীতি বাংলা তথা বিশ্ব ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাংলা বাণিজ্যে অংশগ্রহণ এবং বাণিজ্যিক আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয় তা বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মারাত্মক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। এদেশীয় বণিকদের ব্যবসা বাণিজ্যের বিপুল ক্ষতি সাধিত

হয়। কালক্রমে তাদের ব্যবসায়িক মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হয়। তবে তাদের প্রভাবে এ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে নতুন গতি পায়। এ অঞ্চলের শিক্ষা-সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটে। বাংলার ইতিহাস মধ্যযুগের অবসান হয়ে আধুনিক যুগের সূচনা হয়। কৃষি ও শিল্প আধুনিকতার স্পর্শ পায়। তারা আমেরিকা ও আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে নতুন নতুন পণ্য দ্রবাদি আমদানির মাধ্যমে বাংলার সম্পদকে সমৃদ্ধি করে। বাংলা তথা ভারতসহ দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে নতুন নতুন অনেক শহর প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজ সরকারের প্রচেষ্টার ফলেই বাংলায় সর্বপ্রথম রেলপথ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাছাড়া বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ ও ডাক বিভাগের সংস্কারও তাদের দ্বারা সম্ভব হয়।[৩] বাংলার অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্য ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়।

বাংলায় ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক নীতি এ গবেষণার প্রধান লক্ষ। তবে এ বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো যেমন, ইউরোপীয় বণিকদের আগমনকালে বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা, প্রাচ্যে ইউরোপীয় বণিকদের আগমনের পটভূমি, বাংলা তথা প্রাচ্যে ইউরোপীয় বণিকদের বাণিজ্য বিস্তার, বাংলা বাণিজ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন জায়গায় ইউরোপীয় বণিকদের বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বীতা সংঘর্ষ, ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক কার্যকলাপ ও বিনিয়োগ পদ্ধতি এবং এসব বাণিজ্যিক কার্যকলাপের ফলে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব প্রভৃতি বিষয়গুলো যুক্ত হয়েছে, যাতে গবেষণার বিষয় একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করতে পারে। বাংলায় ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক নীতি বাংলার ইতিহাসের একটি গুরত্বপূর্ণ বিষয় হলেও প্রচলিত ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নেই। প্রায় প্রত্যেক ঐতিহাসিক ও গবেষক বাংলার ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সম্পর্কে আলোচনা করতে যেয়ে প্রসঙ্গক্রমে বাংলায় ইংরেজ বণিকদের আগমনের প্রেক্ষাপট, বাংলার শাসকদের নিকট থেকে বাণিজ্যিক সুবিধা সম্বলিত ফরমান লাভ এবং বাংলায় তাদের পতনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। অথচ এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভালভাবে ধারণা না থাকলে বাংলায় ইউরোপীয়দের বাণিজ্যের ইতিহাস সম্পর্কে জানা অপূর্ণাঙ্গ রয়ে যায়। সুতরাং বাংলায় ইউরোপীয় বণিকদের বাণিজ্যিক কার্যক্রম বিশেষ করে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক কার্যকলাপ ও এর প্রভাব আরো অধিক বিশ্লেষণ ধর্মী গবেষণা হওয়া যে প্রয়োজন তা অনস্বীকার্য। এ প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখেই গবেষণা কর্ম সম্পাদনা করা হয়েছে।

---

[৩] অতুল চন্দ্র রায়, *ভারতের ইতিহাস*, ১৭০৭-১৯৫০ (কলিকাতা : মৌলিক লাইব্রেরী, ১৯৮১) পৃ. ৩০৫।

গবেষণার জন্য মৌলিক এবং সহায়ক দুই শ্রেণীর উৎস ব্যবহার করা হয়েছে। মৌলিক উৎস হিসেবে প্রধানত সমকালীন বাংলায় আগত পর্তুগিজ, ইংরেজ, ওলন্দাজ প্রমুখ ইউরোপীয় এবং আরব, পারসিক ও অন্যান্য দেশীয় পর্যটকদের বিবরণী, এতদঞ্চলের পর্তুগিজ, ওলন্দাজ এবং ইংরেজ কুঠি ও বাণিজ্যকেন্দ্রসমূহ হতে প্রাপ্ত সরকারি ও ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, বাংলায় ইংরেজ ও ওলন্দাজ বণিকদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত তাদের সরকারের কাছ থেকে বিভিন্ন আদেশ-ফরমান ও নথিপত্র প্রধান উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। মৌলিক উৎস হিসেবে মধ্যযুগীয় বাঙালি কবি সাহিত্যিকদের রচিত সংশ্লিষ্ট কবিতা সাহিত্যও ব্যবহার হয়েছে। সহায়ক উৎস হিসেবে বিশ্বকোষ, প্রকাশিত অপ্রকাশিত থিসিস, আধুনিক ঐতিহাসিক ও গবেষকদের লিখিত বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থ, বই-পুস্তক এবং গবেষণামূলক প্রবন্ধ ব্যবহৃত হয়েছে।

অভিসন্দর্ভটিকে ৮টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন-২য় অধ্যায়ে বাংলার অবস্থান ও পরিচিতি, ৩য় অধ্যায়ে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর গঠন, চতুর্থ অধ্যায়ে প্রাচ্যে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আগমনের প্রেক্ষাপট, পঞ্চম অধ্যায়ে বাংলায় ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রাথমিক বাণিজ্যিক কর্মকান্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়ে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক বিনিয়োগ ও প্রকৃতি, ও সপ্তম অধ্যায়ে বাংলায় ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিশ্লেষণের সুবিধার্থে অধ্যায়গুলোকে একাধিক উপ-অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। শেষ অধ্যায়ে (উপসংহারে) গবেষণার সারসংক্ষেপ এবং লব্ধ অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলার অবস্থান ও পরিচিতি

যেহেতু এই অভিসন্দর্ভটির মূল উদ্দেশ্য বাংলায় ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক নীতি বিশ্লেষণ করা তাই শুরুতেই বাংলা বলতে অভিসন্দর্ভটিতে কোন অঞ্চলকে বোঝানো হয়েছে তা এ অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয়। তাছাড়াও ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আগমনের পূর্বে বাংলায় অর্থনৈতিক, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যিক, শিক্ষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা এ অধ্যায়ে অনুসন্ধান করা হয়েছে।

২.১ বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান

ইতিহাসের দৃষ্টিতে বাংলা ভূখন্ডের একটি আঞ্চলিক সত্তা ছিল এবং ভৌগোলিকগণ ও এই উপমহাদেশের ‘বাংলা’ কে একটি ভৌগোলিক অঞ্চল বলে অভিহিত করেন। প্রায় ৮০ হাজার বর্গমাইল বিস্তৃত নদীবিধৌত পলি দ্বারা গঠিত এক বিশাল সমভূমি এই বাংলা। এর পূর্বে ত্রিপুরা, গারো ও লুসাই পবর্তমালা, উত্তরে শিলং মালভূমি ও নেপালের তরাই অঞ্চল, পশ্চিমে রাজমহল ও ছোট নাগপুর পবর্তরাজির উচ্চভূমি ও পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর। দক্ষিণ এশিয়ার একটি সমৃদ্ধশালী দেশ বাংলা। এই বাংলা নাম ধারণের পূর্বে রয়েছে অনেক সময় ও অনেক ইতিহাস বহুল সময় এবং সব শেষে সব জনপদ একত্রিত হয়ে বাংলা নামকরণ হয়েছে। এই বাংলার পূর্বে অনেক জনপদ ছিল।[১] বাংলা, ভারত উপমহাদেশের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হলেও ভৌগোলিক দিক থেকে এর একটি আলাদা বৈশিষ্ট্য ছিল। এখানে কোন মরুভূমি, বড় পর্বত, মালভূমি বা উপত্যকা নেই। উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিমের সীমান্তে কিছুটা উচ্চভূমি বাদ দিলে বাংলার ভূ-প্রকৃতি মোটামুটি সমতল। এই বাংলা গঙ্গা, ব্রক্ষপুত্র ও এদের শাখা-প্রশাখা নদ-নদীর ব্যাপক পলি দ্বারা গঠিত বলে সমগ্র বাংলাকে পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ বা Delta বলা হয়। এর বেশিরভাগ ভূ-খন্ড নবসৃষ্ট। গঠন প্রকৃতি অনুসারে বাংলার অধিকাংশ ভূ-ভাগ অপেক্ষাকৃত নতুন বা নবভূমি হলেও পশ্চিমাংশে বেশ কিছুটা প্রাচীন বা পুরাভূমি রয়েছে। বাংলার পশ্চিমে রাজমহল, সাঁওতাল, পরগণা, মানভূমি, সিংভূমি, ধলভূমের জঙ্গলাকীর্ণ পাবর্ত্য অঞ্চল এই পুরাভূমির অর্ন্তগত। মেদিনীপুর-বাকুড়া-বর্ধমান-বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের লালমাটি অঞ্চলও পুরাভূমির অংশ। বাঁকুড়া-মেদিনীপুরের কিছু অংশ, রানীগঞ্জ আসানসোলের অংশ বিশেষ এই পুরাভূমিরই নিম্নাঞ্চল।

---

[১] জনপদের মূল অর্থ গোষ্ঠীর পদচারণ ভূমি অর্থাৎ যে ক্ষুদ্র অঞ্চলে বা এর পরিধির মধ্যে কোন গোষ্ঠী বা কয়েকটি গোষ্ঠী বসবাস করে তাই জনপদ। এক একটি জনপদ নদী অথবা প্রাকৃতিক সীমা দ্বারা সাধারণত চিহ্নিত করা হতো। প্রাচীনকালে বাংলা বারটি জনপদে বিভক্ত ছিল।

পার্বত্য অঞ্চল পর্যন্ত ব্যপ্ত হয়েছে লাল মাটির এই রেখা। উত্তর বাংলায় এই পুরাভূমির একটা অংশ অপর অংশের চেয়ে কিছুটা উঁচু। বগুড়া, উত্তর রাজশাহী, পূর্ব দিনাজপুর আর রংপুরের পশ্চিমাঞ্চল ব্যাপী অপেক্ষাকৃত উঁচু এই এলাকায় হল ইতিহাস প্রসিদ্ধ 'বরেন্দ্র ভূমি' কেন্দ্রস্থল। বাংলার পশ্চিম উত্তরাঞ্চলের পুরাভূমি এবং পূর্বে চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলের কিছু অংশ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ নবভূমি (New Alluvium) (গঙ্গা-পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও তাদের শাখা-প্রশাখা নদীসমূহের পলি দ্বারা গঠিত। পশ্চিমে লালমাটির বুক ভেদ করে নেমে এসেছে ময়ূরাক্ষী, অজয়, রূপনারায়ান ইতিহাস প্রসিদ্ধ কপিলা (আধুনিক কসাই) গঙ্গার বিভিন্ন উপনদী সমূহ। এদের জলে উর্বর হয়েছে পুরাভূমি সংলগ্ন সমতল ভূমি। রুশা লালমাটির স্থলে দেখা দিয়েছে স্তরে স্তরে জমে উঠা পলিতে উর্বর শস্য শ্যামল নবভূমি। উত্তরেও ঠিক পশ্চিমের মতই লালমাটি অঞ্চলকে ঘিরে আছে আত্রাই, মহানন্দা ও করতোয়ার জল আর পলিমাটি দিয়ে গড়া ভূ-ভাগ, আর পূর্ব বাংলায় সিলেটের পূর্বাঞ্চল, ময়মনসিংহের মধুপুর গড়, ঢাকার ভাওয়ালের গড়, পার্বত্য ত্রিপুরা, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর সমতল ভূমি অঞ্চল ও নতুন, যে জন্যই এ অঞ্চলকে বলা হয় নাব্য মন্ডল। মধ্য ও দক্ষিণ অঞ্চলেরও একই অবস্থা। সমুদ্রের নিকটবর্তী বিরতি অঞ্চল নদীর জলে নদী নালা খাল বিল জলাভূমি সমাকীর্ণ বৃক্ষশ্যামল, শস্যবহুল তাই ভূ-প্রাকৃতিক গঠন বৈশিষ্ট্যের আলোকে আর কে মুখোপাধ্যায়ের অনুসরণে এই ভূ-খন্ডকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়:

১. প্রাচীন ব-দ্বীপ অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ ও মধ্যবর্গ

২. গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র দোয়াব অঞ্চল অর্থাৎ উত্তরবঙ্গ

৩. নতুন ব-দ্বীপ অর্থাৎ দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ।

বাংলা দক্ষিণ এশিয়ায় অবস্থিত একটি সমৃদ্ধশালী দেশ। এদেশের মাটি ও মানুষ খুবই খাঁটি। নদীমাতৃক এদেশের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর। কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্প ও বাণিজ্যেরও বিকাশ সাধিত হয়েছিল। কৃষি ও শিল্পের প্রাচুর্যতা বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য বিশেষ করে বৈদেশিক বাণিজ্যকে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করেছিল। আমদানি ও রপ্তানি করা হতো বিভিন্ন রকম পণ্য-সামগ্রী। অর্থ ও সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল। এদেশের সম্পদ ও সমৃদ্ধির প্রাচুর্যতার বলে এখানে বিভিন্ন জাতি কখনো পর্যটক, কখনো বণিক, কখনো বিজেতা, আবার কখনো বা ঔপনিবেশিক শক্তি হিসেবে এদেশে এসেছিল। বিভিন্ন জাতির আগমনে ও প্রভাবে এদেশের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক

উন্নয়নের উত্থান পতনের সাথে সাথে এদেশের কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অনেক উত্থান-পতন ও বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়।

২.২ বাংলার নামকরণঃ

বাংলা বলতে আদিকাল থেকে ১৪০০ খ্রিষ্টাব্দ অর্থাৎ ইলিয়াস শাহী শাসনামল পর্যন্ত বিস্তৃত ভূ-খন্ডকে বোঝাতো। প্রথম দিকে এই ভূ-খন্ডের মধ্যে বিভিন্ন ভৌগোলিক নামের (বঙ্গ, পুন্ড্র, গৌড়, বরেন্দ্র, রাঢ়, সমতট প্রভৃতি) অবস্থিত ছিল। মোটামুটি ভাবে ১৯৪৭ এর পূর্বে ব্রিটিশ ভারতে বেঙ্গল প্রদেশের ভূ-খন্ডই বাংলা নামে অভিহিত।

ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্বাংশে বাংলার অবস্থান মোটের উপর ২১°-২৮° উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৭°-৯৭°৩০ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে। বাংলার পূর্বে ত্রিপুরা, গারো ও লুসাই পর্বতমালা, উত্তরে শিলং মালভূমিও নেপালের তরাই অঞ্চল, পশ্চিমে রাজমহল ও ছোটনাগপুর পর্বতরাজির উচ্চভূমি এবং দক্ষিণ বঙ্গোপসাগর। এই চিহ্নিত সীমানার মধ্যে বাংলার আয়তন ৮০,০০০ বর্গমাইলের বেশি। বাংলার ইতিহাস রচনা করেছে ছোট বড় অসংখ্য নদ-নদী। এই নদ-নদীগুলিই বাংলার আর্শীবাদ এবং প্রকৃতির তাড়নায়, মানুষের অবহেলায় কখন ও বোধ হয় বাংলার অভিশাপ।[২]

হিমালয়ের দক্ষিণ ও বঙ্গোপাসাগরের উত্তর এবং ব্রহ্মপুত্র ও সুবর্ণরেখার পূর্বে অবস্থিত ভূ-ভাগ নিয়ে বাংলা গঠিত ছিল।[৩] মধ্যযুগীয় বাংলার সীমানা ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে পূর্ব ব্রিটিশ বাংলার সঙ্গে প্রায় অভিন্ন ছিল। সুলতানী ও মোগল শাসন এ দুটোর সময়ে গঠিত হয় মধ্যযুগীয় বাংলা। সুলতানী ও মোগল বাংলার গঠন বা বিস্তার প্রায় অভিন্ন ছিল। মোগল বাংলার সীমা বা বিস্তারের বর্ণনা দিতে গিয়ে আবুল ফজল বলেন, বাংলার বিস্তৃতি পূর্ব ও পশ্চিমে চট্টগ্রাম থেকে করহী (তেলিয়াগড়) পর্যন্ত ৪০০ ক্রোশ এবং উত্তর-দক্ষিণে উত্তরের পর্বতমালা থেকে হুগলি জেলার মান্দারণ পর্যন্ত ২০০ ক্রোশ।[৪] ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন সলীম সুরে বাংলার অবস্থান সম্পর্কে আবুল ফজলের বক্তব্যের সঙ্গে একমত পোষণ করেন।[৫]

---

[২] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস*, আদিপর্ব, দ্বিতীয় সংস্করণ (কলকাতা ঃ দে'জ পাবলিশিং ১৪০২ বাং), পৃ. ১০০-১২১।

[৩] প্রভাততাংশু মাইতি, *ভারত ইতিহাস পরিক্রমা*, প্রাগৈতিহাসিক যুগ-১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ, চতুর্থ সংস্ককরণ (কলকাতা ঃ শ্রীধর প্রকাশনী, ১৯৯৮), পৃ. ৩১৭।

[৪] Abul Fazl-Allami, *Ani-l-akbari*, Vol-11, tr. H.S. Jarrett & Sir Jadu-Nath Sarkar (Calcutta : The Asiatic Society, 1993), PP. 129-130.

[৫] গোলাম হোসায়ন সালীম, *বাংলার ইতিহাস*, রিয়াজ-উস-সালাতিনের বঙ্গানুবাদ, অনু, আকবরউদ্দিন (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪) পৃ. ৮।

ঋগবেদের (আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব তিন হাজার বছর) ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থে ‘বঙ্গ’ নামে এ দেশের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়।[৬] প্রখ্যাত পণ্ডিত ও গবেষক নীহাররঞ্জন রায় বঙ্গ, পুন্ডবর্ধন, বরেন্দ্রী, রায়, তাম্রলিপি, বাঙালা, সমতট, হরিকেল, কর্ণসুবর্ণ, গৌড়, চন্দ্রদ্বীপ এবং সূক্ষ্ম নামক জনপদের নাম উল্লেখ করেছেন।[৭] বাংলা পরিভ্রমণকারী পর্তুগিজ ধর্মযাজক মানরিক বাংলার কয়েকটি জনপদের কথা উল্লেখ করেন।[৮] বাঙ্গালী, হিজলী, উড়িষ্যা, যশোর, চন্দোখাল, ঢাকা, রাজমহল, মেদিনীপুর, ফাটরাবুহ, বাকলা, সোলিমানবাস, এবং বুলভা (ভোলা)[৯] এগুলো বাংলার জনপদ ছিল। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন, উত্তর বঙ্গে ‘পুন্ড্র’ ও বরেন্দ্র অথবা ‘বরেন্দ্রী’, পশ্চিম বঙ্গে ‘রায়’ ও তাম্রলিপি এবং দক্ষিণ ও পূর্ব বঙ্গে ‘বঙ্গ’, ‘বাঙ্গালা’, ‘সমতট’, ‘হরিকেল’ প্রভৃতি দেশ ছিল। প্রাচীনকালে বাংলায় ২৩টি জনপদ ছিল বলে ধারণা করা হয়। জনপদগুলোর নাম পুন্ড্র বা পুন্ড্রবর্ধন, বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রী, রায়, তাম্রলিপি, বঙ্গ, বাঙ্গালা, সমতট, হরিকেল, কর্ণসুবর্ণ, হিজলী, উড়িষ্যা, যশোর, ঢাকা, রাজমহল, চান্দেখনি, মেদিনীপুর, বাকলা, সোলিমানবাস, বুলভা (ভোলা) গৌড়, চন্দ্রদ্বীপ ও সূক্ষ্ম।

জনপদগুলোর সীমানা সঠিকভাবে জানতে পারা যায়নি। এর কারণ হিসেবে বলা হয় এই জনপদগুলো বিভিন্ন শাসকের করতলগত হয়। এই শাসক গুলো পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথে বিভিন্ন জনপদের সীমানা ও বিস্তারের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। আবার অনেক সময় এক জনপদ অন্য জনপদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে অন্য আরেক নামে জনপদের সৃষ্টি হত। রাজা শশাংক খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে এই জনপদগুলোকে গৌঢ় নামে একতাবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত করতে পারেননি। তাই রাজা শশাঙ্কের পর থেকেই ‘পুন্ড্র’, ‘গৌড়’ ও ‘বঙ্গ’ বাংলার সমার্থক হয়ে উঠে। রাজা লক্ষণ সেনের শাসনামলে (১১৭৯-১২০৭) খ্রিঃ সমগ্র বাংলা ‘রাঢ়’, ‘বরেন্দ্র’, ‘বাগড়ী’ ও ‘বঙ্গ’ নামে বিভক্ত ছিল না। কিন্তু বাংলা নামক একক দেশের অস্তিত্ব সুলতানী আমলের পূর্ব পর্যন্ত ছিল না।

ঐতিহাসিক মিনহাজ ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুসলমানদের বাংলা বিজয়ের ইতিহাস রচনার সময় এ দেশকে বাংলা নামে উল্লেখ না করে বাংলার বিভিন্ন অংশ ‘বরেন্দ্র’, ‘রাঢ়’, ‘বঙ্গ’, ‘সমতট’ প্রভৃতি নামে উল্লেখ করেছেন। যদি বাংলা নামের নির্দিষ্ট কোন দেশের অস্তিত্ব তখন থাকত তাহলে তাঁর গ্রন্থে অবশ্যই তা উল্লেখ থাকত।

---

[৬] সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, ১ম খন্ড (কলিকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৭৮), পৃ. ৩।

[৭] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস*, আদিপর্ব, দ্বিতীয় সংস্করণ (কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং ১৪০২ বাং), পৃ. ১০০-১২১।

[৮] অসীম কুমার রায়, *বঙ্গ বৃত্তান্ত*, বিদেশী পর্যটকদের লেখায় বাংলার কথা, পঞ্চম থেকে সপ্তদশ শতাব্দী (ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ, ২০০৮) পৃ. ৩০।

[৯] ওয়াকিল আহমদ, *বাংলায় বিদেশী পর্যটক*, ৩য় সং, (ঢাকা: গ্লোব লাইব্রেরী প্রা.লি. ২০০০), পৃ. ৫৬।

‘বাঙ্গালাহ’ নামটি সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবনের সময় (১২৬৬-১২৮৬ খ্রিঃ) থেকে প্রচলিত। বাংলার পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলের জন্য সাধারণত এই নাম ব্যবহৃত হতো।[১০] ‘বাঙ্গালা’ নাম মুসলিম লেখকদের মধ্যে সর্বপ্রথম জিয়াউদ্দিন বারানী ব্যবহার করেন। তিনি ‘বাঙ্গালা’ বলতে বাংলার পূর্ব-দক্ষিণাঞ্চলের ভূ-খণ্ডকে বুঝিয়েছেন। ঐতিহাসিক মিনহাজ বলেন যে, তার লক্ষণাবতীতে ভ্রমণকাল পর্যন্ত (১২৪২-১২৪৪) লক্ষণ সেনের বংশধরগণ বঙ্গে তাদের শাসন বজায় রাখেন। বারাণীর ‘বঙ্গোলাহ’ ও মিনহাজের ‘বঙ্গ’ শব্দ দুটি ভৌগোলিক দিক থেকে সাদৃশমূলক। তাছাড়া সমসাময়িক মুসলিম মুদ্রা থেকে এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়। বাংলা তখন কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল এবং মুসলমানগণ এই অঞ্চলকে বিভিন্ন নাম দেন। যেমনঃ আরসা-ই-বাঙ্গালাহ্ (সাতগাঁও অঞ্চল), ইকলিম-ই-বাঙ্গালাহ্ (সোনারগাঁও অঞ্চল বা পূর্ববঙ্গ), দিয়ার-ই-বাঙ্গালাহ্ (সংযুক্ত সাতগাঁও ও অংশ বিশেষ সোনারগাঁও অঞ্চল) প্রভৃতি।

চতুর্দশ শতাব্দীতে বাংলা পরিভ্রমণকারী (১৩৪৫-১৩৪৬ খ্রিঃ) মরক্কোর পর্যটক ইবনে বতুতা বাঙ্গালাহ্ বলতে দক্ষিণ বঙ্গকেই বুঝিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেন, তখন বাঙালার শাসনকর্তা ছিলেন ফখরুদ্দিন। লক্ষণাবতীর শাসক আলী শাহের সাথে নৌবহর নিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হন।[১১] উপর্যুক্ত বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, ইবনে বতুতার পরিভ্রমণকালে দক্ষিণ ও পূর্ব বঙ্গ বাঙ্গালা নামে পরিচিত ছিল। তোগলক শাসনামলে (১৩২০-১৪১৩ খ্রিঃ) গুজরাটি, জৈনপুর, দাক্ষিণাত্য, বাংলা প্রভৃতি অঞ্চল স্বাধীন রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইলিয়াস শাহী শাসকগণ চতুর্দশ শতাব্দীতে বাংলার স্বাধীনতার প্রথম পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব করেন।[১২] সুলতান হাজী শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ ছিলেন বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান। তিনি বাংলার জনপদগুলোকে একক শাসনাধীনে আনার পর এর নাম হয় বাঙ্গালাহ্। তিনি শাহ্-ই-বাঙ্গালা ও সুলতানী বাঙ্গালাহ্ উপাধি ধারণ করে বাংলায় স্বাধীন সুলতানী আমলের সূচনা করেন। সুলতান হাজী শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের আমলে বাঙ্গালা ও বাঙ্গালি নাম উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গে বিস্তৃতি লাভ করে। বাংলা ও লক্ষণাবতী সংযুক্ত হয়। সুলতান এ যুক্ত অঞ্চলকে বাংলা ও এর অধিবাসীদের বাঙ্গালি নাম দেন।[১৩] সুলতানের প্রধান অমাত্যবর্গ ও সৈনিকরা রায়ান-ই-বাঙ্গালাহ্,

---

[১০] মো. আব্দুর রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, প্রথম খন্ড, ১২০৩-১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দ, অনু মোঃ আসাদুজ্জামান, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি ১৯৯৫), পৃ.২।

[১১] অসিম কুমার রায়, বঙ্গ বৃত্তান্ত, *বিদেশী পর্যটককের লেখায় বাঙলার কথা*, পঞ্চম থেকে সপ্তদশ শতাব্দী, ঢাকাঃ দিব্য প্রকাশ, ২০০৮, পৃ. ১০৭।

[১২] মমতাজুর রহমান তরফদার, *হোসেন শাহী আমলে বাংলা*, ১৪৯৪-১৫৩৮, একটি সামাজিক রাজনৈতিক গবেষণা, অনু, মোকাদ্দেসুর রহমান (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২০০১), পৃ. ১৬।

[১৩] আবু জাফর শামসুদ্দীন, *বাঙ্গালীর আত্মপরিচয়*, আবহমান বাংলা, সম্পা. মুস্তফা নূরউল ইসলাম (ঢাকাঃ অন্যপ্রকাশ, ১৯৯৯), পৃ. ৩১৫।

লস্কর-ই-বাঙ্গালাহ্ ও পাইক-ই-বাঙ্গালাহ্ প্রভৃতি নামে পরিচিত হতো।[১৪] মোঘল শাসনের সময় সমগ্র সাম্রাজ্য কয়েকটি সুব বা প্রদেশে বিভক্ত হলে এই প্রদেশের নাম হয় সুবা বাঙ্গালাহ্। 'বংগাল' জনপদের নাম হতেই কালক্রমে সমগ্র দেশের নাম বাংলা হয়েছে। বাংলা পিডিয়ায় উল্লেখ আছে, মুসলিম শাসনের প্রথম দিকে বাংলা 'বং' নামে পরিচিত ছিল।[১৫]

আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে আবুল ফজল বাংলার নামকরণ সম্পর্কে যে অভিমত পেশ করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। তার মতে, আদিতে এই দেশের নাম ছিল বঙ্গ। এই দেশের পূর্বতন রাজারা দশ হাত উঁচু ও বিশ হাত চওড়া আল বা বাঁধ নির্মাণ করেছেন। এভাবে বঙ্গ শব্দের শেষে আল (সংস্কৃত ভাষার আলি বা পূর্ব্বঙ্গীয় আইল) যুক্ত হয়ে বাঙ্গালা শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে।[১৬] ড. নীহাররঞ্জন রায় তাঁর বাঙ্গালীর ইতিহাস গ্রন্থে আবুল ফজলের ব্যাখ্যার অর্থ করেছেন যে, বঙ্গ দেশ ছিল বাঁধ (আল্) বহুল। এই বাঁধ (আল্) গুলোই বাংলার বৈশিষ্ট্য। এই আল্ বা বাঁধ আবুল ফজলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সে জন্যই তিনি বঙ্গ নামের সাথে আল্ প্রত্যয়যুক্ত করে দেশটির নতুন নামকরণ করেন বাঙলা বা বাংলাদেশ।

ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেন— পূর্ব বঙ্গ এবং বঙ্গাল নাম দুটি পৃথক জনপদ নামে পরিচিত। সুতরাং 'বঙ্গ' এই দেশের নামের শেষে আল প্রত্যয় যোগে অথবা অন্য কোন কারণে বঙ্গাল অথবা বাংলা নামের উদ্ভব হয়েছে তা স্বীকার করা যায় না। তিনি বলেন — বঙ্গাল দেশের নাম হতে কালক্রমে সমগ্র দেশের নাম বাংলা হয়েছে। রমেশ চন্দ্র মজুমদারের অনুমানের প্রতি সন্দেহ পোষণ করে আব্দুল মমিন চৌধুরী বলেন, বঙ্গাল থেকেই যে বাংলা নামের উৎপত্তি হয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যায়না। তাঁর মতে, প্রাচীন যুগে বঙ্গাল দেশের নামের উল্লেখ থাকলেও তা থেকে সারা দেশের নামকরণ হবার মত যে গুরুত্ব ছিল তা বলা যায় না। তিনি আরও উল্লেখ করেন, প্রাচীন জনপদগুলোর মধ্যে বঙ্গাল এর তুলনায় বঙ্গ যে অধিক খ্যাতিমান ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই এবং বঙ্গ জনপদের মধ্যেই দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার অনেক ভৌগোলিক সড়ক অন্তর্ভূক্ত ছিল।[১৭] তাই বঙ্গ থেকেই বাংলা নামের উৎপত্তি মনে করাই যুক্তিযুক্ত। গোলাম হোসেন সলীম আবুল ফজলের মত তাঁর

---

[১৪] মো. আব্দুর রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, প্রথম খন্ড, ১২০৩-১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দ, অনু মোঃ আসাদুজ্জামান, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি ১৯৯৫), পৃ. ৪।

[১৫] বাংলা পিডিয়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৪) পৃ. ১৯৬।

[১৬] Abul Fazl-Allami, *Ani-l-akbari*, Vol-11, tr. H.S. Jarrett & Sir Jadu-Nath Sarkar (Calcutta: The Asiatic Society, 1993), P.132.

[১৭] আবদুল মমিন চৌধুরি, *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি* (ঢাকা: বর্ণায়ন, ২০০২), পৃ.১৪।

রিয়াজ-উস-সালাতিন গ্রন্থে বাংলার নামকরণ প্রসঙ্গে বলেন — আদিতে বাংলা ছিল বঙ্গ বা বং। বঙ্গ অথবা বং নামের শেষে আল্ যুক্ত হয়ে বঙ্গাল হয়। তাছাড়া বং অথবা বঙ্গ শব্দের শেষে আল প্রত্যয় যুক্ত হওয়ার কারণ হিসেবে বলা হয় যে বাংলা ভাষায় আল শব্দের অর্থ বাঁধ। আবাদী জমিতে অথবা বাগানে যাতে বন্যার পানি প্রবেশ করতে না পারে সে জন্য জমির চারদিকে বাঁধ দেওয়া হতো।

সে সময় বাংলার লোকেরা পাহাড়ের পাদদেশে নিচু জমিতে দশ হাত উঁচু ও বিশ হাত চওড়া মাটির স্তুপ তৈরি করে তার উপর বাড়ি তৈরি ও চাষাবাদ করত। তখন লোকেরা এগুলোকে বাঙ্গলাহ্ বলত। এ প্রসঙ্গে কাবেদুল ইসলাম বলেন — "অস্ট্রিক ভাষার দেবতাবোধক শব্দ 'বোঙ্গা' থেকে তার ভক্ত অর্থে বঙ্গ শব্দের উদ্ভবের কথা অনুমান করা যেতে পারে। তিনি আরও বলেন — এই ধরনের অনুমানের ক্ষেত্র সুবিস্তৃত।[১৮] সুকুমার সেনের মতে, বঙ্গ থেকে 'বাঙ্গালাহ্' নামের উৎপত্তি। 'বাঙ্গালাহ্' নামটি মুসলমানদের অধিকারকালে বেঙ্গলা এবং ইংরেজি বেঙ্গল শব্দ থেকে এসেছে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় বঙ্গ থেকে বাঙলা অথবা বাঙ্গালাহ্ নামের উৎপত্তি তা সিদ্ধান্ত করা যায়।

২.৩ বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা

বাংলা ছিল একটি ধনভাণ্ডার যেখানে বিদেশী ব্যবসায়ীরা নির্ঘাত তাদের ভাগ্য গড়তে পারত। এখানে অনেক মালামাল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। বিখ্যাত ফরাসী পর্যটক ফ্রান্সিস বার্ণিয়ার লিখেছেন, "সম্পদ ও মাটির উৎপাদন ক্ষমতার দিক থেকে বাংলা মিশর থেকেও উন্নত ছিল। বাংলায় এত প্রচুর ধান উৎপাদন করে যে সে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ছাড়াও দূর-দূরান্তের দেশেও তা রপ্তানি করে থাকে অনুরূপভাবে বাংলায় প্রচুর পরিমাণে চিনিও উৎপাদিত হয়। যা সুদূর গোলকুণ্ডা ও কর্ণাটকে, আরবে ও মেসোপটমিয়ায় এবং পারস্যে রপ্তানি করা হয়। ইংরেজদের ফ্যাক্টরি রেকর্ডে দেখা যায়, দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ ও শুল্ক আদায়ের জন্য মুঘল সরকার পূর্ব প্রদেশসমূহে চারটি বন্দর প্রতিষ্ঠা করে। এগুলো হলো হুগলির বখসবন্দর, ঢাকার শাহবন্দর, মুর্শিদাবাদের পাচোত্রী বন্দর এবং পাটনার বুজুর্গ বন্দর (রেকর্ড মতে বুদ্রোবন্দর)।[১৯] দেশের রাজনৈতিক অবস্থার আলোকে মুঘল সরকার সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুতে ঢাকা একটি শহর হিসাবে গড়ে উঠলে ঢাকা বন্দর প্রতিষ্ঠা করে। ১৬৩২ সালে পর্তুগীজদের বহিষ্কার করা হলে সম্ভবত হুগলি বন্দর প্রতিষ্ঠা করা হয়। নদীর নাব্যতা হারিয়ে সাতগাঁও

---

[১৮] কাবেদুল ইসলাম, *প্রাচীন বাংলার জনপদ ও জনজাতিগোষ্ঠী* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৪) পৃ. ১৮-১৯।

[১৯] বখ্স, শাহ্ বুজুর্গ ফার্সি শব্দ, প্রথমটির অর্থ বিভক্তি, আর শেষ দুটোর অর্থ বিশাল। পাঁচোত্রা শব্দটি পানছট থেতকে উদ্ভুত যার অর্থ ব্যাপক অর্থে শুল্ক। অর্থের বিভিন্নতা জন্য এগুলোর প্রকৃতির বিভিন্নতা হয়নি; এগুলো হয়তো বা সরকারি নিয়মে ছিল মাত্র Abdul Karim, *Murshid Kuli Khan and his times*, Asiatic Socity of Pakistan, Dhaka, 1963, পৃ. ২১২ টীকা।

এর নৌচলাচলে ব্যবহৃত হলে হুগলি প্রসিদ্ধ লাভ করে।[২০] অভ্যন্তরীণ বন্দর হিসেবে পাটনার ইতিহাসও অস্বচ্ছল যদিও এটি হুগলির ন্যায় প্রাকৃতিক কারণেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, এক্ষেত্রে গঙ্গা নদীর গতি পরিবর্তনের কারণে রাজমহলের গুরুত্ব কমে যায়।[২১] উইলিয়াম হেজেজের ডায়েরিতে বর্ণিত সূত্র অনুযায়ী যদিও মুর্শিদাবাদ (তৎকালীন মখসুসাবাদ) সপ্তদশ শতাব্দীতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা কেন্দ্র এবং একজন শুল্ক আদায়কারীর আবাসস্থল ছিল কিন্তু মুর্শিদকুলী খান কর্তৃক দিওয়ানি সদর দপ্তর তথায় স্থানান্তর না করা পর্যন্ত পাচোত্রীবন্দর প্রতিষ্ঠা হবার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। যাই হোক, মুর্শিদাবাদের পাচোত্রী বন্দর ঢাকার শাহ্ বন্দরের অর্ধেক পরিধি গ্রাস করে নেয়।[২২] শুল্ক আদায়ের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের ফলে ঢাকা ও অন্যান্য বন্দর থেকে মালামাল প্রেরণের গতি সঞ্চায়িত হয়েছে যদিও ঢাকা তার প্রধান গুরুত্ব হারিয়েছে। শুল্ক প্রদান ও পাশ নেয়ার জন্য ব্যবসায়ীরা তাদের সুবিধানুযায়ী এখানে বিভিন্ন বন্দরে যেতে পারত, অবশ্য বিভিন্ন বন্দরে প্রতারণার সম্ভাবনাও ছিল যথেষ্ট।[২৩]

ভৌগোলিক পরিবর্তনের দরুন প্রতিদ্বন্দ্বী কেন্দ্রসমূহ গুরুত্ব হারায়, তদস্থলে পাটনা ও হুগলি গুরুত্ব লাভ করে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হুগলি নদীর তীরে অবস্থিত শহরগুলোর ভাগ্যের উন্নয়ন। আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন হুগলিকে বৈদেশিক বাণিজ্যের একমাত্র কেন্দ্র হিসেবে উল্লেখ করেছেন “কারণ সমস্ত বৈদেশিক মালামাল এখানে আমাদানি হয় এবং বাংলায় উৎপন্ন দ্রব্যের সব মালামাল এখানে জমা করা হয় রপ্তানীর জন্য।[২৪]

উপসাগরে (কোম্পানির) প্রধান ও কাউন্সিলের আবাসস্থলের জন্য হুগলি ও বালেশ্বরের মধ্যে কোন জায়গাটি সর্বোত্তম এ বিষয়ে বিতর্কের পর কাউন্সিল সিদ্ধান্ত নেয় যে হুগলিই সর্বোত্তম স্থান, যদিও ইউরোপের জাহাজসমূহ তাদের মালামাল বালেশ্বরে খালাস করে ও জাহাজে তোলে, কারণ হুগলি হচ্ছে বাংলার চাবি বা মানদণ্ড (বাণিজ্য কেন্দ্র) যেখানে বাংলার সব মালামাল যাওয়া আসা করে এবং

---

[২০] Francis Berneir, *Travels in the Mogul Empire,* (1656-1668) ed: V. A. smith, Oxford University Press, London, 1934, P. 437-439।

[২১] Jean Baptiste Tavernier : *Travels in India,* (Macmillan and Company Limited, London, Gale Ecco Print Edition, Vol I. P. 125।

[২২] Abdul Karim, *Murshid Kuli Khan and his times,* Asiatic Socity of Pakistan, Dhaka, 1963, P. 213।

[২৩] Abdul Karim, Ibid, P. 214।

[২৪] Alexander Hamilton, *A New Account of the East Indies,* The Complutense University of Madrid: 13 Jan 2009, Vol II, P. 12।

কোম্পানীর ব্যবসার কেন্দ্রস্থলের নিকটবর্তী যেখান থেকে তাদের অধস্তন ফ্যাক্টরিগুলোকে আদেশ আদান প্রদান করা হয়।[২৫]

বাংলায় অনেকগুলো বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। ঢাকা, সোনারগাঁও, জগদিয়া, ইসলামাবাদ বা চট্টগ্রাম ছিল পূর্ব দিকে আর মালদা, রাজমহল ও গঙ্গা নদীর উঁচু এলাকায় অবস্থিত পাটনা, মুর্শিদাবাদ, কাশিমবাজার, সাতগাঁও ও হুগলি ছিল পশ্চিম দিকে। বালেশ্বর, চুঁচুঁড়া, কলকাতা ছিল বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র যেগুলো ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা লালন করত ও পাহারা দিত।[২৬] অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নৌপথে মালামাল চলাচল সহজতর ছিল এবং বাংলা প্রকৃতির দানে এত সমৃদ্ধশালী যে নদী পথে যোগাযোগ ব্যবস্থায় কোনো সমস্যাই ছিল না।

পরিবহণের অসুবিধার দরুন শুধু যেসব মালামালের বাইরে মূল্য বেশী এবং সেসব মালামালের চাহিদা দেশের অন্যত্র অধিক শুধু সেসব মাল তাদের উৎপাদনের স্থান থেকে বাজারে বা বন্দরে বহন করা হয়। যেসব স্থান মালামাল রপ্তানির জন্য আকর্ষণীয় ছিল তন্মধ্যে পূর্ব-ভারতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কৌশলগত নদীপথে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গের হিজলি ও সাতগাঁও ঢাকার অদূরে শ্রীপুর এবং পূর্বে চট্টগ্রাম, উড়িষ্যার বালেশ্বরের নিকটবর্তী পিপলি এবং বিহারের পাটনা। ভাগ্য শীঘ্রই পুরাতন ব্যবসাকেন্দ্র সাতগাঁও ও পিপলির প্রতি বিমুখ হয় এবং তদস্থলে বালেশ্বর হুগলি ও কলকাতার ন্যায় স্থানগুলোর প্রতিসুপ্রসন্ন হয় এবং এগুলো প্রাধান্য লাভ করে।[২৭]

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলায় বিদেশী কোম্পানির ব্যবসা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা শীঘ্রই সমস্ত ব্যবসাকেন্দ্রগুলিকে পেছনে ফেলে যায় এবং শুধু বাংলার নয় বরং সমগ্র ভারতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসাকেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠার ভাগ্য লাভ করে।[২৮] বিশেষ করে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরেজ কর্তৃক গড়ে উঠা কলকাতা শহর শেষের দিকে সব শহরের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব ছড়িয়ে যায়।[২৯] মুর্শিদকুলী খান ইংরেজদের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা দৃঢ়ভাবে বাঁধা প্রদান ও নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি হুগলির পিছিয়ে পড়া ও গুরুত্ব হ্রাস রোধ করতে পারেন নি। সুযোগ্য পরিচালনা

---

[২৫] The Diaries of Streynsham Master, 1675-1680 and other contemporary papers relating thereto, Vol-I, The diary 1675-80, Classic Print, p. 500।

[২৬] সুকুমার ভট্টাচার্য, *দি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এন্ড দি ইকনোমি অব বেঙ্গল*, ১৭০৪-১৭৪০, কলকাতা, ১৯৬৯, পৃ. ১২৪।

[২৭] সুকুমার ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬।

[২৮] সুকুমার ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭।

[২৯] Abdul Karim, *Murshid Kuli Khan and his times*, Asiatic Socity of Pakistan, Dhaka, 1963, P. 215।

এবং বাণিজ্যিক স্বার্থে নিবেদিত কোম্পানির প্রশাসন তৎসঙ্গে দ্রুত বর্ধমান বিপুলকার ইংরেজ বাণিজ্য কলকাতার দ্রুত বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।[৩০]

১৭১৭ সালে মুর্শিদাবাদে রাজধানী কার্যত স্থানান্তরের দ্বারা প্রদেশের অর্থনীতি ও ভবিষ্যৎ ইতিহাসের উপর এটা তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলে। বাংলার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রেশম ব্যবসার কেন্দ্র কাশিম বাজার ছিল এর অতি সন্নিকটে, এস্থানে ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা প্রচুর বিনিয়োগ করত, ফলে কাশিম বাজার বিদেশী ব্যবসায়ী ও দেশীয় সরকারের মিলনকেন্দ্র হিসেবেও কাজ করত। গাঙ্গেয় বদ্বীপে চলমান বিদেশী জাহাজের আনাগোনা ও তাদের ব্যবসার উপর লক্ষ্য রাখার জন্য এটি ঢাকার চেয়েও অনেক বেশি কার্যকর।[৩১]

বেশ কিছু সংখ্যক কর্মকর্তা ও তাদের বিপুল সংখ্যক কেরানি, কোষাধ্যক্ষ, চাপরাশি এবং মনসবদারি বাহিনীর কিছু অংশ স্থানান্তরের ফলে রসদপত্র সরবরাহের জন্য একটি বাজার ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হয়। বাংলার অভ্যন্তরীণ বাজারের মধ্যে পাটনা, মালদা, কাশিমবাজার, ঢাকা ও জগদিয়ার নাম ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দলিলপত্রে উল্লেখ পাওয়া যায়।

১৭০৪-১৭২৭ সময়কালে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বাংলা থেকে রপ্তানির পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রথম দিকে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাউন্সিল ইউরোপের দিকে প্রেরিত জাহাজের সংখ্যা এবং মালামালের বিবরণীও লিপিবদ্ধ করে রাখত। কিন্তু পরে যখন প্রেরণযোগ্য পণ্য সামগ্রী ক্রয়ের তালিকা নিয়মিত হয়ে যায় তখন তারা তাদের ডায়েরিতে শুধু কলকাতায় বিনিয়োগের একটি তালিকা এবং কলকাতার ব্যবসায়ীদের সাথে সম্পাদিত চুক্তির তালিকা লিপিবদ্ধ করে রাখত।[৩২] তবে এই বিনিয়োগের তালিকায় সারা বছরে ক্রয়কৃত কাঁচা সিল্ক ও সূতিবস্ত্রের পরিমাণই বেশি থাকত। নিম্নের জাহাজের তালিকা থেকে ১৭০৫-০৬ সালে মাল রপ্তানির পরিমাণ কিছুটা আঁচ করা যাবে।

---

[৩০] সি. আর. উইলসন: *আরলি এ্যানালস অব দি ইংলিশ ইন বেঙ্গল*, চারখন্ড, কলিকাতা, চারখন্ড, কলিকাতা, ১৮৯৫-১৯০০, পৃ. ১৯০, ১৯৬।

[৩১] সুকুমার ভট্টাচার্য : *দি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এন্ড দি ইকনোমি অব বেঙ্গল*, ১৭০৪-১৭৪০, কলকাতা, ১৯৬৯, পৃ. ১২৪, ১২৫।

[৩২] Abdul Karim, *Murshid Kuli Khan and his times*, Asiatic Socity of Pakistan, Dhaka, 1963, p. 223।

সন	**তারিখ**	**জাহাজের নাম**	**কত অংকের মাল***
১৭০৪-০৫	৩০ মে ২৪ আগস্ট	দি ট্যাভিস্টক দি শিপিও	২৪৯,৬৫০২ টাকা ২৬২,৬০০ টাকা
১৭০৫-০৬	৭ ডিসেম্বর	দি নর্থাম্বারল্যান্ড	১১৮,৮৩৭ $\frac{১}{২}$ টাকা
	২১ ডিসেম্বর	দি ওয়েস্টমোরলান্ড	৫৭,৫৫, টাকা তৎসহ ১১৫,০০০ খণ্ড সিল্ক
	১৫ জানুয়ারি	দি হার্ণ	২৪২,৮৬০ টাকা
	২৩ ফেব্রুয়ারি	দি ওয়েন্টওয়ার্থ	২৪২,৯২০ টাকা

এগুলো ছাড়াও দি ইউনিয়ন নামে একটি জাহাজ নতুন কোম্পানি দ্বারা ইংল্যান্ডে প্রেরণ করা হয়।[৩৩] ১৭০৭ সালের পর রপ্তানির পরিমাণ আরও অনেক বৃদ্ধি পায়।

ইউরোপীয় কোম্পানীসমূহ ছাড়াও অনেক ইংরেজ, আর্মেনীয় মূর (মুসলমান) এবং এমনকি ভারতীয়ও ছিল যারা প্রাইভেট ব্যবসা পরিচালনা করত। এসব প্রাইভেট ব্যবসায়ীরা নিজেদের জাহাজে মাল রপ্তানি করত আবার কখনও কোম্পানির জাহাজ কর্মহীন অবস্থায় থাকলে সেই জাহাজ ভাড়া করে মাল রপ্তানি করত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর যেসব কর্মচারী নিম্নবেতনভুক্ত ছিল তাদেরকেও প্রাইভেট ব্যবসা করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। এসব ব্যবসায়ী ভারতের উপকূলীয় শহরসমূহে ও অন্যান্য এশীয় দেশে মাল রপ্তানি করত। ইংরেজ কোম্পানীর কর্মচারীগণ কোম্পানি কর্তৃক প্রাপ্ত সুযোগের ছত্রছায়ায় ব্যবসা করত কিন্তু তাদেরকে কখনও কোম্পানী ইউরোপে মাল প্রেরণ করতে দিত না। প্রাইভেট ব্যবসায়ীগণ এবং কোম্পানীর বেতনভূক্ত কর্মচারী দ্বারা পরিচালিত জাহাজের গন্ডি ও প্রকৃতির হিসেবে দেখা যায় বেশ মোটা অংকের বিনিয়োগ বাংলার

---

[৩৩] Consultation : ৩০ মে, ১৭০৪, ১৮ই আগষ্ট ১৭০৪, ৭ জুলাই ১৭০৫, ১৭ই আগষ্ট ১৭০৫, ২৫ ডিসেম্বর ১৭০৫।

আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যে নিয়োজিত ছিল। এভাবে ১৭০৫-০৬ আর্থিক বর্ষে প্রাইভেট ব্যবসায় মালবহনকারী নিম্নলিখিত জাহাজসমূহ ইংরেজ কাউন্সিলের ছাড়পত্র পেয়েছে।[৩৪]

তারিখ	**জাহাজের নাম**	**মালিকের নাম**	**গন্তব্য বন্দর**
২১ শে নভেম্বর ১৭০৫	পার্ল, ৬০ টন	রলফ শেলডন ও অন্যান্য	মালাবার
ঐ	এলিজাবেথ, ৬০ টন	ঐ	আচীন
ঐ	হোপওয়েল, ৪০ টন	ঐ	ঐ
ঐ	গুডহোপ, ২০০ টন	জন স্ট্যাটারউড ও অন্যান্য	পারস্য
২১ শে নভেম্বর ১৭০৫	লয়্যাল হোস্টার	ইংরেজ কোম্পানি বারানসী শেঠ কর্তৃক ভাড়াকৃত	ঐ
৩১ শে নভেম্বর ১৭০৫	ডালবার (দিলওয়ার ?) ২০০টন	রালফ, শেলডণ ও অন্যান্য	পেগু
৩০ শে নভেম্বর ১৭০৫	ইউনিট	-	সুরাট
১লা ডিসে ১৭০৫	ম্যামানিক আলী (মুবারক আলী ?) ২০০ টন	হাকীম আহমদ এন্ড হাজী হোসাইন	পারস্য
৩রা ডিসেঃ ১৭০৫	৭টি মুর জাহাজ	-	বালাশোর থেকে

---

[৩৪] Abdul Karim, *Murshid Kuli Khan and his times*, Asiatic Socity of Pakistan, Dhaka, 1963, P. 230, 231।

			মালদ্বীপ দ্বীপপুঞ্জ
৭ই ডিসে: ১৭০৫	সেন্ট জর্জ	রলফ, শেলডন ও অন্যান্য	সুরাট
১৮ই ডিসে: ১৭০৫	৩টি মূর জাহাজ	-	১টি করমণ্ডল ১টি পারস্য ১টি আচীন
২১ শে ডিসে: ১৭০৫	১টি মূর জাহাজ	-	করমণ্ডল
২৬ শে ডিসে: ১৭০৫	লয়াল কুক	-	পারস্য
৩১ শে ডিসেম্বর ১৭০৬	মেরী	প্রেসিডেন্ট পিট, মাদ্রাজ	মোচা
৪ঠা জানু: ১৭০৬	১টি মূর জাহাজ	-	পারস্য
৭ই জানু: ১৭০৬	মোহাম্মদী, ৮০ টন	মীর এলাহী ইয়ার আলেকজান্ডার হেমিলটন	মালদ্বীপ সুরাট
১১ই জানু: ১৭০৬	১টি মূর জাহাজ	-	পারস্য
১৮ই জানু: ১৭০৬	হুসাইন ১০০ টন	হাজী মাহমুদ জামান	মালদ্বীপ দ্বীপপুঞ্জ
১৯ শে জানু: ১৭০৬	ফতেহ ইলাহী ৩০০ টন	আল্লাহ ইয়ার খান	ঐ
২২ শে জানু: ১৭০৬	ডরোথী, ৭০ টন	রালফ, শেলডনও অন্যান্য	মোচা

ঐ	বুখারেস্ট	-	সুরাট
৭ই ফেব্রু: ১৭০৬	মেরী গ্যালী	-	বাটাভিয়া
ঐ	সারাহ্ ৪৫ টন	সালেহ আল-দ্বীন	ঐ

উপরোক্ত তালিকাতে বাংলা থেকে বিভিন্ন ওজনের ৩৩টি জাহাজ পাঠানো হয় বিভিন্ন এশীয় দেশে। এগুলোর মধ্যে ১৯টির মালিক মূর (মুসলমান), একটি ভাড়া করা হয় বারানসী শেঠ নামক একজন জৈন ব্যবসায়ী দ্বারা আর অবশিষ্ট জাহাজগুলো প্রাইভেট ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের। এতে আরও পরিলক্ষিতও হয় মূরগণ প্রাইভেট ব্যবসার অর্ধেকেরও বেশী ভাগ নিয়ন্ত্রণ করে। মূল শব্দ দ্বারা ইংলিশ রেকর্ডে সম্ভবত আরব ও পারস্যে মুসলমান ব্যবসায়ীদের বোঝায়।

অতএব দেখা যাচ্ছে, আলোচ্য সময়ের প্রথম দিকে বাংলায় বিদ্রোহ ও অন্যান্য গোলযোগে নিমজ্জিত থাকলেও দ্বিতীয় ভাগে বাংলায় ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড জোরদার হয়ে ওঠে। ইউরোপীয় বসতি বিশেষত ইংরেজদের বসতি এবং কলকাতা নগরীর প্রতিষ্ঠার সঙ্গে বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরের দ্বারা এই অর্থনৈতিক কার্যক্রমের গতি সঞ্চালিত হয়। কলকাতা নগরী একটি বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠার পর এটি সব বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোকে গ্রাস করে এবং ইংরেজদের কে বাংলায় তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপ করতে সহায়তা করে।

অর্থনৈতিক দিক থেকে বাংলা সমৃদ্ধশালী ছিল। কৃষিই ছিল এই অর্থনৈতিক দিকের প্রধান উৎস আর সে সময় কৃষিকাজও যথেষ্ট বিস্তার লাভ করেছিল। বাংলার উর্বর ভূমি ও উৎপাদিত ফসলের স্বল্পমূল্য বাংলাকে সমগ্র পৃথিবীর কাছে ঈর্ষনীয় স্থানে পরিণত করেছিল। ফরাসি পর্যটক ফ্রান্সিস বার্ণিয়ার এ প্রসঙ্গে বলেছেন, বাংলায় প্রবেশের জন্য শত দরজা খোলা কিন্তু বের হওয়ার জন্য একটি দরজাও খোলা নেই।[৩৫] ইতালির পর্যটক ভারথেমা কৃষি ও শিল্পের প্রাচুর্য দেখে বাংলাকে পৃথিবীর সর্বোত্তম বসবাসের স্থান হিসেবে উল্লেখ করেন।[৩৬] বাংলার প্রধান খাদ্য ধান ও কৃষিজ অন্যান্য দ্রব্য দেশীয় চাহিদা পূরণ করলেও প্রভূত পরিমাণ বিদেশে রপ্তানি হতো। সে সময়ে কৃষিজ দ্রব্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে শিল্পেরও যথেষ্ট বিকাশ সাধিত হয়েছিল। সূতিবস্ত্র, চিনি, রেশমবস্ত্র ও পাটজাত

---

[৩৫] Francois Bernier, *Travels in the Mogul Empire*, A.D. 1656-1668 (Delhi: Low Price Pbulication, 1999), p. 439.

[৩৬] ওয়াকিল আহমদ, *বাংলায় বিদেশী পর্যটক*, ৩য় সং. (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০৪) পৃ. ২।

দ্রব্যাদি শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে প্রধান ছিল। এ সময় বাংলার রপ্তানি বাণিজ্যে বেশ উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। এ যুগকে বাংলার ইতিহাসে সবচেয়ে সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যের যুগ বলা হয়। শায়েস্তা খার শাসনামলে বাংলার কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা ব্যাপক উন্নতি লাভ করেছিল। তাই বাংলাকে সেসময় ‘জিন্নাৎ উল বেলাৎ’ বা ‘মর্তের স্বর্গ’ বলত।[৩৭]

বাংলার কৃষি ও শিল্পের সমৃদ্ধির মূলে মধ্যযুগে মুসলিম শাসকদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। জমির উর্বরতা ও বৃষ্টিপাতের কারণে বাংলায় প্রচুর ফসল উৎপাদন হতো। শস্যাদি ভালভাবে উৎপাদনের জন্য সেচ ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। সুলতান ফিরোজ শাহ সেচ ব্যবস্থার জন্য বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষে খাল খননের ব্যবস্থা করেন।[৩৮] সে সময় জনসাধারণ কৃষি কার্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলার শিল্প ক্ষেত্র ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। মোগল আমলে তাঁতীদের জন্য কাপড় প্রস্তুতকরণে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সরকারী কারখানা স্থাপন করা হয়।[৩৯] সরকারি শিল্প কারখানা স্থাপন, ঋণ প্রদান ও উৎপাদিত পণ্য সমূহের উপর শুল্ক কমানোর জন্য শিল্প ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়। বর্ষাকালে দস্যুতস্করের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য রাস্তাঘাটে সেনামোতায়েন ও পুলিশি পাহারার ব্যবস্থা করা হয়। তাই দেশি ও বিদেশী উভয় ব্যবসায়ীরাই উৎপাদিত পণ্যসমূহ সরবরাহ করার সুযোগ লাভ করে।

২.৪ বাংলার কৃষির সার্বিক অবস্থা

মধ্যযুগে বাংলার কৃষি ও শিল্পের সমৃদ্ধির মূলে মুসলিম শাসকদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। প্রাচীনকাল থেকেই নদীমাতৃক বাংলার জমির উর্বরতা ও বৃষ্টিপাতের কারণে বাংলায় প্রচুর ফসল ফলত। অধিকন্তু বাংলার সুলতানগণ রবিশস্যসহ বিভিন্ন রকম শস্যে সেচ ব্যবস্থার প্রচলন করে অনেক অনাবাদী জমিকে আবাদী জমিতে পরিণত করেন। অবাধ সেচ ব্যবস্থার লক্ষ্যে সুলতান ফিরুজ শাহ বাংলা তথা ভারতের সর্বত্রই নানান আকারের খাল-খননের ব্যবস্থা করেন।[৪০] হিন্দু আমলে কৃষকদের উপর ধার্যকৃত অসহনীয় করের বোঝা মওকুফ করে মুসলিম সুলতানগণ ইসলামী শরীয়া মোতাবেক লঘু ও সহনীয় কর ধার্য করেন। ফলে জনসাধারণ কৃষি কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলার শিল্প ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। মোগল আমলে কাপড়

---

[৩৭] পূর্নেন্দু পত্রী, *পুরনো কলকাতার কথাচিত্র* (কলকাতা ঃ দে’জ পাবলিশিং, ১৯৮২), পৃ. ২০।

[৩৮] জিয়াউদ্দিন বারানী, *তারিখ-ই-ফিরুজশাহী*, অনু. গোলাম সামদানী কোরায়শী (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮২) পৃ. ৪৫৭।

[৩৯] আব্দুল্লাহ ফারুক, *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪), পৃ. ৫১।

[৪০] জিয়াউদ্দিন বারানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৭।

প্রস্তুতের জন্যে তাঁতীদেরকে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় কাজ করার জন্যে সরকারী কারখানা স্থাপন করা হয়েছিল।[৪১] নতুন সরকারী শিল্প কারখানা স্থাপন, ঋণ প্রদান ও শিল্প কারখানায় উৎপাদিত পণ্যসমূহের উপর থেকে শুল্ক কমানোর ফলে শিল্প ব্যবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছিল। বর্ষাকালে নির্বিঘ্নে চলাচলের জন্য রাস্তাঘাট উঁচু করা, রাস্তা-ঘাটে সেনা মোতায়েন ও পুলিশি তৎপরতার মাধ্যমে সর্বপ্রকার দস্যুতস্করদের দমন করা হয়। ফলে নির্বিঘ্নে দেশি ও বিদেশি বণিকরা বাংলায় উৎপাদিত পণ্যসমূহ সরবরাহের সুযোগ পায়।

প্রাচীনকাল থেকে বাংলার কৃষিজমি যথেষ্ট উর্বরা শক্তিসম্পন্ন ছিল। নদীবাহিত পলি ও মৌসুমি বৃষ্টিপাত বাংলার মাটির উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছিল। বাংলার সুলতানগণ কর্তৃক জমির উন্নয়নে গৃহীত ব্যবস্থাদি এ ব্যাপারে কার্যকর ভূমিকা রাখে। মুসলিম শাসকদের গৃহীত ব্যবস্থার মধ্যে হুইল যন্ত্রের (দূর্গম চাকা বিশেষ) মাধ্যমে নদী বা খাল থেকে পানি নিয়ে জমিতে সরবরাহ করা এবং অনাবাদি জমিকে চাষের আওতায় আনা ছিল উল্লেখযোগ্য কাজ। সেচ দেওয়ার জন্য কূপ খনন ও বাঁধ নির্মাণের ব্যবস্থা করা হয়। নিম্নাঞ্চলে সরাসরি নদী ও খালের পানি দিয়ে সেচ কাজ চলত। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক আভাসিং একটি প্রবন্ধে এ ধরনের খাল কাটার কথা উল্লেখ করেছেন।[৪২] বীরভূম অঞ্চলে বড় বড় বাঁধ দিয়ে বর্ষার পানি ধরে রাখা হতো। বাঁধে আটকানো পানি অনাবৃষ্টির সময় চাষীদের জমিতে সেচকাজের জন্য সরবরাহ করা হতো। বাংলার গ্রামে অসংখ্য পুকুর বিদ্যমান থাকায় বর্ষকালে পুকুরগুলোতে পানি ধরে রেখে শীতকালে রবিশস্যের প্রয়োজনে সেচ কার্যে ব্যবহার করা হতো।

বাংলায় প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য, অর্থকরী ফসল, ফলমূল, খনিজ দ্রব্য উৎপন্ন হতো যা মধ্যযুগীয় বাংলা ভ্রমণকারী পর্যটক, ঐতিহাসিক ও কবি সাহিত্যিকদের বিবরণীতে প্রমাণ মিলে।[৪৩]

বাংলায় কৃষিই ছিল জনসাধারণের প্রধান জীবিকা। বস্তুত বর্তমানকালে বাংলায় উৎপাদিত কৃষিপণ্যের সাথে মুসলিম বাংলার উৎপাদিত পণ্যের তেমন কোন পার্থক্য ছিল না। তখন কৃষিজাত পণ্যের মধ্যে ধান, সুপারি, চাল, ডাল, গম, যব, ভূট্টা, কলাই, সীম, তিল, তেলবীজ, ইক্ষু, তুলা, লঙ্কা, লাক্ষা, রেশম, সুগন্ধীকাঠ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ছিল। নদীবাহিত পলিমাটি দ্বারা গঠিত বাংলার উর্বর ভূমিতে

---

[৪১] আব্দুল্লাহ ফারুক, *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪), পৃ. ৫১।

[৪২] অনিরুদ্ধ রায়, *মুঘল ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস* (কলিকাতা: কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৯৬), পৃ. ২।

[৪৩] Francois Bernier, *Travels in the Mogul Empire*, A.D. 1656-1668 (Delhi : Low Price Pbulication, 1999), p. 437-446.

প্রায় সব ধরনের শস্য উৎপন্ন হতো। সুলতানী বাংলায় উৎপাদিত ফসলের মধ্যে ধান ছিল প্রধান। এখানকার জমি উর্বর হওয়ায় বছরে দুইবার ধান উৎপন্ন হতো। দেশীয় চাহিদা পূরণ করেও প্রচুর পরিমাণে ধান বিদেশে রপ্তানি হতো। ইবনে বতুতার বিবরণে বাংলায় প্রচুর পরিমাণে ধান উৎপন্ন হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে।[৪৪] শুণ্য পুরাণে প্রায় ১০০০ রকমের ধানের নাম আছে।[৪৫] চীনা বিবরণেও বাংলায় প্রচুর পরিমাণ ধান উৎপাদনের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুবে বাংলার প্রধান খাদ্যশস্য হিসেবে ধানের কথা আবুল ফজলও উল্লেখ করেছেন। কোন কোন জায়গায় জমি এত উর্বর যে, সেখানে একটি ধান বপন করলে তা হতে দুই তিন সের ধান উৎপন্ন হয়।[৪৬] ইংরেজ পর্যটক রালফ ফিচও বাংলার খাদ্যশস্য হিসেবে ধানের কথা উল্লেখ করেছেন।[৪৭]

বাংলার প্রধান অর্থনৈতিক ফসল ছিল তুলা। মার্কোপোলো বাংলায় উন্নতমানের তুলা উৎপাদনের কথা উল্লেখ করেছেন।[৪৮] তুলা থেকে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা লাভ হতো। বাংলায় প্রচুর পরিমাণে সুতিবস্ত্র তৈরি হতো যার কাঁচামাল ছিল কার্পাস। তা থেকেও মনে করা হয় যে, বাংলায় প্রচুর পরিমাণে কার্পাসের চাষ হতো। বাংলায় প্রচুর পরিমাণে পাট উৎপন্ন হতো। আবুল ফজল আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে পাটের কথা উল্লেখ করেছেন।[৪৯] পাট থেকে নানা প্রকার বস্ত্র, কার্পেট, চাঁদোয়া তৈরি হতো এবং দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রপ্তানি করা হতো।

উত্তর বঙ্গের জেলাগুলোতে (রংপুর, কুচবিহার, পাবনা, রাজশাহী, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও মালদা) প্রচুর পরিমাণে কৃষিপণ্য উৎপন্ন হতো। বাংলায় প্রচুর পরিমাণে মসলার চাষ হতো। হলুদ, মরিচ, আদা, রসুন, হরিতকী ইত্যাদি নানা প্রকার মসলা ছিল উল্লেখযোগ্য। চীনা বিবরণে বাংলায় উৎপন্ন আদা, সর্ষে, পেঁয়াজসহ বিভিন্ন প্রকার মসলার উল্লেখ পাওয়া যায়।[৫০] মধ্যযুগের মনসামঙ্গল ও চন্ডীমঙ্গল কাব্যসমূহে রপ্তানি পণ্যের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার মসলার নাম উল্লেখ আছে যা বাংলায় ব্যাপক মসলা উৎপাদনের প্রমাণ দেয়। বাংলার প্রায় সর্বত্র নানা রকমের ফলমূলের চাষাবাদ হতো। ফলমূলের মধ্যে আম, জাম, কলা, নারিকেল, সুপারি, বেল, লেবু, কাঁঠাল, খেজুর, গাজর, শালগম

---

[৪৪] এইচ. এ. আর. গিব, *ইবনে বতুতার ভ্রমণ কাহিনী*, অনু. খুররম হোসাইন (টাঙ্গাইল: ক্যাবকো বিসিক শিল্পনগরী, ২০০০), পৃ. ১৬২।

[৪৫] রামাই পণ্ডিত, *শূণ্য পূরাণ*, ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায়, সম্পা. (কলিকাতা: ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৭), পৃ. ১৬২।

[৪৬] আবুল ফজল, আইন-ই-আকবরী ও আকবরের জীবনী, অনু. পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ, ২০০৮), পৃ. ৯৩।

[৪৭] William Foster, *Early Travels in India, 1583-1619* (New Delhi: Oriental Books Reprint Corporation, 1985), p. 19.

[৪৮] *The Travel of Marcopolo*, ed. Sir E. Denison Ross and Eileen Power (London: George Routledge & Sons, Ltd. 1931), p. 203.

[৪৯] আবুল ফজল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪।

[৫০] সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর: স্বাধীন সুলতানদের আমল, ১৩৩-১৫৩৮* (কলিকাতা: ভারতীয় বুক স্টল, ১৯৮৮), পৃ. ৫০০।

উল্লেখযোগ্য ছিল। পুন্ড্রবর্ধন এলাকায় ব্যাপক কাঁঠাল উৎপাদনের কথা হিউয়েন সাঙ তার ভ্রমণ কাহিনীতে উল্লেখ করেছেন। চীনা লেখক ফেইশিন বলেন, সেখানকার মাটি খুব উর্বর এবং তাতে প্রচুর পরিমাণে ফলমূল হতো। এদেশের ফলমূলের মধ্যে একটি হল পো-লো-মি (কাঁঠাল)। এক একটির আয়তন অনেক বড় এবং স্বাদ অদ্ভূত রকম মিষ্টি। আর একটি ফল হচ্ছে আম। যদিও তার স্বাদ একটু টক, তবুও খুব চমৎকার।[৫১]

আখ ছিল বাংলার অন্যতম প্রধান ফসল। বরেন্দ্রভূমিকে বলা হতো পুন্ড্রবর্ধন। এখানে পৌন্ড্রক নামে এক জাতীয় আখ জন্মাতো। সেই আখ থেকে বাংলায় প্রচুর পরিমাণে গুড় উৎপন্ন হতো। সে কারণে দেশটিকে এক সময় গৌড় বলা হতো। বাংলার তৈরি গুড়, চিনি ও ঝোলগুড় ভারতের বিভিন্ন স্থানে, সিংহল, আরব দেশ ও পারস্যে রপ্তানি করা হতো।[৫২]

বাংলার অঞ্চলভেদে বিভিন্ন প্রকার খনিজ পদার্থ পাওয়া যেত। বাঁকুড়া, বীরভুম ও রাঢ়দেশের জঙ্গলে প্রচুর লোহা পাওয়া যেত।[৫৩] বাংলায় উৎকৃষ্ট মানের ইস্পাতের খনি ছিল। সুবর্ণরেখা অঞ্চলে তামার খনি ছিল। গঙ্গার মোহনায় মুক্তা পাওয়া যেত। পুন্ড্রবর্ধন ও ত্রিপুরাতে সোনার খনি ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র হতে চার প্রকার রূপার কথা জানা যায়। তার মধ্যে গৌড় অঞ্চলে প্রাপ্ত টগর তুল্লের মত বর্ণের গৌলিক রূপা ছিল অন্যতম।[৫৪] বাংলা যে হীরাসমৃদ্ধ দেশ ছিল তা রত্নপরীক্ষা গ্রন্থ হতে জানা যায়।[৫৫] উপর্যুক্ত তথ্য উপাত্ত থেকে বাংলায় উৎপাদিত কৃষি ও খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য্যতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

২.৫ বাংলা শিল্প ও বাণিজ্যিক অবস্থা

অতীতকাল থেকে ভারতবর্ষ তথা দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতে প্রথম মৌর্য নামক যে বৃহৎ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার ভিত্তি কৃষি-অর্থনীতি হলেও তখন শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি ঘটেছিল। ইতিপূর্বে মেগাস্থিনিসের উদ্ধৃতি দিয়ে পাটালিপুত্র নগরে বহু বিদেশী বসবাস করার কথা উদ্ধৃত হয়েছে। এ বিদেশীদের মধ্যে যে কিছু সংখ্যক লোক অবশ্যই ব্যবসায়ী ছিল তা মেগাস্থিনিসের অপর একটি বিবরণ থেকে প্রতীয়মান হয়। মেগাস্থিনিস উল্লেখ করেন, রাজধানীতে পৃথক একটি বোর্ড

---

[৫১] আবুল ফজল, *আইন-ই-আকবরী ও আকবরের জীবনী*, অনু. পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ, ২০০৮), পৃ. ৫০৭।

[৫২] Abdul Karim, *Murshid Kuli Khan and his times*, Asiatic Socity of Pakistan, Dhaka, 1963, P.260.

[৫৩] *নীহাররঞ্জন রায়*, *বাঙলীর ইতিহাস*, আদিপর্ব ২য় সংস্করণ, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৪০২ বাং, পৃ. ১৪৫।

[৫৪] *কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র*, সংক্ষিপ্ত অনুবাদ সুকুমার শিকদার, *কলকাতা অনুস্টক*, ২০০৫, পৃ. ৬০।

[৫৫] নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫।

ছিল যার কাজ ছিল বাণিজ্য, ওজন ও পরিমাপের তত্ত্বাবধান করা। বাণিজ্যতরীগুলো তখন সমুদ্রপথে শ্রীলংকা, ব্রহ্মদেশ (বার্মা) এবং দক্ষিণ আরবে যাতায়াত করতো। বিহারের দক্ষিণ-পূর্বে তাম্রখনি আবিষ্কৃত হওয়ায় তখন তাম্রবন্দর, তাম্রলিপি থেকে ব্যাপকভাবে ব্রহ্মদেশ এবং ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলোতে তাম্র রপ্তানি করা হতো।[৫৬]

খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রোমানদের আমলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে ভারতবর্ষ তথা দক্ষিণ-এশিয়ার বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হয়। রোমানরা এ সময়ে ভারত থেকে সরাসরি পণ্য সংগ্রহ করে রোমান সাম্রাজ্যে প্রেরণ করতো। রোমান আমলে ইউরোপে প্রাচ্যের বিভিন্ন পণ্য দ্রব্য বিশেষত মসলার চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় ফলে মালাবার উপকূলীয় এলাকায় নানা রকম মসলার উৎপাদনও উল্লেখ্যযোগ্য হারে বাড়ে। মালাবার উপকূলীয় এলাকায় নানা প্রকার মসলার উৎপাদন হলেও রোমানদের চাহিদার তুলনায় তা পর্যাপ্ত ছিল না। রোমানদের মসলার বর্ধিত চাহিদা পূরণের জন্য ভারতীয় বণিকরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর প্রতি মনোযোগ দেয়। স্বর্ণ, মসলা, সুগন্ধি দ্রব্য এবং কাঠ প্রভৃতি যা ছিল রোমের চাহিদা এবং এসবই এ অঞ্চলে পাওয়া যেতো। এভাবে মসলা ও অন্যান্য মূল্যবান সম্পদে সমৃদ্ধ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপ রাজ্যগুলোতে ভারতীয় বণিকদের যাতায়াত লক্ষণীয়ভাবে বেড়ে যায়।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ার বাণিজ্যিক সম্পর্ক বৃদ্ধির পেছনে এর অবস্থানগত বৈশিষ্ট্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। খ্রিষ্টীয় শতাব্দীর পূর্বেই চীনের সঙ্গে ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ভারতের মসলা, সুগন্ধি দ্রব্য, মণিমুক্তা এবং অন্যান্য বিলাসদ্রব্যের জন্য চীনাদের ব্যাপক চাহিদা ছিল। বিপরীতক্রমে ভারতে চীনের তৈরি রেশমবস্ত্রের বিশেষ জনপ্রিয়তা ছিল।[৫৭] চীনের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধির ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন বন্দরে ভারতের সমুদ্রযাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছিল। কেননা সমুদ্রপথে চীনে যেতে হলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন বন্দরকে ছুঁয়ে যেতে হতো। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যাতায়াত বৃদ্ধির ফলে এবং বাণিজ্যিক প্রয়োজনে ভারতীয় বণিকরা মূল ভূখণ্ডের এবং দ্বীপাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যে বসতি স্থাপন শুরু করে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন রাজ্যের সূচনা ভারতীয় যুবরাজ বা বণিকদের মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছিল এমন কথাও প্রচলন আছে।[৫৮] ব্রহ্মাদেশে ইরাবতি নদীর ব-দ্বীপে এবং যবদ্বীপের (জাভা) বিভিন্ন অংশে উপনিবেশ স্থাপনের সঙ্গে কলিঙ্গগণের

---

[৫৬] সুনীল চট্টোপাধ্যায়, *প্রাচীন ভারতের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, কলিকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পর্ষদ, ১৯৪৫, পৃ. ৯৬।

[৫৭] সুনীল চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮।

[৫৮] প্রাগুক্ত।

নাম জড়িয়ে আছে। কম্বোডিয়ার ভারতীয় সংস্কৃতির প্রবর্তক হিসেবে ভারতীয় কৌণ্ডিন্যর নাম সুপরিচিত। তিনি কম্বোডিয়ার রাজকুমারীকে বিবাহ করেছিলেন।[৫৯]

তৎকালীন চৈনিক ইতিবৃত্তে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয়দের কার্যকলাপের গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে ফুনানের নাম প্রথমে উল্লেখ করা যায়। ভারতের পূর্ব উপকূলের প্রায় সব নৌবন্দরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকায় মালয় উপদ্বীপেও ভারতীয়গণ বসতি স্থাপন করেছিল। তাম্রলিপি ও অমরাবতী থেকে জাহাজ তখন ব্রহ্মদেশ, মার্তাবান এবং ইন্দোনেশিয়ায় যেতো। দক্ষিণ ভারতের বন্দরগুলো থেকে জাহাজ যেতো টেনাসেরিম, ট্রাঙ্গে এবং মালাক্কা প্রণালিতে। পশ্চিম উপকূলের বন্দরগুলোও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাণিজ্যে অংশ নিতো।[৬০] ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে স্থলপথ ও নদীপথ হয়ে বিভিন্ন মালামাল সমুদ্র উপকূলবর্তী বন্দরসমূহে এসে জমা হতো এবং জাহাজযোগে সেগুলো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দিকে চলে যেতো। একইভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে সমুদ্রপথে মসলা ও অন্যান্য সামগ্রী ভারতের সমুদ্র উপকূলীয় বন্দর হয়ে ভারতের অভ্যন্তরে এবং ভারতের বাহিরে চলে যেতো।

সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের বাণিজ্যে আরবদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হলে তাদের নেতৃত্বে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ার বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠে। আরব বণিকরা বিশাল আরব সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে এবং ইউরোপীয়দের জন্য পণ্য সংগ্রহ করার জন্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ-গুলোতে এবং চীনে যাতায়াত করতে থাকে। বাণিজ্যপথ হিসেবে তারা জলপথকে প্রাধান্য দিত। তারা লোহিত সাগর অথবা পারস্য উপসাগর থেকে শুরু করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো এবং চীনে পৌঁছাত। এ পথে দক্ষিণ এশিয়ার গুজরাট, কালিকট, বাংলা, শ্রীলংকা প্রভৃতি যেসব দেশ অতিক্রম করতে হয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যাপক অংশগ্রহণের পথ উন্মুক্ত হয়। বাণিজ্যিক সুবিধার্থে আরব বণিকরা অনেকেই গুজরাট, বাংলা এবং শ্রীলংকায় বসতি স্থাপন করে স্থায়ীভাবে বসবাস করতো।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যিক সম্পর্ক ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। ক্রুসেডের পরে ইউরোপে রেনেসাঁসকালীন সময়ের মসলার চাহিদা বৃদ্ধি, মোঙ্গলদের আক্রমণে আব্বাসীয় খিলাফতের ধ্বংস সাধন প্রভৃতি কারণে চৌদ্দ-

---

[৫৯] সুনীল চট্টোপাধ্যায়, *প্রাচীন ভারতের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, প্রাকশক কলিকাতা, পশ্চিম বঙ্গ, রাজ্যপর্ষদ, ১৯৮৫,পৃ. ১০৮।
[৬০] সুনীল চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১।

পনের শতকে আলেকজান্দ্রিয়া-জেদ্দা-এডেন-ক্যাম্বে থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালাক্কা পর্যন্ত প্রসারিত বাণিজ্য পথটি যখন বিশেষভাবে গুরুত্ব পায়, তখন মালাবার উপকূল, করোমণ্ডল উপকূল ও বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত হয়।

আলেকজান্দ্রিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তাগিদেই চৌদ্দ শতকের দিকে ভারতের পশ্চিম উপকূলে ক্যাম্বে ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মালক্কার মতো গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক বন্দরের বিকাশ ঘটেছিল। এ বন্দর দুটো ছিল পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। ইউরোপ, আরব, পারস্য ও ভারতের পণ্য যেমন ক্যাম্বে থেকে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চলে যেতো, তেমনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও চীনের দ্রব্যাদি বিশেষ করে মসলা, স্বর্ণ-রৌপ্য, রেশম ইত্যাদি মালাক্কাকে কেন্দ্র করে ভারত, শ্রীলংকা, আরব ও ইউরোপে পৌঁছাতো।[৬১]

উপরন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যখন ভারতে সুলতানি শাসন সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত তখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সুমাত্রার পার্লাক, পাসেই এবং জাভার গ্রেসিক প্রভৃতি বন্দর রাজ্যে ইসলাম বিস্তার লাভ করে। মালাক্কা রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত সুমাত্রার বন্দরসমূহই ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অভ্যন্তরীণ ও বৈদিশিক বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে (১৪০২ খ্রি.) মেগাত ইসকান্দর শাহের নেতৃত্বে শক্তিশালী মুসলিম রাজ্য মালাক্কা প্রতিষ্ঠিত হলে দ্বীপাঞ্চলীয় বাণিজ্যের উপর মালাক্কার একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এসব মুসলিম রাজ্যের সঙ্গে স্বাভাবিক কারণে সুলতানি ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। এভাবে মুসলিম শাসনামলে ভারতবর্ষ তথা দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্য সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠে।

পর্তুগিজদের আগমনের প্রাক্কালে মালাক্কা ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র। মালাক্কাকে কেন্দ্র করেই সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্য আবর্তিত হতো। মালাক্কা থেকে বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী বাংলা, মালাবার উপকূল ও করোমণ্ডল উপকূলীয় বিভিন্ন বন্দর ও বাণিজ্যিক লেনদেন অত্যন্ত স্পষ্ট এবং বিস্তারিতভাবে ফুটে উঠেছে। তোম পিরেস মালাক্কাতে চার থেকে পাঁচ হাজার গুজরাটি বণিক যারা নিয়মিত যাতায়াত করতো তারা ব্যতীত আরো প্রায় এক হাজার গুজরাটি বণিকের মালাক্কায় বসবাস করার কথা উল্লেখ করেছেন।[৬২] তোম পিরেস আরো বলেন, মালাক্কার কর্তৃপক্ষ গুজরাটিদের বাণিজ্যিক গুরুত্ব বিবেচনা করে তাদের জন্য স্বতন্ত্র শাহ বন্দর নিযুক্ত করেছিলেন। গুজরাটি বণিকরা

---

[৬১] মমতাজুর রহমান তরফদার, *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*, বাংলা একাডেমী, পৃ. ১১৩।

[৬২] Tome Pires, *The Suma Oriental of tome Pires*, ed and trans a cortesas, London: Hakluyt Society, 1944, P. 45.

বছরে কমপক্ষে চারটি পণ্যভর্তি জাহাজ নিয়ে মালাক্কায় আসতো।[৬৩] পিরেসের উপর্যুক্ত বর্ণনাসমূহ হতে গুজরাটের সঙ্গে মালাক্কার কত গভীর বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল তা সহজে অনুমান করা যায়। গুজরাট থেকে বণিকরা যেসব পণ্য মালাক্কায় নিয়ে যেতো তন্মধ্যে ত্রিশ রকমের কাপড়, খয়ের, গোলাপ জল, আফিম, শস্যবীজ, ছোলা, কারুকার্যময় বস্ত্র ও সুগন্ধি। মালাক্কা থেকে তারা সংগ্রহ করতো সুগন্ধি কাঠ, মসলা, চীনা মাটির জিনিস, বুটিদার বস্ত্র, রেশম, স্বর্ণ ও টিন। ক্যাম্বে এবং গুজরাটের মধ্যে ব্যাপক বাণিজ্যিক বিনিময় লক্ষ করে তোম পিরেস মন্তব্য করেন, ক্যাম্বে ছাড়া মালাক্কা এবং মালাক্কা ছাড়া ক্যাম্বে বাঁচতে পারে না।[৬৪]

ক্যাম্বের পরেই মালাক্কার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক লেনদেন হতো করোমণ্ডল উপকূলীয় বণিকদের। করোমণ্ডল উপকূল থেকে প্রতি বছর তিন চারটি এবং পুলিকট বন্দর থেকে একটি দুটি জাহাজ মালাক্কায় যেতো। পুলিকেটের বণিকরা মালাক্কায় গুজরাটের তৈরি বস্তু নিয়ে যেতো এবং বিনিময়ে মালাক্কা থেকে সংগ্রহ করতো শ্বেত চন্দন, কর্পূর, ফিটকিরি, সাদা রেশম, মসলা, বুটিদার বস্ত্র, চীনা জরি এবং স্বর্ণ।[৬৫] পর্তুগিজদের আগমনের পূর্বে বাংলার সঙ্গেও মালাক্কার ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। প্রত্যেক বছর অন্তত একটি জাঙ্ক জাহাজ বাংলা থেকে মালাক্কায় যেতো। কোনো কোনো বছরে দুবারও জাহাজ যেতো। চার বা পাঁচটি জাহাজ করে এদেশের পণ্য সরাসরি রপ্তানি হতো মালাক্কায় ও সুমাত্রার অন্তর্গত পাসাই-এ। তোম পিরেসের বিবরণ থেকে বাংলার সঙ্গে মালাক্কা ও অন্যান্য দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় অঞ্চলে আমদানি-রপ্তানি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়। তোমে পিরেসের বিবরণে বলা হয়েছে, বাংলা থেকে মালাক্কা সূক্ষ্ম সাদা কাপড়, রঙিন ও কাজ করা খাটো মশারি, দেয়ালে ব্যবহারযোগ্য কারুকার্যখচিত বস্ত্রসজ্জা, ইস্পাত, চিনিতে সংরক্ষিত বিভিন্ন রকমের প্রচুর খাদ্য, সংরক্ষিত হরিতকী, আদা, কমলালেবু, বড়ুই, ডুমুর, কুমড়া ও ভারতীয় লাউ এবং অন্যান্য ফল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রপ্তানি হতো। রপ্তানি সামগ্রীর মধ্যে আরো ছিল কাল মাটির কড়া গন্ধযুক্ত বাসন। সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাংলার সুতিবস্ত্রের ব্যাপক চাহিদা ছিল। সেজন্য মালাক্কায় এদেশের সূতিবস্ত্রের খুব চড়া দাম ছিল। বার্মা, বোর্নিও, জাভা ও জাপানের লিউকিউ দ্বীপপুঞ্জে বাংলার সূতিবস্ত্রের ব্যাপক চাহিদা ছিল। মালাক্কা থেকে বাংলায় আসতো বোর্ণিওর কর্পূর, গোলমরিচ, লবঙ্গ, জৈত্রি, জায়ফল, চন্দন কাঠ, রেশম, মুক্তা, সাদা পোর্সেলিন, তামা, টিন, সীসা, পারদ, লিউ কিউ

---

[৬৩] Tome Pires, *The Suma Oriental of tome Pires,* ed and trans a cortesas, London: Hakluyt Society, 1944, P. 45.

[৬৪] Tome Pires, Ibid. p. 45.

[৬৫] জহর সেন, *দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস*, মালই-ইন্দোনেশিয়া, কলিকাতা: পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯৬, পৃ. ৯০।

দ্বীপপুঞ্জের বড় বড় সবুজ পোর্সেলিন, এডেনের আফিম, সাদা ও সবুজ রঙের বুটিদার কাপড়, চীন থেকে আনা সূক্ষ্ম বস্ত্র, উজ্জ্বল লাল রঙের টুপি ও গালিচা। আরো আসতো জাভার ছোরা ও তলোয়ার।[৬৬]

উল্লেখিত আমদানি-রপ্তানির তালিকা থেকে দেখা যায় বাংলার আমদানি দ্রব্যের মধ্যে অধিকাংশ ছিল বিলাসদ্রব্য। রপ্তানি দ্রব্যের সব কিছু ছিল অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য ও নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য। মালাক্কা ছাড়াও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আরাকান ও পেগু থেকে বাংলা পদ্মরাগমণি আসতো। টেনাসেরিম বন্দরের মাধ্যমে শ্যাম দেশের সঙ্গে বাংলার বাণিজ্যিক লেননদেন চলতো। জাভার সঙ্গে বাংলার বাণিজ্য ছিল উভয়মুখী। অনেক বাঙালি মুসলমান জাভায় বসবাস করেছে। জাভার গ্রেসিক বন্দরের মানুষেরা প্রচুর পরিমাণে বাংলার পণ্য কিনতো। বাংলার সিনাবাফ এবং সূক্ষ্ম সাদা কাপড় বান্তাম দ্বীপপুঞ্জে সমাদর পেতো। মালাক্কার মানুষ বাংলার সাদা ষাঁড় ও গরুর লেজ খুব পছন্দ করতো এবং পরম উৎসাহে তা কিনতো।[৬৭]

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের একমাত্র মাধ্যম ছিল সমুদ্রপথ। গুজরাটি ও করোমণ্ডল উপকূলের বণিকরা পশ্চিম এশিয়া এবং ইউরোপ থেকে আগত পণ্য জাহাজে উঠিয়ে অনুকূল মৌসুমি বায়ুর প্রবাহে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিতো। পথিমধ্যে বাংলার বন্দরসমূহে তারা যাত্রাবিরতি করতো এবং পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করে পুনরায় জাহাজ নিয়ে অগ্রসর হতো এবং মালাক্কা ও অন্যান্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বন্দর রাজ্যগুলোতে পৌঁছাতো। পিরেসের বিবরণে ইরানি, ইতালীয়, তুর্কি, আরব এবং পশ্চিম ভারতের চৌল, দাবহোল ও গোয়া থেকে আগত বণিকদের বাংলার বসবাস করার কথা জানা যায়।[৬৮]

দক্ষিণ এশিয়ার বণিকরা বাণিজ্যিক স্বার্থে বিভিন্ন বণিক সমিতি গড়ে তুলতো। তোম পিরেসের বিবরণে উল্লেখ করা হয়েছে, পশ্চিম ভারতীয় বণিকগণ প্রথমে মালাবার উপকূলের কালিকটে এবং পরে বাংলায় কোম্পানী বা বাণিজ্যিক সংঘ গঠনে তৎপর হতো। অবশ্য ভারতীয় বণিকদের তুলনায় দক্ষিণ এশিয়ার বাণিজ্যে বাঙালি বণিকদের গুরুত্ব অনেকাংশে কম ছিল। অনুজ্জ্বল ভাবমূর্তি, বাণিজ্যিক সংস্থার অভাব, বাণিজ্য পুঁজি গঠনের জন্য অতি প্রয়োজনীয় জাহাজ নির্মাণ ও সমুদ্রযান

---

[৬৬] Tome Pires, *The Suma Oriental of tome Pires*, ed and trans a cortesas, London: Hakluyt Society, 1944, P. 92-93.

[৬৭] জহর সেন, *দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস*, মালই-ইন্দোনেশিয়া, কলিকাতা: পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯৬, পৃ.৯০।

[৬৮] Ibid, P. 88.

পরিচালনা সংক্রান্ত প্রযুক্তির অভাব, নিম্নমানের বাণিজ্যিক নীতিবোধ প্রভৃতি সীমাবদ্ধতা কারণগুলোকে মমতাজুর রহমান তরফদার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যে বাঙালি বণিকদের দুর্বলতার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[৬৯] মমতাজুর রহমান তরফদারের এ যুক্তির যথেষ্ট গ্রহণযোগ্যতা আছে, এদিকে বাঙলার সমুদ্রবাণিজ্য সম্প্রসারণের পথে এখানকার শাসকবৃন্দের যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতার অভাব যে অন্যতম প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিল তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য :

বাণিজ্যে সহায়ক পরিবেশের কারণে বাংলায় গড়ে উঠে অভ্যন্তরীণ বাজার ও বাণিজ্য।[৯] এ বাজার বাংলার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মুর্শিদাবাদের কাছে ভগবানগোলা ও ঢাকার কাছে রাজনগর এ যুগে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের বড় ঘাঁটি।[৭০] বাংলার বাণিজ্যে বড় বড় মহাজন, দালাল ও পাইকারী ব্যবসায়ী থেকে ছোট ছোট অসংখ্য দোকানদার ও ব্যবসায়ী যুক্ত ছিল।

এই অভ্যন্তরীণ বাজার আবার ২ ভাগে বিভক্ত।

ক. স্থানীয় বাজার ও

খ. আমদানি রপ্তানি বাজার

বিদেশে রপ্তানিযোগ্য পণ্য এ অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে ভোগ্য পণ্যের পৃথক পৃথক বাজার ছিল। ঢাকা, নোয়াখালি, রংপুর ও দিনাজপুর থেকে শহরে চাল আমদানি করা হত। শতাব্দীর শেষে এক দিনাজপুর জেলায় চল্লিশ লক্ষ টাকার খাদ্য শস্য বেচাকেনা হত।[৭১] দিনাজপুর তৎকালীন সময়ে অভ্যন্তরীণ খাদ্য বাজারের এক উল্লেখযোগ্য নাম কারণ সে সময় উৎকৃষ্ট ধরনের অনেক প্রকারের চাল উৎপন্ন হত।

ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করা পণ্যসামগ্রী নদী বন্দরগুলিতে এসে জমা হত এবং সেখান থেকে জেলাগুলিতে বিক্রয়ের জন্য পাঠানো হত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য অবাধ বা মুক্ত ছিলনা। পলাশীর আগে বাংলার বণিকরা অপেক্ষাকৃত স্বাধীনভাবে ব্যবসা বাণিজ্য করত। তাদের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের উপর দু'ধরনের শুল্ক দিতে হত। বাংলার নবাবরা বিভিন্ন শ্রেণীর বণিকদের কাছ থেকে বিভিন্ন হারে বাণিজ্য শুল্ক আদায়

---

[৬৯] মমতাজুর রহমান তরফদার, *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, পৃ. ১৩৯।

[৭০] বিজয়রাম সেবিশারদদের '*তীর্থ মঙ্গলে ভগবানগোলা এবং রশিকলাল গুপ্তের মহারাজ রাজ বল্লব সেন*' রাজনগর বাজারের বিবরণ আছে।

[৭১] এন.কে সিংহ, *দি ইকনমিক হিস্ট্রি অব বেঙ্গল*, ২য় খন্ড, কলকাতা, ১৯৫৬-৭০, পৃ. ২০৪।

করতেন। মুসলমান দেশীয় বণিকরা ২ $\frac{১}{২}$ শতাংশ বাণিজ্য শুল্ক, এশীয় হিন্দুর ৫ শতাংশ এবং ইউরোপীয় ৩ $\frac{১}{২}$ শতাংশ। কোম্পানীর বাণিজ্যিক অধিকারকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ না করে কোম্পানীর কর্মচারীরা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের বিনাশুল্কে বাণিজ্য এবং নবাবের শুল্ক ফাঁকি দিত।

এজন্য প্রাক-পলাশী যুগে বাংলার নবাবদের সঙ্গে ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বিরোধ লেগেই থাকত।[৭২]

প্রাক-পলাশী যুগে বাংলার নবাবদের থেকে বিভিন্ন বণিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এক কালীন দেয় শুল্কের বিনিময়ে কয়েকটি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যে একচেটিয়া ব্যবসায়ের অধিকার লাভ করত। আর্মেনীয় বণিক খাজা ওয়াজেদ পলাশী যুদ্ধের আগে ও পরে লবণের ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করত। মীর আফজাল নামে এক ব্যক্তি বিহারের আফিম ব্যবসায়ে অনুরূপ সুবিধা পেয়েছিল। এভাবে বাংলার সীমান্ত জেলার ফৌজদাররা পূর্ণিমা, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট প্রভৃতি অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে কতগুলি পণ্যের ক্ষেত্রে সুবিধা পেত। এই পণ্যগুলো হল- তামাক, সুপারি ও চুন।

পলাশী যুদ্ধের আগেই ইউরোপীয় বণিকরা ব্যক্তিগত ব্যবসার মাধ্যমে (Private Trade) বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে বিশেষত লবণ, আফিম, তামাক ও সুপারির ব্যবসায়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশ নিত। এদেশের রাজশক্তির সঙ্গে ইউরোপীয়দের বিরোধ দেখা যায় কারণ এই পন্যগুলি সরকারের বিশেষ বাণিজ্য তালিকার অন্তর্ভূক্ত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে লবণের ব্যবসায় লাভ হত কমপক্ষে ৫০ শতাংশ। অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যেও বেশ ভাল লাভ হত। অবশ্য সব সময় সব জিনিসের লভ্যাংশ একরকম থাকে না। তাই অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে লাভের হার এরকম উত্থান পতন দেখা দিত।

পলাশী যুদ্ধের পরে কোম্পানীর কর্মচারীরা বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য নিজেদের হাতে কুক্ষিগত করার চেষ্টা করে। এদেশীয় বণিকগোষ্ঠীর বাণিজ্য অনেকটা কোণঠাসা হয়ে যায়। লবণ, সুপারি, তামাক, চাল, তেল, ঘি, আফিম প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যবসায় নিজেদের একাধিপত্য স্থাপন করে।

---

[৭২] এস. সি. হিল, বেঙ্গল ইন ১৭৫৬-১৭৫৭, ৩য় খন্ড। সংস্করণী-ইলাস্ট্রেটেড রিপ্রিন্ট পাবলিশার্স, বিবলিওবাজার-২০১৬, তাদের অবৈধ বাণিজ্যের ফলে নবাবের শুল্ক খাতে দেড় কোটি টাকা ক্ষতির অভিযোগে সিরাজুদ্দৌলা ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জুনে ইংরাজদের কাশিম বাজার কুঠি দখল করে।

এ ঘটনাটিকে “Plassey plunder” বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে, ইংরেজ বণিকরা বিনাশুল্কে বাণিজ্য পরিচালনা করায় দুভাবে বাংলার ক্ষতি হতে থাকে। যেমন :

ক. বাংলা সরকার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য শুল্ক থেকে বঞ্চিত হলেন

খ. এদেশীয় বণিকরা ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকতে না পেরে অবক্ষয়ের সম্মুখীন হন।

তাই ইংরেজ বণিকদের নিজেদের ক্ষমতা সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতনতা নবাবের অধিকারের উপর আঘাত স্বরূপ (encroachments on the rights of the Nawabs) ১৯৬২ সালের মে মাসে বাংলার তৎকালীন গভর্ণর হেনরি ভ্যান্সিটার্টকে লেখা একটি চিঠিতে বাংলার নবাব মীরকাশিম কোম্পানীর কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের স্বরূপটি প্রকাশ করেছিলেন।[৭৩]

১৭৬২ সনের অক্টোবর মাসে ঢাকায় কালেক্টর মাহমেদ আলি গভর্ণর ভ্যান্সিটার্টকে লিখেছেন : প্রথমত, একদল বণিক ফ্যাক্টরির লোকদের সঙ্গে আঁতাত করে নিজেদের নৌকায় ইংরেজ পতাকা উড়িয়ে নিজেদের পণ্য ইংরেজদের নামে বহন করে; এর ফলে শাহ বন্দর ও অন্যান্য শুল্কের ক্ষতি হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, লক্ষিপুর ও ঢাকা ফ্যাক্টরির গোমস্তারা বণিক ও অন্যান্যদের বাজার থেকে চড়াদামে তামাক, তুলা, লোহা ও অন্যান্য অনেক জিনিস কিনতে বাধ্য করে, তারপর বলপ্রয়োগে তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে। এবং তাদের কাছ থেকে পিওনদের জন্য রাহাখরচ (diet money) নেয় এবং চুক্তি ভাগ করলে জরিমানা দিতে বাধ্য করে। এরকম কাজকর্মের ফলে আড়ঙ ও অন্যন্য বাজার ধ্বংস হচ্ছে।

তৃতীয়ত, সখিপুরের গোমস্তারা ভূমি-রাজস্ব না দিয়ে তহশিলদারের কাছ থেকে বলপ্রয়োগে তালুকদারের তালুকগুলি নিজেদের ভোগের জন্যে অধিকার করেছে। কিছু লোকের উস্কানিতে তারা অভিযোগ তদন্তের নামে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং ইউরোপীয় ও সিপাহীদের দস্তকসহ দেশের অভ্যন্তরে পাঠায়। বিভিন্ন স্থানে তারা শুল্ক চৌকি বসায় এবং গরীব মানুষ যা পায় বিক্রি করে টাকা সংগ্রহ করে। মূলত : অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিগত বাণিজ্যের প্রশ্নে ইংরেজদের সঙ্গে মীরকাশিমের সংঘর্ষ বেঁধেছিল (১৭৬৩-৬৪)। বিলাতের ডিরেক্টর সভা এতে চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং নির্দেশ পাঠালেন

---

[৭৩] এ রকম কয়েককটি চিঠি এবং ইংরেজ বণিকদের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সম্পর্কে ভ্যান্সিটার্ট ও ওয়ারেন হেস্টিংসের অভিমত জানার জন্য দ্রঃ রমেশ চন্দ দত্তের ‘*দি ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া*, ১ম খন্ড, দ্যা ইউনিভার্সিটি অব মিশিগান, ১৬ইং ডিসেম্বর ২০১২, পৃ. ১৮-৩৪।

কোম্পানীর কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বন্ধ করে দিয়ে কর্মচারী ও গোমস্তাদের জেলা থেকে প্রত্যাহার করা হোক। এ নির্দেশ কার্যকর করা অবশ্য সম্ভব হয়নি। তবে ক্লাইভ দ্বিতীয় বার বাংলার গভর্ণর (১৭৫৫-১৭৬৭) হয়ে এসে কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছিলেন।

কোম্পানী তার কর্মচারীদের একচেটিয়া ব্যবসা তুলে দেওয়ার জন্য আগ্রহ দেখিয়েছিল ঠিকই তবে কোম্পানী নিজে লবণ, সোরা ও আফিমের উপর একাধিপত্য স্থাপনে এগিয়ে গেল। কোম্পানীর কর্মচারীরা এদেশের বণিকদের মাধ্যমে এ ব্যবসাগুলিতে নিজেদের স্বার্থ বজায় রেখে চলছিল। ১৭৭৩ খ্রিঃ থেকে কোম্পানী বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে অবাধ ও মুক্তনীতি (Open and free) অনুসরণ করতে থাকে। কোম্পানী ক্রমশ একচেটিয়া ব্যবসা ও ব্যক্তিগত ব্যবসা থেকে কর্মচারীদের সরিয়ে দেয়। হেস্টিংস ১৭৭৩-এ দস্তক ব্যবস্থা তুলে দেন। এদেশী ও বিদেশী সব বণিকের জন্য ২$\frac{১}{২}$ শতাংশ হারে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য শুল্ক ধার্য হয়। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য পণ্য চলাচল অবাধ ও মুক্ত রাখার জন্য ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার অসংখ্য শুল্ক চৌকি তুলে দিয়ে কলকাতা, ঢাকা, পাটনা, মুর্শিদাবাদ ও হুগলীতে অভ্যন্তরীণ শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা করলেন। জোর করে উৎপাদকের দাদন দেওয়ার ব্যবস্থা রহিত করা হয়। আগেই গভর্ণর ও কাউন্সিলের সদস্যদের ব্যক্তিগত ব্যবসা বন্ধ হয়েছিল। ১৭৭৩ খ্রিঃ নাগাদ কোম্পানীর কর্মচারীরা লবণ, সুপারি, তামাক, খাদ্যশস্য ও আফিমে ব্যক্তিগত ব্যবসা করতে পারতনা। কর্ণওয়ালিশ রাজস্ব ও বিচার বিভাগের কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা রহিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এছাড়াও কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের উপর নানারকম বিধি নিষেধ আরোপিত হয়। এ সব সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা টিকে ছিল। শতাব্দীর শেষ দিকে চিনি ও নীলের ব্যবসা লাভজনক হওয়াতে তারা ঐ দিকে গুরুত্ব দিয়েছিল।

অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে, উৎপাদকদের নিকট থেকে পণ্য সংগ্রহ করত পাইকার বা ফড়িয়াশ্রেণীর ব্যবসায়ীরা (Petty trader) এই ফড়িয়া ব্যবসায়ীরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে পণ্য কিনত এবং তারা বিভিন্ন গঞ্জ, বাজার, মেলা, হবি থেকে পণ্য সংগ্রহ করত এবং সেগুলো সংগ্রহ করে বেপারি ও দালালদের (middle order merchant) রো সরবরাহ করত। এই বেপারি ও দালালরা সংগ্রহ করা পণ্য মহাজন বা পাইকারি ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করত। স্থানীয় ব্যবসায়ী, আড়তদার বা মহাজন তাদের সংগৃহীত পণ্য বড় ব্যবসায়ী, মিল-মালিক বা রপ্তানিকারকদের নিকট বিক্রি করত। তাই বলা যায়

উৎপাদক, ফড়িয়া-পাইকার, বেপারী-দালাল, স্থানীয় ব্যবসায়ী-আড়তদার ও বড় ব্যবসায়ী-মিলমালিক-রপ্তানিকারকদের নিয়ে বাংলার অভ্যন্তরীণ বাজারের কাঠামোটি গড়ে উঠেছিল।[৭৪]

কিন্তু এই অভ্যন্তরীণ বাজার সব সময় এই কাঠামো অনুসরণ করতনা। পণ্য কি করত এবং কোন কোন শস্যের ক্ষেত্রে উৎপাদকরা সরাসরি স্থানীয় মহাজন বা আড়তদারদের কাছে পণ্য বিক্রি করত কারণ চাষের সময় এদের কাছ থেকে টাকা আগাম নিত। সারা বছর ধরে, এদেশের বড় বড় ব্যবসায়ী ও মহাজনরা সুদ ও ব্যাংকিং- এর কারবারে নিযুক্ত থাকত।

ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গোয়ালন্দ, বাখেরগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, কুষ্টিয়া, ফাটোয়া, ফালনা, নন্দনঘবি, ভদ্রেশ্বর, রানীগঞ্জ আসানসোল ও বর্ধমান এ শতকে পণ্য বেচাকেনার প্রধান ঘাঁটি। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের পাট, বাখেরগঞ্জের চাল, সিরাজগঞ্জের পাট, তৈলবীজ ও তামাক এবং রানীগঞ্জ, আসানসোল ও বর্ধমান থেকে জয়লা ও লোহা প্রধানত রপ্তানি হত। এদেশের বাণিজ্য কেন্দ্রগুলি থেকে লবণ, পোশাক, জামা, কাপড়, লোহা ও পিতলের জিনিসপত্র দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠানো হত। বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের প্রধান পণ্য হল চাল, ডাল, অন্যান্য খাদ্যশস্য গম, যব ইত্যাদি আরও রয়েছে তৈলবীজ, কাঁচা রেশম, রেশম কাপড়, লবণ, তুলা, সুতার কাপড়, চিনি, তামাক, পাট, চটের থলি, ঘি, হাতির দাঁতের কাজ, কুমোরের প্রস্তুত সামগ্রী, পিতল ও কাঁসার বাসনপত্র, মশলা, নীল, ধাতবদ্রব্য ও মূলবান পাথর। কলকাতার সঙ্গে এদেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য যুক্ত থাকা এবং কলকাতার বাণিজ্যের হ্রাসবৃদ্ধি দিয়ে বাংলা বাণিজ্যের উত্থান-পতনের পরিমাপ করা চলে। বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যে সমস্ত পণ্য কলকাতায় আমদানি করা হত তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল পাট, খাদ্যশস্য, ডাল, চা, তৈলবীজ, কয়লা, ফল ও সবজি, চামড়া, নীল, তুলা, ধাতু ও ধাতবদ্রব্য লাক্ষা রেশম, খড় ইত্যাদি আর এখান থেকে বাংলার বিভিন্ন জেলায় পাঠানো হত সুতী কাপড়, লবন, ধাতব দ্রব্য, খাদ্যশস্য, ডাল, চিনি, রেলওয়ের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, সুতা, সরিষা, নারিকেল তেল, চটের ব্যাগ ও কেরোসিন। ১৮৭৬-৭৭ সনে কলকাতা বন্দরে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে মোট আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ হল ৪৬, ১৫, ৩৮, ৫১০ টাকা, ১৯০০-১৯০১ সনে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১০৫, ৬০, ০১, ৯৬৮ টাকায়।[৭৫]

---

[৭৪] William Willson Hunter, *A Statistical Account of Assam*, Trubner and Co: London, 1879, p. 435-436, এস. ভট্টাচার্য, *কেম্ব্রিজ ইকোনমিক হিস্ট্রি*, কেম্ব্রিজ ইউভার্সিটি প্রেস, মার্চ ২০০৮, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৪ ।

[৭৫] নীলমণি মূখার্জী, *দি পোর্ট অফ কলকাতা*, এ শর্ট হিস্ট্রি (কলকাতা: দি কমিশনারস অফ দি পোর্ট অফ কলকাতা,১৯৬৮) পৃ: ৩৭৭।

অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের আরেক বৈশিষ্ট্য হল অল্প পুঁজির ভ্রাম্যমাণ বণিকদল (peddling trader)। উত্তর ভারত, লক্ষ্ণৌ, কাশী, পাটনা, ভূটান ও নেপাল থেকে বণিকদল তাদের পণ্য নিয়ে বাংলার জেলাগুলিতে ঘুরে ঘুরে বিক্রি করত। এদের সঙ্গে থাকত নানাধরনের কাপড়, হিমালয়ের উদ্ভিজ ফসল, বীচি, মালা, ভেষজদ্রব্য ইত্যাদি। দ্বিতীয় শতকে, বাংলার কৃষিপণ্যের বৈদেশিক চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়াতে এদেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে আরও জোরালো হয়। এদেশের তুলা, গম, পাট, চাল, তিসি আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিষ্ঠা পায় এবং স্বাভাবিক ভাবে এগুলোর অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও ক্রমশ বেড়ে চলে।[৭৬]

অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বাণিজ্যের প্রধান পণ্যগুলি হল এদেশের কৃষিজ সম্পদ। এদেশের অন্যতম প্রধান কৃষিপণ্য চাল দেশের একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়মিত চালান দেওয়া হত এবং শতকের দ্বিতীয়ভাবে এটি অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পণ্য। জেলার অভ্যন্তরে চালের আমদানি রপ্তানি চলত। শহরবাসী মানুষের প্রয়োজন এবং ক্রমবর্ধমান শিল্প শ্রমিকদের চাহিদাতে চালের ব্যবসা প্রসারিত হয়। এক কলকাতা শহরে বছরে ৭০ লক্ষ মণ চালের প্রয়োজন হত।[৭৭]

বুকানন হ্যামিলটন জানিয়েছেন দক্ষিণ বিহারের জেলাগুলি থেকে নিয়মিত ভাবে কাশী, মুর্শিদাবাদ ও কলকাতায় চাল পাঠানো হত। দিনাজপুর, নোয়াখালী, বরিশাল ও ঢাকা থেকে চাল পাঠানো হত মুর্শিদাবাদ ও কলকাতায়। বাংলায় চাল ব্যবসায়ীদের একটি বৈশিষ্ট্য হল যেসব জেলা চাল রপ্তানি করে তারা আবার অন্য জেলা থেকে চাল আমদানি করে। নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও বাখেরগঞ্জ চাল আমদানি কারক জেলা। এ জেলা গুলি নিজেদের উৎপাদিত চাল বেশি দামে বিক্রি করে অন্য জেলা থেকে অপেক্ষাকৃত সস্তা ও নিকৃষ্টমানের চাল নিজেদের ভোগের জন্য আমদানি করে। এদেশের অন্যান্য জেলাতেও এ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।[৭৮]

লবণ আরেকটি পণ্য অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের, এর প্রধান কেন্দ্র ছিল মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগণা, নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম থেকে এ পণ্য কলকাতায় রপ্তানি করা হত। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের অপর প্রধান পণ্য পাট উৎপন্ন হত চব্বিশ পরগনা, যশোর, রাজশাহী, পাবনা, ফরিদপুর ও নদীয়াতে। বাইরে থেকে আমদানি করা হত লবণ, কাপড়, জুতো, চামড়া, পিতল-কাঁসার বাসনপত্র, মশলা, নারিকেল,

---

[৭৬] ডি. আর গ্যাডগিল, *দি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইভুলেশন অব ইন্ডিয়া*, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭৮, পৃ. ৬৫।

[৭৭] বিনয় চৌধুরী, *বাংলার ভূমি ব্যবস্থাপনার রূপরেখা*, কলকাতা ১৯৮১, পৃ. ২৪৮-২৪৯।

[৭৮] উইলিয়াম উইলসন হান্টার, *এ্যানালস অব রুরাল বেঙ্গল: লন্ডন*, স্মিথ এল্ডার এণ্ড কো: ১৮৬৮, পৃ. ২৭২-২৭৩।

ক্যাস্টার অয়েল ও নারিকেল তেল। যে যে পণ্য পাবনা ও কলকাতার মধ্যে আদান-প্রদান হত সেগুলি হল ডাল, চাল, ধান, পাট, লোহা ও লোহার জিনিসপত্র, সুপারি, জ্বালানী তেল, তৈলবীজ, লবণ, মশরা, চিনি তামাক, নারিকেল খড় ও বাঁশ। এ জেলার প্রধান আমদানি হল জ্বালানী তেল, তুলা, সুপারি, লোহা ও লোহার জিনিস, চুন, চুনাপাথর, লবণ, মশলা, চিনি, কাঠ, বাঁশ, ইউরোপীয় বস্ত্র, নারিকেল ও তামাক।[৭৯]

উৎপাদিত পণ্য :

অষ্টাদশ শতাব্দীতে অসংখ্য পরিমাণে কৃষিজ পণ্য উৎপাদিত হয়। প্রধান প্রধান উৎপাদিত পণ্য হল— ধান, গম, যব, রবিশস্য, আখ, তামাক, তুলা ও রেশমের জন্য তুঁতে গাছের চাষ, পাট, নীল, সুপারি, পান প্রভৃতি। এর মধ্যে পাট ও নীল অভ্যন্তরীণ চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদিত হত, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পাট ও নীলের উৎপাদন ইউরোপে শিল্প-বিপ্লবের পরিস্থিতি শুরু হয়। রংপুর, কুচবিহার, পাবনা, রাজশাহী, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও মালদা প্রভৃতি উত্তরবঙ্গের জেলা গুলিতে উৎপন্ন হত ধান, তুলা, পান সুপারী, তামাক, রেশম, লংকা ও আফিম, আর ফলের মধ্যে রয়েছে আম, কলা ও কমলা লেবু। মেদীনিপুর, বীরভূম ও বর্ধমান জেলাতে ধান, গম, যব, তুলা, আখ, কলাই ও তৈলবীজ উৎপন্ন হত। পূর্ববঙ্গের ঢাকা, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট ও নোয়াখালীতে ধান, তুলা, আঁখ, পান, সুপারি, নারিকেল ও কমলালেবু, আম, সাংতাড়া (বাতাবিলেবু) ও চীনামূল উৎপন্ন হত। ধান, পাট, নীল, তৈলবীজ, সুপারি, লংকা ও কলাই, মুসুর, মটর, ছোলা, অড়হর প্রভৃতি।[৮০]

বাংলায় উৎপন্ন কৃষিজ পণ্য সম্পর্কে রবার্ট ডেরমে বলেছেন — বাংলার সবচেয়ে বড় ফসল ধান। নিম্নবঙ্গে ধান এত প্রচুর পরিমানে জন্মে যে ফসল উঠানোর সময় মাত্র এক ফার্দিতে দু পাউন্ড ধান পাওয়া যায়। আরো অনেক প্রকারের শস্য, অনেক ফল ও সবজি, খাদ্যের প্রয়োজনীয় অনেক মশলা বাঙালীরা উৎপাদন করে। আখ চাষের জন্য কিঞ্চিৎ বেশি পরিশ্রম ও যত্নের প্রয়োজন হয়।[৮১]

বাংলার ধান চাষ সম্পর্কে 'খুলাসাৎ' রচয়িতার মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন বাংলায় বহুজাতের ধান উৎপন্ন হয়। প্রতিটি জাতের একটি করে শস্য কণা যদি একটি ভান্ডে রাখা হয় তাহলে

---

[৭৯] উইলিয়াম উইলসন হান্টার, *এ্যানালস অব রুরাল বেঙ্গল: লন্ডন*, স্মিথ এল্ডার এণ্ড কো: ১৮৬৮, পৃ. ৩৩৪-৩৩৯

[৮০] ইরফান হাবিব, *এ্যান এ্যাটলাস অব দি মুঘল এম্পায়ার*, ম্যাপ ১১ বি দ্রষ্টব্য। জেমস, রেনেল, দি জান 'লিসু, পৃ. ১০-৭৫।

[৮১] রবার্ট ওরমে, *এ হিস্ট্রি অব দি মিলিটারি ট্রানজাকশনস অব দি ব্রিটিশ নেশান ইন্দোস্থান ফরম দি ইয়ার ১৭৪৫*, লন্ডন: ১৭৬৩, ২য় খন্ড, পৃ. ৩৪।

সেটি পূর্ণ হয়ে যায়।[৮২] বাংলায় আউস, আমন ও বোরো এই তিন ধরনের ধান চাষ ছিল। গ্রীষ্মকালে আউস, বর্ষায় আমন ও বসন্তে বোরো ধান চাষের রেওয়াজ ছিল। সেসময় গম ও ডাল চাষ হত। প্রাক্-পলাশী যুগে বাটাভিয়াতে (বর্তমান ইন্দোনেশিয়া) গম রপ্তানি করা হত। পরবর্তীতে উত্তমাশা অন্তরীপের শস্য ব্যবসাকে অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য গম রপ্তানি কমিয়ে দেওয়া হয়।

মাসকালাই, মুগ, ছোলা, অড়হর, মুসুরি, বরবটী, মটর, মাড়ুড়া, ভুট্টা, যব এ খেসারির কথা সমকালীন বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যায়। 'অন্নদামঙ্গলে' ভারতচন্দ্র বাংলার সমস্ত রকম উৎপন্ন খাদ্যশস্যের পরিচয় দেন। যেমনঃ

ধান, চাল, মাষ, মুগ, ছোলা অড়হর,
মসুরাদি বরবটী বাটুলা মটর।
দেধান মারয়া কোদা চিনাভুরা খর।
জনার প্রভৃতি গম আদি আর সব।[৮৩]

গঙ্গারাম তাঁর গ্রন্থে চাউল, কলসি, মুসুরি ও খেসারির কথা উল্লেখ করেছেন।

প্রতিযোগিতামূলক বাজার না থাকায় বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য অধঃপতনের কারণগুলো উল্লেখ করা হলো :

ক. পলাশী উত্তরযুগে কোম্পানীর কর্মচারীরা বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য তাদের ক্ষমতার ভিতরে নিয়ে আসে এবং ক্ষমতা প্রয়োগ করেই ব্যবসা পরিচালনা করে। বাংলার নবাবরা সবাই (মীরকাসিমের পরে মীরজাফর (দ্বিতীয়বার) নাজমুদ্দৌলা, সৈফুদ্দৌলা, মুবারক উদ্দৌলা এ উৎপীড়নমূলক ব্যবসার নীরব দর্শক ছিলেন মাত্র। লড কর্ণওয়ালিশের আগে কোম্পানী সেরকম কুক্ষিগত মূলক ব্যবস্থা চালু করতে পারেনি।

খ. প্রায় প্রতিটি উৎপন্ন পণ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের উপর নানা প্রকার কর ও শুল্ক প্রয়োগ করা হয়েছিল সরকার, জমিদার ও ইজারাদার কর্তৃক।

গ. শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রাস্তাঘাট ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা খারাপ হতে থাকে। নবাবদের অবহেলার ফলে জল ও স্থল পথের অবস্থা খারাপ হতে থাকে।

---

[৮২] সৃজন রায় ভান্ডারী, খুলাসাৎ, যদুনাথ সরকার, *ইন্ডিয়া অব আরঙ্গজেব*, পৃ. ৪০-৪১।

[৮৩] এ.সি.ব্যানার্জী, *দি এগ্রারিয়ান সিস্টেম অব বেঙ্গল*, কে. পিবাগচী এন্ড কো., ১ম খন্ড, পৃ. ৬৮।

ঘ. প্রাথমিক শিথিলতার কারণে সন্ন্যাসী, ফকির ও দস্যুরা তাদের ইচ্ছামত যত্রতত্র লুটপাট, খুন, ডাকাতি ও রাহাজানি করতে পারত। এজন্য অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের অবস্থা শোচনীয় পর্যায়ে চলে আসে।

রপ্তানি পণ্য :

বাংলা থেকে ইউরোপীয় কোম্পানীগুলির প্রধান রপ্তানিদ্রব্য ছিল বস্ত্র। কাঁচা রেশম ও সোরা। ছোটো খাটো রকমারি দ্রব্য রপ্তানি তালিকায় ছিল যেমন : চিনি, চাল, গম, ঘি ও সরষের তেল। আরও রয়েছে সোম, কোরাক্স (Corax) গালা, কড়ি ও চটের থলি ও রপ্তানি হতো। সোরা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাদের রপ্তানি পণ্যের মধ্যে। সতেরো শতকের সত্তরের দশকে কাঁচা রেশম রপ্তানির গুরুত্ব লাভ করে এবং আশির দশকে রেশম রপ্তানি অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু আশির দশক থেকে ইউরোপে বাংলার বস্ত্ররপ্তানি অত্যাধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। কারণ তখন বাংলার কাপড় ছিল সস্তা এবং ইংল্যান্ড ও ইউরোপে এই সস্তা কাপড় খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এরপর থেকে ইউরোপের বাজারে বাংলার কাপড়ের চাহিদা যেমন বাড়তে থাকে, তেমনি বাংলা থেকে কোম্পানীগুলির রপ্তানির পরিমাণ ও আনুপার্শ্বিকহারে বাড়তে থাকে। ফলে আমাদের আলোচ্য সময়ের শেষ অবধি বাংলা থেকে ইউরোপীয় বিভিন্ন কোম্পানীর পণ্য তালিকায় রপ্তানি পণ্য হিসেবে সবচেয়ে বেশি স্থান দখল করে আছে। ইউরোপীয় কোম্পানীগুলির বিভিন্ন পণ্যের রপ্তানিদ্রব্যের আনুপাতিক অংশ নিচের সারণি থেকে জানা যাবেঃ

পণ্য	**ইংরেজ**	
	১৬৭৫-৭৬	**১৭০১-১৭০২**
বস্ত্র	**৭১**	**৭১**
কাঁচা রেশম	**১২**	**২২**
সোরা	**১১**	**১**
আফিম	×	×

অন্যান্য	৬	৬
মোট	১০০	১০০

[সূত্র : সুশীল চৌধুরী, ট্রেড এ্যান্ড কমার্শিয়াল অরগানাইজেশন ইন বেঙ্গল, ২৫৩-২০৪, ওম প্রকাশ, দি ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এন্ড দি ইকনমি অব বেঙ্গল ৭২।]

আঠারো শতকের দ্বিতীয় দশকে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রপ্তানি বাণিজ্যের যে তথ্য আমরা পাই, তা হতে জানা যায় যে, আঠারো শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত কোম্পানীগুলির রপ্তানি পণ্যের আনুপাতিক হার একই রকম। সর্বপ্রথমে বস্ত্র, তারপর কাঁচা রেশম ও সর্বশেষে সোরার স্থান।

সারণী : বাংলা থেকে রপ্তানি পণ্যের আনুপাতিক হার

পণ্য	**বছর**	**বছর**	**বছর**	**বছর**
	১৭১২-১৩	**১৭১৪-১৫**	**১৭১৬-১৭**	**১৭১৯-২০**
বস্ত্র	৮৩	৮৩	৭১	৯১
কাঁচা রেশম	৭	১১	২১	৫
সোরা	৪	৪	৪	৩
অন্যান্য	৬	২	৪	১

[সূত্র : সুশীল চৌধুরী, ট্রেড এ্যান্ড কমার্শিয়াল অরগানাইজেশন ইন বেঙ্গল, ২৫৪]

প্রথমদিকে বাংলায় ইউরোপীয় বাণিজ্য তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। বাংলায় ইংরেজ কোম্পানীর রপ্তানি বাণিজ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ১৭৩০ এর দশক পর্যন্ত এই বাণিজ্য ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। অবশ্য এর মধ্যে ইউরোপ ও ভারতবর্ষের মধ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি বিঘ্নিত হয়েছিল। সতেরো শতকের মাঝামাঝিতে ইংরেজ বাণিজ্যের হঠাৎ গতিবৃদ্ধি হয় যেমন : (১৬৭৫-৭৬), (১৬৭৬-৭৭)। এই দু'বছরের রপ্তানি পণ্যের গড়ে মূল্য দাঁড়ায় ৪, ৪৩, ৩৭৬ টাকা। বাংলায় ইংরেজ কোম্পানীর রপ্তানির বার্ষিক গড়পড়তা মূল্যের দীর্ঘস্থায়ী প্রবণতা

বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ১৭৩০-এর দশকে প্রথমদিক রপ্তানি বাণিজ্যের উর্ধ্বগতিই দেখা যায়। তারপর মধ্য ত্রিশের দশকে সামান্য একটু কমে গিয়ে আবার চল্লিশের দশকের প্রথমদিকে তা সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হয় এবং এরপর থেকে পলাশীযুদ্ধ পর্যন্ত অবশ্য ইংরেজদের রপ্তানি বাণিজ্য ক্রমোন্নতি লক্ষণীয়।

সোরা :

বারুদ তৈরীর একটি অত্যাবশ্যক উপকরণ সোরা। সোরার প্রচন্ড চাহিদা ছিল পাশ্চাত্যে। ইউরোপগামী জাহাজের সমুদ্রপথে জাহাজের ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ছিল। ভারতের গুজরাট, করোমন্ডল উপকূল ও বিহারে সোরা তৈরী হতো। সতেরো শতকের মাঝামাঝি সময়ে বিহারেই ইউরোপীয় বাজারে সোরা সরবরাহকারী। এ থেকে এটা বুঝা যায় যে, সোরা উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় বিহারের কতকগুলি সুবিধা ছিল। যথা: দাম কম, গুণগত উৎকর্ষ ও গঙ্গার নিকটবর্তী হওয়ায় দ্রুত অথচ সুলভে হুগলী বন্দরে রপ্তানিপণ্য পৌঁছে দেয়ার সুবিধা। চম্পারণ, বিহার, হাজিপুর, সরণ এবং তিরহুত জেলায় তৈরী হতো সোরা। আর এই সোরা তৈরী করত গুজিয়া নামক সম্প্রদায়ের যোদ্ধারা। সাধারণত নভেম্বর থেকে জুনের মাঝামাঝিতে সোরা উৎপাদিত হত এবং তিন প্রকারের সোরা তৈরী হত। ক. পরিশোধিত বা দোবারা কাবেসা খ. দুবার সিদ্ধ বা দোবার এবং গ. অপরিশোধিত বা কাঁচা।

ইউরোপীয় কোম্পানীগুলি প্রধানত পরিশোধিত সোরা রপ্তানি করতো, না হলে তা বারুদ তৈরীর কাজে ব্যবহার করা যেতোনা। কাঁচা সোরা ভারী বলে এতে জাহাজ ভাড়ায় খরচ বেশি পড়ত এবং কাঁচা সোরা অপরিশোধিত হওয়ায় তা রপ্তানি করলে অর্থনৈতিক দিক থেকে মোটেই সাশ্রয় হতোনা। কিন্তু কাঁচা সোরার উপর শুল্ক দিতে হতো একই হারে।[৮৪]

সোরা ব্যবসায়ে সরবরাহের অবস্থা মোটামুটি ভালই ছিল, বাণিজ্যের বিস্তার ও সম্ভব ছিল। তবে বাঁধা ছিল একটাই। তা হলো স্থানীয় শাসক, উচ্চকর্মচারী ও তাদের পেটোয়া বণিকরা এই ব্যবসাকে একচেটিয়া করে তোলার জন্য সচেষ্ট ছিল। বাংলার মুঘল সুবাদার মীর জুমলা, শায়েস্তা খান ও আজিম-উশ-শান এই ধরনের চেষ্টা করেছেন। তবে এতে সব সময় তাঁরা খুব একটা সফল হননি।[৮৫]

---

[৮৪] Despatch Book, India Office Library, Vol-95, p. 232.

[৮৫] Susil Chaudhuri, Trade and commercial organization in Bengal (1650-1720) with special reference to the English East India Company, (Firma K. L. Mokhopathyay, Calcutta-1975, p.166.

আঠারো শতকের চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে ও পঞ্চাশের দশকে প্রথমে উমিচাঁদ ও পরে খোজা ওয়াজিদ একচেটিয়াভাবে সোরার ব্যবসা করেন। উমিচাঁদের ভাই দীপচাঁদ বিহারে সোরার প্রধান কেন্দ্র সরকার মিরঙ্গ এর (যবন) ফৌজদার ছিলে।[৮৬]

নবাব আলীবর্দীকে ২৫,০০০ টাকা দিয়ে ১৭৫৩ সালে ওয়াজিদ সোরার বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার লাভ করেন। বিহারের ওয়াজিদের দুই প্রতিনিধি মীর আফজাল ও (ওয়াজিদের ভাই) খোজা আসরফ ওয়াজিদের হয়ে ব্যবসা চালাতেন।

এই একচেটিয়া ব্যবসার ফলে অবশ্য ইউরোপীয় কোম্পানীগুলির পণ্যসংগ্রহ করতে হতো। বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে এদের আগাম টাকা দিয়ে সোরা সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত করা হতো। মাঝে মাঝে সাধারণ ব্যবসায়ী বা দালালদের সোরা সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত করা হতো। সোরার বাজারে, ইউরোপীয় কোম্পানী গুলির মধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা হত।

কাঁচা রেশম :

ইউরোপীয় বাণিজ্যে সুতিবস্ত্রের পরেই অন্যতম পণ্য ছিল কঁাচা রেশম। ১৬৭০ এর দশকের মাঝামাঝি বাংলার রেশম ইউরোপীয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাংলার রেশমের প্রধান আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, চীন ও পারস্যের রেশমের তুলনায় তার দাম অনেক কম এবং এজন্য ইউরোপে তা বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা করা যেতো। বাংলায় ইউরোপীয়দের আগমনের পূর্বেও বাংলা থেকে আন্তঃআঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বহুল পরিমানেই হতো। এই বাণিজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল মধ্য এশিয়া থেকে আগত আগ্রা ও গুজরাটে ব্যবসায়ীরা। রেশম উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র ছিল আগ্রা, কাশিমবাজার ও মুর্শিদাবাদ সংলগ্ন অঞ্চল।

টেভারনিয়ের লিখেন যে, কাশিমবাজারে বছরে বাইশ হাজার গাট বা বস্তা (Bale) রেশম উৎপন্ন হতো, প্রত্যেক গাঁটের ওজন একশো পাউণ্ড করে।[৮৭]

১৬৬১ সালে কাশিম বাজারে ইংরেজ কুঠির প্রধান জন কেন (John Kenn) এর লিখিত বিবরণীতে জানা যায় যে, বাংলায় তিন ধরনের রেশম বোনা হত।

---

[৮৬] Bengal Public Constitutions, India office library, Range I. Vol-17 p. 769, 16 December 1744.

[৮৭] Jean-Baptiste tavernier, *Travels in India,* 1640-67, Tram, V-Ball, Voll-2, (London 1887) 1, 2-3, দেখুন, টেভ্রেরনিড়ের তথ্য সম্পর্কে ওম প্রকামেল মন্তব্য, om Prakash, Datch East India Company, 57)

ইংরেজ কোম্পানী প্রধানত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির রেশম কিনতো যথাক্রমে ৫ ঃ ৪ আনুপাতিক হারে। এই রেশমকে পাট্রা (Putta) বা সরু/পাতলা গোছের বলা হতো। এশীয় ব্যবসায়ীরা আগ্রা ও অন্যান্য অঞ্চলের যে ধরনের রেশম কিনতো তাকে বলা হতো দোলোরিয়া (dolleria)।[৮৮]

প্রথমদিকে ইউরোপীয় কোম্পানীগুলি নীতিগতভাবে বাংলার অতি সূক্ষ্ম রেশম রপ্তানি করতে একেবারে আগ্রহী ছিলনা। কারণ এ জাতীয় রেশম বেশি সূক্ষ্ম বলে ইউরোপীয় কারিগরদের পক্ষে তা ব্যবহারে অনুপযোগী বিবেচিত হতো। তাই এই রেশম বাজারে বিক্রি করতে খুবই কম শুনা যায়।[৮৯]

ইংরেজ কোম্পানী পরবর্তীতে ‘গুজরাট’ নামে রেশম; বাংলার সর্বোৎকৃষ্ট এবং সবচেয়ে দামি রেশম কিনতে শুরু করল। ১৭৩৫ সাল নাগাদ ‘গুজরাট’ রেশম ইংল্যান্ডের ক্রেতাদের কাছে এত জনপ্রিয় হয়ে উঠলো যে লন্ডন থেকে কোম্পানীর কোর্ট অব ডিরেক্টরস বাংলায় কর্মচারীদের কাছে নির্দেশ পাঠায় তারা যেন এই উৎকৃষ্টতম সূক্ষ্ম রেশম সংগ্রহ করতে চেষ্টার ক্রটি না করে এবং তারা যেন এই পণ্যের ব্যক্তিগত ব্যবসা না করে।[৯০]

কাশিমবাজার ছাড়াও রংপুর অঞ্চলেও রেশম উৎপন্ন হতো। তাছাড়া নদীয়া জেলার কুমারখালি থেকেও অন্য এক ধরনের রেশম আসতো। প্রথম দিকে ইউরোপীয় চাহিদা শুধু কাশিম বাজার অঞ্চলে উৎপন্ন রেশমে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৭৩০-এর দশক থেকে ইংরেজ কোম্পানী রংপুর ও কুমারখালি অঞ্চলের রেশম ইউরোপে রপ্তানি করার চেষ্টা শুরু করে। ইউরোপীয়রা বাংলা থেকে প্রচুর পরিমাণে রেশম রপ্তানি করলেও বাংলার রেশম বাজার নিয়ন্ত্রণ করা তাদের সাধ্যাতীত ছিল। বাংলার রেশম বাজারে যে বিপুল সংখ্যক এশীয় বণিক বাণিজ্য করতো তারাই তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারতো। কাশিম বাজারে ইংরেজ কাউন্সিলের কলকাতায় লেখা নানা চিঠিপত্রে এটা খুবই স্পষ্ট।[৯১]

১৭৪৪ সালে কাশিম বাজারের কুঠিয়ালরা রেশমের বাজার নিয়ন্ত্রণে তাদের অক্ষমতা স্পষ্টভাবে জানিয়ে লিখেছে —” যদিও গত বছরের তুলনায় এ বছর (রেশমের) দাম অনেক বেশি, তবু আমাদের পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়, কারণ আমরা (রেশমের) বাজারদর নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম কিছুদিন হলো বাজারদর অত্যন্ত চড়া যাচ্ছে।

---

[৮৮] Charles Robert Wilson, *The Early Annals of the English in Bengal (V-I) Asiatic Society*, 1963, The university of California. P. 376.

[৮৯] K. N. Chaudhuri, *The Trading world of Asia and the English East India Company*; 1660-1760, Cambridge-1978, 352

[৯০] Despatch Book, *India Office Library*, London, Vol-95, p. 1735

[৯১] উদাহরণ স্বরূপ, Coast and Bay Abstracts, Abstr, V-3, Para-38, 26 December 1733

প্রাক-পলাশী যুগে বাংলার বাণিজ্যিক অর্থনীতিতে ইউরোপীয়দের বাণিজ্যই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল-এ ধারণা বহুলপ্রচলিত এবং সাধারণভাবে স্বীকৃত। কিন্তু ১৭৪০ এবং ১৭৫০ এর দশকে এশিয় বণিকরা বাংলা থেকে যতো কাঁচা রেশম রপ্তানি করেছিল তার পরিমাণ সবগুলো ইউরোপীয় কোম্পানীর মোট রেশম রপ্তানির পরিমাণের চেয়ে অনেক বেশি। মুর্শিদাবাদ থেকে শুধুমাত্র এশীয় বণিকদের রেশম রপ্তানি ১৭৪৯-৫৩ সালে ছিল বছরে গড়ে ১৯,৮০৩ মন যার মূল্য ৫৫ লক্ষ টাকা এবং ১৭৫৪-৫৮ ছিল বছরে গড়ে ১৪,৯৩৭মন যার মূল্য ছিল ৪২ লক্ষ টাকা।

সারণী: ইংরেজ রপ্তানির পঞ্চবাৎসরিক মোট পরিমাণ: কাঁচা রেশম ১৭৩০-১৭৫৫

সময়	মোট পরিমাণ (গ্রেড পাঃ)	বার্ষিক গড় (গ্রেড পাঃ)	বার্ষিক গড় (স্মল পাঃ)	বার্ষিক গড় (মণ)
১৭৩০/৩১-১৭৩৪/৩৫	৭,০২,৯০৭	১,৪০,৫৮১	২,১০,৮৭২	২,৮১২
১৭৩৫/৩৬-১৭৩৯/৪০	৭,১৪,০০৪	১,৪২,৮০০	২,১৪,২০১	২,৮৫৬
১৭৪০/৪১-১৭৪৪/৪৫	৫,৯৬,০৫১	১,১৯,২১০	১,৭৮,৮১৫	২,৩৮৪
১৭৪৫/৪৬-১৭৪৯/৫০	৩,০০,০০১	৬০,০০০	৯০,০০০	১,২০০
১৭৫০/৫১-১৭৫৪/৫৫	২,৮৬,৬২০	৫৭,৩২৪	৮৫,৯৮৬	১,১৪৬

সূত্রঃ কে. এন. চৌধুরীর *ট্রেডিং ওয়ার্ল্ড* গ্রন্থের পৃ. ৫৩৪ থেকে পরিসংখ্যান নিয়ে হিসাব করা হয়েছে ইংল্যান্ডে রেশমের ওজন হতো গ্রেট বা বড় পাউন্ডে, যা স্মল পাঃ বা সাধারণ ইংরেজ পাউন্ডের দেড় গুণ। বাংলায় রেশমের ওজন হতো মণ ও সেরে, এক মণের সমান ৭৫ পাঃ।

ভিন্ন চিত্র পাওয়া যায় ১৭৩০ সালের দিকে যখন ইংরেজ কোম্পানীর কাঁচা রেশম রপ্তানির উচ্চতম গড় ছিল মোটামুটি ২,৮৫৬ মণ এবং তা কখনোই ৩,০০০ মণ অতিক্রম করেনি এবং ১৭৩০- এর দশক থেকে ১৭৫০-এর দশক পর্যন্ত ওলন্দাজ কোম্পানীর রপ্তানির মোট মূল্য ইংরেজ বাণিজ্যের এক তৃতীয়াংশ ছিল। একথা মনে রেখে বলা যায় যে, বাংলার কাঁচা রেশমের ওলন্দাজ রপ্তানি সবচেয়ে বেশি হলেও কখনোই ১,০০০ মণ অতিক্রম করেনি। এর সঙ্গে অন্যান্য ইউরোপীয়দের মোট রপ্তানি যদি বড় জোর ১,০০০ মণ ধরেও হিসাব করা হয়, তাহলেও বাংলার রেশমের মোট ইউরোপীয় রপ্তানির পরিমাণ বছরে ৫,০০০ মণের বেশি হতে পারে না। এটা এশীয় বণিকদের বার্ষিক রপ্তানির এক-চতুর্থাংশ। কাঁচা রেশমের ইউরোপীয় রপ্তানির মোট মূল্য তাহলে এক সের রেশমের দাম ৭ টাকা হিসাবে (ইংরেজ নথিপত্রে এশীয় বাণিজ্যের এই দরই পাওয়া যায়) ১৪ লক্ষ টাকার মতো দাঁড়ায়।

এই মূল্য আবার ১৭৫০ সালের গোড়ার দিকে এশীয় রপ্তানিবাণিজ্যের বার্ষিক গড় মূল্যের এক-চতুর্থাংশ। সুতরাং এসব তথ্যের ভিত্তিতে প্রাক-পলাশী যুগে ইউরোপীরাই বাংলায় সোনা-রূপার প্রধান আমদানিকারক ছিল বলে বক্তব্য গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

এশিয় বণিকদের রেশম রপ্তানি পঞ্চম বাৎসরিক মোট পরিমাণ :

সময়	মোট পরিমান	বাৎসরিক গড়	সর্বোচ্চ পরিমান	মোট মূল্য	গড় মূল্য (টাকা)
১৭৪৯-৫৩	৯৯,০১৬	১৯,৮০৩	২৩,৭৩৯ (১৭৫১)	২৭৭২৪৩৬৫	৫৫,৪৪,৮৭৩
১৭৫৪-৫৮	৭৪,৬৯২	১৪,৯৩৮	২১,৩৪৬ (১৭৫৭)	২০৯১৩৩৪২	৪১,৮২,৬৬৯

(সূত্রঃ বি.পি.সি. রেঞ্চ-১ খন্ড-৪৪, কনসালটেশন, ১৯ জুন-১৭৬৯, ইন্ডিয়া লাইব্রেরি অফিস, লন্ডন)

বস্ত্র :

বাংলায় ইউরোপীয় রপ্তানি বাণিজ্যের বস্ত্র ছিল প্রধানতম শিল্পজাত পণ্য। এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চল ইউরোপীয় কোম্পানীগুলোকে যে পরিমাণ বস্ত্র সরবরাহ করতো বাংলা একাই তার চেয়ে অনেক বেশি বস্ত্র এই কোম্পানীগুলোতে সরবরাহ করতো। ইউরোপে বাংলার বস্ত্রবাণিজ্যের সবচেয়ে চমকপ্রদ ঘটনা হলো ১৬৮০- এর দশকের প্রথম দিকে ইউরোপের বাজারে বাংলার কাপড়ের হঠাৎ অস্বাভাবিক চাহিদা বৃদ্ধি। এর কারণ ছিল বাংলার কাপড়ের চাহিদা ইউরোপের বাজারে দ্রুত বিস্তৃতি ও সমাদর লাভ। তাছাড়া বাংলার কাপড়ের দাম কম এবং গুণ ছিল ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে বেশি ছিল।

১৬৮০-এর দশকের ইউরোপের বাজারে বাংলার বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধিকে ইংল্যান্ড ও ইউরোপের পণ্য ভোগকারীদের এক অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটায়। বাংলার বস্ত্রের এত বৈচিত্র্য ছিল যে, তৎকালীন নথিপত্রে পঁচাত্তরটি নামের কাপড়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইংরেজদের কাছে বাংলার রেশমবস্ত্র ‘টাফাটি’ বা ‘টাফেটা’ নামে পরিচিত ছিল, ওলন্দাজরা একে বলত Armosijnen ইউরোপীয়রা অন্য যেসব রেশমবস্ত্র রপ্তানি করত তাদের মধ্যে শিরসাকার (seersucker), ‘সারসেনেটস’ (Sar cenetts), জামবার কমাল, গলাবন্ধ, এ্যাটলাস (Atlasses) ইত্যাদি হুগলী ও বালেশ্বর অঞ্চলে তৈরী হত।

এ সময়ের পুরোটাতেই দেখা যায় যে, সূতি ও রেশমের মিশ্রবস্ত্র এবং সূতিবস্ত্রই একক বৃহত্তম রপ্তানি পণ্য ছিল। যেমন কোম্পানি মিশ্রবস্ত্র রপ্তানি করত সেগুলোর মধ্যে প্রধান হল আলাবানি, কাটানি, খারাদারি বা চোরাদারি, চাকলা চারকোনা, ফাসতা এলাচি, কিংখার, জামদানি নীলা, পেনিয়াসকোস, সুসি (Sossy), শিরসাকার (seersucker), এবং মন্ডিলা (Mandilla)। এর মধ্যে কিংখাব ও নীলা সতেরো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রপ্তানি তালিকায় প্রাধান্য লাভ করেছে। ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির রপ্তানির তালিকায় সূতিবস্ত্রের অবস্থান অন্যান্য বস্ত্রের চেয়ে অনেক বেশি। ইউরোপীয় কোম্পানীরা যেসব মসলিন রপ্তানি করতো তার মধ্যে প্রধান হলো তাঞ্জেব, চৈরিন্দাস, খাসা, মলমল, দুরিয়া, হেরাঙ্গ, আদাতি, আত্ছাবানি, চন্দরবানি, দোতোনি, একতানি, গঙ্গালহরী, কামখালি, ফোসরন্ধ, মিলমিল, মোহনবানি, রুদ্রবানি, নয়নসুখ, শিরবন্দ ইত্যাদি। তবে এদের মধ্যে খাসা ও মলমলের চাহিদা ছিল সবচেয়ে বেশি। ইউরোপীয় রপ্তানির মধ্যে আরও ছিল হামাম, গিনি কাপড়, গারা, চেলা, দিমিটি, বাফ্তা, বেথিলা, ডানগেরি, লাখোরি, আমৃতি, দরিয়াবাদি পংকা, সলোমপুরী ইত্যাদি।

বাংলায় ইউরোপীয় কোম্পানির রপ্তানিবাণিজ্যের সাধারণ কাঠামোর পরিমাণ ও মূল্য উভয় দিক থেকে বস্ত্র ছিল প্রধানতম শিল্পজাত পণ্য। এশিয়ার বাকি সমস্ত অঞ্চল ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোকে মোট যে পরিমাণ বস্ত্র সরবরাহ করতো, একা বাংলাই তার চেয়ে অনেক বেশি বস্ত্র এই কোম্পানিগুলোকে সরবরাহ করতো। ওলন্দাজ কোম্পানী যে কাপড় সংগ্রহ করতো, তার কিছুটা যেতো এশিয়ার বিভিন্ন বাজারে, যেমন জাপান, পারস্য, সিংহল ও ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে। তবে সংগৃহীত পণ্যের সিংহভাগই ছিল ইউরোপের জন্য- কিছুটা হল্যান্ডের জন্য, বাকিটা পুনঃরপ্তানির জন্য রাখা হতো। অনুরূপভাবে ইংরেজ কোম্পানিও বস্ত্র সংগ্রহ করতো বেশিরভাগই ইংল্যান্ডের বাজারের জন্য পুনঃরপ্তানির উদ্দেশ্যে। ইউরোপে বাংলার বস্ত্রবাণিজ্যের সবচেয়ে চমকপ্রদ ঘটনা হলো ১৬৮০-এর দশকের প্রথমদিকে ইউরোপের বাজারে বাংলার কাপড়ের হঠাৎ অস্বাভাবিক চাহিদাবৃদ্ধি। এর মূলে ছিল ইউরোপের বাজারে বাংলার কাপড়ের চাহিদা দ্রুত বিস্তৃতি ও সমাদরলাভ। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে বাংলার কাপড়ের চাহিদার কারণ ছিল অপেক্ষাকৃত কম দাম ও গুণগত উৎকর্ষ। সুদক্ষ কারিগর ও তাঁতীদের সুনিপুণ শিল্পকর্ম বাংলার চিরন্তন ঐতিহ্য। সূক্ষ্ম বয়নশিল্প ও সুলভ মূল্যের জন্য বাংলার

কাপড় এশীয় বণিকদের কাছে বহু শতাব্দী ধরেই সমাদর লাভ করেছে। সুতরাং ইউরোপীয়রা যে বাংলার বস্ত্র প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি করতো এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

১৬৮০-এর দশকের প্রথমদিক থেকে ইউরোপের বাজারে বাংলার বস্ত্রের অস্বাভাবিক চাহিদাবৃদ্ধিকে ইংল্যান্ড ও ইউরোপের পণ্যভোগকারীদের রুচির এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন হিসেবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। ১৬৮০-এর দশকের প্রথমদিকে 'ভারতীয়ত্বের' (Indianness) প্রতি যে অস্বাভাবিক ঝোঁক শুরু হয়, সতেরো শতকের শেষ দশক পর্যন্ত তা লক্ষ্য করা যায়। এই নতুন 'ফ্যাশনের' গতি প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায় ১৬৯৫ সালে লেখা জে. ক্যারির এক ইস্তাহারেঃ

> কুড়ি বছর আগে ভাবাই যেতো না যে আমরা ক্যালিকো [সুতীবস্ত্র] কাপড়— যা আমাদের অভিজাতদের সর্বোৎকৃষ্ট অলঙ্কার হিসেবে গণ্য হতো (মসলিন বা অন্য যেকোন নামেই তাকে ডাকা হোক না কেন) — দেখতে পাব, তখন এই কাপড় কদাচিৎ ব্যবহার করা হতো। শুধু মৃতের আচ্ছাদন হিসেবে কিংবা যারা ভাল দামি লিনেন কিনতে অক্ষম সেই সব গরীবরা ছাড়া আর বিশেষ কেউ ক্যালিকো ব্যবহার করতো না। কিন্তু এখন খুব কম লোকই ক্যালিকোর পোশাক ছাড়া নিজেকে সুসজ্জিত মনে করে। পুরুষ, নারী সবারই এক অবস্থা। পুরুষদের জন্য কালিকো শার্ট, গলাবন্ধ, কবজিবন্ধ, রুমাল ইত্যাদি এবং মেয়েদের জন্য মাথার বন্ধনী, রাত্রিবাস, জামার হাতা, প্রাঙ্গন, গাউন, পেটিকোট ইত্যাদি এবং কি নয়। আর সবার জন্য ভারতীয় মোজা। এসব না হলে কারুরই চলে না।

একই সুর শোনা যায় ১৬৯৬ সালে বোর্ড অর্ব ট্রেডের সামনে পোলেক্সফেনের (Polexfen) বক্তৃতায়, যাতে ১৬৮১ সালে ইংল্যান্ডে ভারতীয় বস্ত্রের কদর ও জনপ্রিয়তা প্রতিনিধিত্ব হয়ঃ

আগাছা যেমন দ্রুত বেড়ে উঠে, তেমনি ভারতের এই শিল্পজাত দ্রব্য [বস্ত্র] সর্বোচ্চ অভিজাত থেকে ঠাকুর, পরিচারিকা সবার কাছে এমন সমাদর লাভ করেছে যে ভারতীয় বস্ত্র ছাড়া আর কোন পরিধানকে তারা নিজেদের সাজসজ্জার যোগ্য বলে মনে করছে না।

বাংলার বস্ত্রের এত বৈচিত্র্য ও বিবিধ ধরনের বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তাদের শ্রেণীকরণ ও সঠিক সনাক্তকরণ অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার ছিল। শ্রেণীকরণ সহজ না হলেও ইউরোপীয় কোম্পানীগুলি যেসব বস্ত্র রপ্তানি করতো, সেগুলোকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যেমন— রেশমবস্ত্র, রেশম ও সূতিমিশ্র বস্ত্র এবং সাধারণ সূতিবস্ত্র। বাংলার রেশমবস্ত্র বা টাফেটার বেশিরভাগই প্রস্তুত হতো কাশিমবাজার ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে। এক ধরনের টাফেটার নাম ছিল রেস্‌টাস্‌ (restas) — দাঁড়িকাটা বা সোনালী 'পামবার্স' (pumbers)।

তবে ইউরোপীয় কোম্পানির রপ্তানি তালিকায় সংখ্যার দিক থেকে সূতিবস্ত্রই অন্যান্য বস্ত্রের (রেশম বা মিশ্র) চেয়ে অনেক বেশি স্থান পেয়েছে। সূতিবস্ত্র প্রধানত মসলিন ও ক্যালিকো এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। মসলিম খুব মিহি সুতো থেকে তৈরি হতো এর বুনোট ছিল শিথিল। ঢাকা জেলায় সর্বোৎকৃষ্ট মসলিন বোনা হতো। সোনারগাঁও, জঙ্গলবাড়ি ও বাজিতপুর ছিল মসলিন তৈরির ঐতিহ্যবাহী প্রধান কেন্দ্র। রোমান যুগ থেকে প্রসিদ্ধ সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ও মহার্ঘ জাতের মসলিন অবশ্য ইউরোপীয় কোম্পানীগুলো রপ্তানি করতো না। তার কারণ সম্ভবত এই যে, স্বল্প পরিমাণে তৈরি হতো বলে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা তাদের সবটাই একচেটিয়াভাবে সংগ্রহ করতো ধনী অভিজাতদের কাছে বিক্রির জন্য ইউরোপীয়রা তার নাগাল পেতো না। তাছাড়া ইউরোপের শীতল আবহাওয়াতে অতি সূক্ষ্ম মসলিন খুব উপযোগীও ছিল না। মসলিনের অন্যান্য উৎপাদনকেন্দ্রগুলি ছিল মালদহ জেলা ও নদীয়া জেলার শান্তিপুরে। হুগলী ও বালেশ্বরে তৈরি হতো সাধারণ মানের মসলিন। ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি নানা ধরনের যেসব মসলিন রপ্তানি করতো, সেগুলোর মধ্যে প্রধান হলো তাঞ্জেব (tanjeb), টেরিন্দাম (terrindam), খাসা (khasa or cossa), মালমাল (mulmal), দুরিয়া (dorea), রেহাঙ্গ (rehang), আদাতি, (adatie), আত্ছাবানি (athchabani), চন্দনবানি (chanderbani), দোতানি (dotani), একতানি (akthani), গঙ্গালহরী (gangalahari), কামখানি (kamkhani), কোমরবন্ধ (kamarband), মিলমিল (milmil), মোহনবানি (mohanbani), রুদ্রবানি (komarbani), নয়নসুখ (mainsook), শিরবন্দ (sirband), ইত্যাদি। তবে এদের মধ্যে খাসা ও মলমলের চাহিদা ছিল সবচেয়ে বেশি। তারপরে দুরিয়া বা ডুরে। হাতের এবং সূচনা কারুকার্য করা হতো মলমল, তাঞ্জেব বা খাসার মতো মিহি মসলিনের জমিতে। বিভিন্ন স্থানে বোনা মসলিনের গুণমান/সূক্ষ্মতা এবং দামের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য হতো। দাম ও সূক্ষ্মতা দিয়ে শ্রেণীবিভাগের চেষ্টা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়, কারণ তাতে নানা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

মসলিনের মতো সাধারন সুতীবস্ত্র বা ক্যালিকোর ক্ষেত্রেও উৎকর্ষের মান ও নানা বৈচিত্র্যের অভাব নেই। সূক্ষ্মতর সুতীবস্ত্রের উৎপাদনকেন্দ্র ছিল মালদহ ও ঢাকা জেলায়। অপেক্ষাকৃত মোটা ধরনের কাপ তৈরি হতো বীরভূম্ পাটনা, হুগলী ও বালেশ্বর এলাকায়। এ ধরনের কাপড়ের মধ্যে ইউরোপীয়রা রপ্তানি করতো প্রধানত হামাম (humhum), সলোগাজি (humhum), সানু (sanu), রুমাল, ফোটা (fota), চিনটস (chinitos) গিনি কাপড়, গারা (garra), চেলা

(chela), দিমিটি (dimiti), বাফ্তা (bafta), বেথিলা (bethila), ডানগেরি (dengeri), লাখোরি (lakhori), আমৃতি (amriti), দরিয়াবাদি (dariabadi), পট্কা (patka), সালামপুরী (salampuri) ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে গারা, ফোটা, গিনিকাপড় ইত্যাদি ছিল সাধারণ মোটা কাপড়, তাতে কোন নকশা থাকতো না। এগুলি কোরা, সাদা কিংবা উজ্জ্বল রঙে ছাপান হতো। অন্যান্য কাপড়ের মধ্যে সানু, হামাম ইত্যাদি ছিল সাদা বা কোরা, কিন্তু মিহি।

বাংলা থেকে বস্ত্র রপ্তানির পরিমাণ বিচার করলে সতেরো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ওলন্দাজদের রপ্তানিবাণিজ্য ইংরেজদের চেয়ে অনেক এগিয়ে ছিল। কিন্তু আঠারো শতকের গোড়ার দিক থেকে ইংরেজ রপ্তানির পরিমাণ ওলন্দাজদের ছাড়িয়ে যায়। কি পরিমাণ বস্ত্র রপ্তানি হয়েছে তা যদি কোন নির্দেশক হয়, তাহলে এর ভিত্তিতে বলা যায় যে, আঠারো শতকের দ্বিতীয় দশকের শুরু থেকেই ইংরেজ রপ্তানি ওলান্দাজদের ছাড়িয়ে গেছে। এই দশকে যেখানে ওলন্দাজদের বস্ত্ররপ্তানির পরিমাণ হলো বছরে গড়ে ২,০৩,৮৫৩, সেখানে ইংরেজ রপ্তাণির পরিমাণ ২,৭৮,৫৮৮। বাংলা থেকে ইংরেজদের রপ্তানি ক্রমে বৃদ্ধি পায়, যা শীর্ষে পৌছায় ১৭৪০- এর দশকের প্রথমভাগে। নিম্নের সারণী থেকে তার প্রমান পাওয়া যাবে।

বাংলার বস্ত্রশিল্পে ইউরোপীয় বাণিজ্যের ভূমিকা অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। আঠারো শতকের প্রথমার্ধে ইউরোপীয়রাই বাংলায় সবচেয়ে বেশি সোনা-রূপা আমদানি করেছে- এই তত্ত্বের অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে ধরে নেয়া হয় যে, ইউরোপীয়দের বস্ত্ররপ্তানির পরিমান এশীয় বণিকদের চেয়ে বেশি ছিল। কিন্তু তা সত্য নয়। প্রাক পলাশী যুগেও বাংলা থেকে এশীয় ব্যবসায়ীদের বস্ত্র রপ্তানীর পরিমাণ ইউরোপীয়দের চেয়ে বেশি ছিল।

সারণিঃ ইংরেজ রপ্তাণির পঞ্চবাৎসরিক মোট পরিমাণ ঃ বস্ত্র

সময়	মোট সংখ্যা (পা:)	মোট মূল্য	গড় সংখ্যা (পা:)	গড় মূল্য (টাকা)	গড় মূল্য
১৭১০/১১-১৭১৪/১৫	১২,৪৬,৯০৭	৯,১৪,৪৪৬	২,৪৯,৩৮১	১,৮২,৮৮৯	১৪,৬৩,১১২
১৭১৫/১৬-১৭১৯/২০	১৫,৩৮,৯৭২	৯,৭০,৭৫৯	৩,০৭,৭৯৪	১,৯৪,১৫২	১৫,৫৩,২১৬
১৭৩০/৩১-১৭৩৪/৩৫	৩০,২৮,১৩২	১৬,৫৬,৫৮৮	৬,০৫,৬২৬	৩,৩১,৩১৮	২৬,৫০,৫৪৪
১৭৩৫/৩৬-১৭৩৯/৪০	২৮,২০,৭৮৩	১৫,৫২,৯৮১	৫,৬৪,১৫৭	৩,১০,৫৯৬	২৪,৮৪,৭৬৮

১৭৪০/৪১-১৭৪৪/৪৫	৩০,৪২,৯৬৪	১৯,২৬,৩৩৫	৬,০৮,৫৯৩	৩,৮৫,২৬৭	৩০,৮২,১৩৬
১৭৪৫/৪৬-১৭৪৯/৫৫	২৩,৫৬,৪০৫	১৮,৯৭,৫০৫	৪,৭১,২৮১	৩,৭৯,৫০১	৩০,৩৬,০০৮
১৭৫০/৫১-১৭৫৪/৫৫	১৯,৫৪,০৭১	১৭,০৭,৭৩৫	৩,৯০,৮১৪	৩,৪১,৫৪৭	২৭,৩২,৩৭৬

সূত্রঃ কে.এন. চৌধুরীর ট্রেডিং ওয়ার্ল্ড গ্রন্থের পৃ: ৫৪৪-৪৫ পরিসংখ্যান নিয়ে এখানে হিসাব করা হয়েছে। ১৭৪০ ও ১৭৫০ সালের পরিসংখ্যান সন্দেহজনক মনে হয়। কারণ কে. এন. চৌধুরীর দেয়া ইংরেজ রপ্তাণির মোট মূল্য (সারণি ৬) যদি ঠিক হয়, তাহলে তা ৩৮ লক্ষের বেশি কখনো হয় নি। এর মধ্যে কঁাচা রেশমের রপ্তানি (গড়ে ২৮০০ মণ) ৮ লক্ষ টাকার মতো, সোরা ও অন্যান্য পণ্যসামগ্রী ৮ থেকে ১০ লক্ষ টাকার মতো। তাহলে বস্ত্ররপ্তানির মোট মূল্যের পরিমাণ খুব বেশি হলে ২৫ লক্ষ টাকার মতো হবে।

অন্যান্য বয়ন শিল্প

এ যুগে বাংলায় কার্পেট, শতরঞ্চি, দুলিচা, গালিচা, মাদুর, শীতলপাটি প্রভৃতি বানানো হত বলে সমসাময়িক সাহিত্যে উল্লেখ আছে। বিজয়রাম ‘তীর্থ মঙ্গলে’ বাংলার বিভিন্ন স্থানে শতরঞ্চি, দুলিচা, গালিচা তৈরি হত বলে জানিয়েছেন। ‘আইন-ই-আকবরীতে’ বাংলার চটের উল্লেখ আছে। বাংলার তাঁতে চট বোনা হত। চট থেকে ব্যাগ ও কার্পেট হত। আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রপ্তানি পণ্য তালিকায় গাণির উল্লেখ আছে ‘হাদিকাৎ-উল-আকালিম’ গ্রন্থের লেখক ঘোড়াঘাট (রংপুর) অঞ্চলে চটের কার্পেট বোনা হত বলে জানিয়েছেন। সুজনরায়ের ‘খূলসাতে’ বাংলার শীতল পাটির কথা আছে। এ পণ্যগুলির বেশির ভাগ বাংলার অভ্যন্তরীণ প্রয়োজন মেটাতো। বাংলার বাইরে চট ও চটজাত দ্রব্যের তেমন বাজার ছিল না; সেজন্য রপ্তানি কম হত।

মোহম্মদ রেজা খাঁ ও উইলিয়াম বোল্টস সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে নবাবী আমলে বাংলার ‘শিল্পী ও কারিগর তাদের খুশীমত পণ্য উৎপাদন করত এবং নিজেদের পছন্দমত দামে উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করত। বাংলা সরকার তাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতো না। শিল্পী ও কারিগর স্বাধীনভাবে উৎপাদন করত ও উৎপন্ন পণ্যগুলি স্বাধীনভাবে বিক্রিও করতে পারত। প্রাক-পলাশী যুগে বাংলার নবাবরা শিল্পোৎপাদনে ও অভ্যন্তরীণ বাজারে স্বাধীনতা বজায় রাখতে পেরেছিলেন। এরকম স্বাধীনতা ভোগ করা সত্ত্বেও এ যুগে বাংলার তাঁতীদের আর্থিক স্বচ্ছলতা তেমন দেখা যায় না। বরং বলা যায় ওরা ছিল বেশ গরীব। রবার্ট ওরমেও এরকম অভিমত ব্যক্ত করেছেন। মহাজন, দালাল ও রাজকর্মচারীদের দ্বারা ওরা নিগৃহীত ও শোষিত হত।

পলাশী পরবর্তীকালে বাংলার তন্তুজ পণ্যের চাহিদা ও দাম বাড়ে আর সেই সঙ্গে তাঁতীদের আরও অনেকখানি বেড়ে যায়। এযুগে একজন অকুশলী তাঁতী মাসে তিন টাকা, একজন মাঝারি ধরনের দক্ষ তাঁতী সাড়ে সাত টাকা পর্যন্ত রোজগার করত।[৯২] তবুও বেশিরভাগ তাঁতী দু:স্থ, দুর্দশাগ্রস্থ ও ঋণগ্রস্ত হয়ে জীবন কাটাত। বাংলার তাঁতীদের সম্পর্কে সমকালীন বিদেশীদের সাক্ষ্য হল এরা পরিশ্রমী, দক্ষ, শান্ত ও নিরীহ। ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী জন বেব (L. Bebb) বাংলার তাঁতীদের সম্পর্কে এরকম মন্তব্য করেছেন (I am astonished at their passiveness)। কোম্পানি আমলে বাংলার তাঁতীরা একচেটিয়া বাণিজ্যের শিকার হয়। ফলে বাংলার তাঁতীদের উপর নানাভাবে অত্যাচার ও শোষণ চলত।

ক. ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী অগ্রিম ব্যবস্থার মাধ্যমে বস্ত্র কিনে তাঁতীদের বাজার দাম থেকে ১৫ থেকে ৪০ শতাংশ দাম কম দিত।[৯৩] কোম্পানীর তার রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগ করে বস্ত্র ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতামুলক বাজার সৃষ্টি করতে দেয় নি। নিজেরা একচেটিয়া আধিপত্য কায়েম করেছিল।

খ. কোম্পানির গোমস্তা, দালাল, পাইকার, জাযনদার (কাপড়ের গুণগতমান নির্ণয়কারী), তাগাদার তাঁতীদের কাছ থেকে দস্তুরি, দালালি, বাট্টা প্রভৃতি বিভিন্ন খাতে কমিশন আদায় করত। কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা সকলেই এ কমিশনের ভাগ নিতেন; সেজন্য এ অন্যায় প্রথা তুলে দেওয়া সম্ভব হয়নি। হেস্টিংস ও কর্ণওয়ালিশ তাঁতীদের স্বার্থরক্ষার একাধিক ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তবুও এ কুপ্রথা একেবারে বন্ধ হয় নি।

গ. কোম্পানীর কর্মচারীরা উচুমানের কাপড়ের নীচু মান ধার্য করে তাঁতীদের ফাঁকি দিত এবং নিজেরা লাভবান হত। কার্টিয়ার ঢাকায় থাকাকালীন ৩.৩ শতাংশ বাট্টা ও দালালি হিসাবে নিয়েছিলেন। কন্টরেল (Contrell) ঢাকার তাঁতীদের কাছ থেকে ১৭৮১ সনে ৬৯,৮৩০ টাকা আদায় করেছিলেন।

ঘ. ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সোনারগাঁর তাঁতীরা এরকম আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠত। ফলে এদের উপর দৈহিক নির্যাতন চলত; মাঝে মাঝে তাদের কয়েদ করে রাখার ব্যবস্থাও ছিল। শান্তিপুরের তাঁতীরা প্রতিবাদ করায় তাদের নেতাদের বন্দী করে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে বিভিন্ন স্থানে তাঁতীদের সংখ্যা হ্রাস। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে

---

[৯২] এন. কে সিংহ, *দি ইকনোমিক হিস্ট্রি অব বেঙ্গল*, কলকাতা, ১৯৫৬-৭০, ১ম খন্ড, পৃ. ১৯১ ও ১৭৬।

[৯৩] William Bolts, *Consideration India affairs,* Creative media Partners, LLC, 2018 Vol-1, P. 193.

ঢাকার তিতবাড়িতে ৯০০ ঘর তাঁতী বাস করত; ১৭৮৮ সনে তাদের সংখ্যা দাঁড়ালো মাত্র ৫০০ ঘর।[৯৪]

কাগজ শিল্প

আঠারো শতকে বাংলার প্রয়োজনীয় কাগজ এদশে প্রস্তুত করা হত। বর্তমান কাগজের সঙ্গে তুলনায় এ কাগজ অবশ্যই নিম্নমানের। এগুলি অনেকটা হলদেটে, কর্কশ, অসমান, দাগবিশিষ্ট ও আঁশযুক্ত হত। হাতে তৈরি এ কাগজে অনেক ছিদ্র থাকত বলে সহজে কালি টেনে নিত এবং পোকায় খেত। অল্পদিনে বা খুব সহজে এ কাগজ ছিঁড়েও যেত। যারা কাগজ বানাত তারা কাগজী নামে পরিচিত চিল। কাগজীদের আর্থিক অবস্থা মোটামুটি স্বচ্ছল ছিল বলে জানা যায়। কাগজ বানানোর জন্য বেশি পুঁজির দরকার হত না। বাংলায় পাট, চুণ ও জল দিয়ে খুব সহজ পদ্ধতিতে কাগজ তৈরি হত। চুনের জলে ভেজানো পাটের মন্ড ঢেঁকিতে কুটে, বাঁশের ছাঁচে ফেলে, রৌদ্রে শুকিয়ে কাগজ বানানোর ব্যবস্থা ছিল। বাংলার কাগজ পাঠানোর জন্য মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি থেকে মাঝে মাঝে নির্দেশ আসত। ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও বাংলার কাগজ কিছু কিছু রপ্তানি করা হত।[৯৫]

রেনেলের জার্নাল থেকে বীরভূম জেলার লোহার খনিগুলির পরিচয় পাওয়া যায়। এ জেলার মল্লারপুর, দামরা ও কৃষ্ণনগরে বেশ কয়েকটি লোহার খনি ছিল। খনি থেকে আকর তুলে পার্শ্ববর্তী দেওচা, মহম্মদাবাজার ও মাইসায়াতে ব্যবহার যোগ্য করা হত। বীরভূমের মল্লরাজার স্থানীয় কারিগর দিয়ে উন্নত ধরনের কামান ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র বানাতেন। বিষ্ণুপুর রাজাদের বিখ্যাত দলমাদল কামান এবং প্রথম রঘুনাথ সিংহের তরবারি আজো তাদের উন্নত প্রযুক্তি জ্ঞানের সাক্ষ্য বহন করছে। রেনেল ঢাকায় একটি ও মুর্শিদাবাদে তিনটি বৃহৎকামান দেখেছিলেন। বাংলায় তখন ভারী কামান ও কামান টানা লোহার গাড়ি তৈরি হত বলে কোম্পানীর কাগজ পত্রে উল্লেখ আছে। মীরকাশিম মুঙ্গেরে অস্ত্র কারখানা বানিয়েছিলেন। গোলাম হোসেন তাঁর 'সিয়ার মুতাক্ষরীণে' লিখেছেন মীর কাশিমের অস্ত্র কারখানায় অনেক কামান ও মাস্কেট তৈরি হত। সিয়ারের ইংরাজী অনুবাদক মঁশিয়ে রেমশু (হাজী মোস্তফা) মীরকাশিমের অস্ত্র কারখানায় প্রস্তুত অস্ত্রশাস্ত্রের গুণগতমানের প্রশংসা করেছেন। ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া

---

[৯৪] দেবেন্দ্র বিজয় মিত্র, *দি কটন উইভারস অব বেঙ্গল*, কলকাতা, ১৯৭৮।

[৯৫] মন্টগোমারী মার্টিন, *হিস্ট্রি অ্যান্টিক্স টপোগ্রাফি অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিকস অব ইস্টার্ন* ইন্ডয়া, ২য় খন্ড, পৃ: ৯৩৫-৩৬।

কোম্পানীর সৈন্যবাহিনীর অফিসারও এরুপ ধারণা পোষণ করতেন।[৯৬] অষ্টদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কোম্পানির ডিরেক্টর সভা কলকাতা কাউন্সিলকে গোলাবারুদ বানানোর অনুমতি দিয়েছিলেন।

সত্তরের দশকের শেষ দিকে বাংলায় নীলের চাষ ও নীল উৎপাদন ব্যবসায়িক ভিত্তি শুরু হয়। এ সময় থেকে ইউরোপে নীলের চাহিদা বাড়ছিল। লুই বোনাতে, কারেল ব্লুম, জে, টি প্রিন্সেপ, ক্লড মার্টিন ও জি, এফ গ্রাণ্ড বাংলায় নীলের সরবরাহ্ ব্যবসা শুরু করেছিলেন। ১৭৮১-৮২ সনে প্রিন্সেপ সাড়ে পাঁচ টাকা সের দরে কোম্পানিকে এক হাজার মণ নীল সরবরাহ করেছিলেন। প্রিন্সেস ছাড়াও ডগলাস, ফাগুসন, বারেটো, জে.পি. স্কট ও হেনরি স্কট কোম্পানীকে নীল সরবরাহ করতেন। প্রথমদিকে নীলের ব্যবসায়ে কোম্পানীর লোকসান হয়; পরে অবশ্য এ ব্যবসায়ে লাভ দেখা যায়। কারেল ব্লুম হুগলীতে কুঠি বানিয়ে নীলের চাষ ও উৎপাদন শুরু করেছিলেন। আস্তে আস্তে আরো অনেকে নীলের চাষে আকৃষ্ট হন এবং নীলের গুণগতমানের ক্রমশ উন্নতি দেখা যায়। সেই সঙ্গে জবরদস্তি করে রায়তকে দিয়ে নীল চাষ করানোর প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায়।[৯৭] ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে ভকিল রহমাতুল্লাহ জবরদস্তিতে নীলচাষের দুটি ঘটনা সদর দেওয়ানি আদালতে তুলেছিলেন।

আঠারো শতকের বাংলায় অন্যান্য পণ্যের মধ্যে পূর্নিয়া ও রংপুর জেলাতে সামান্য পরিমাণে সোরা তৈরি হত। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে রংপুর সোরা তৈরি বন্ধ হয়ে যায়। পূর্ণিয়াতে নবাবী আমলে নবাবের প্রয়োজনীয় সোরা উৎপন্ন হত। ১৭৮৮ পর্যন্ত পুর্ণিয়াতে সোরা তৈরি হয়েছিল; তারপর বন্ধ হয়ে যায়। বাংলায় দিনাজপুর ও রংপুরে অল্প পরিমাণে আফিমের চাষ হত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আফিমের বিশাল আন্তর্জাতিক চাহিদা ছিল। বেশিরভাগ আফিম যেত চীনদেশে। কোম্পানী আফিম ব্যবসায়ে একচেটিয়া আধিপত্য স্থাপন করে লাভের পথ প্রশস্ত করেছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার বসবাসকারী বিদেশী বণিক, পর্যটক ও পর্যবেক্ষক সকলেই বাংলায় অসংখ্য উন্নত মানের হস্তশিল্পের কথা উল্লেখ করেছেন। এদেশের সমকালীন লেখক ও কবিদের রচনায় বাংলার উন্নত ধরনের বহু হাতের কাজের সন্ধান পাওয়া যায়। এগুলি প্রধানত সোনা রূপো ও হাদির দাঁতের কাজ, শাঁখার নানারকম অলঙ্কার, পিতল কাঁসা ও ভরণের তৈজসপত্র, লোহা ও কাঠের তৈজস ও আসবাবপত্র। এযুগে মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, ও বীরভূম পিতল কাঁসার কাজের জন্য খ্যাতি

---

[৯৬] গোলাম হোসেন, *সিয়ার মুতাক্ষরীন*, ইং-অনুবাদ, মঁশিয়ে রেমন্ড, কলিকাতা-১৯০২, ২য় খন্ড, পৃঃ ৯।

[৯৭] এন. কে সিংহ, *দি ইকনোমিক হিস্ট্রি অব বেঙ্গল*, কলকাতা, ১৯৫৬-৭০, ১ম খন্ড, পৃ. ২০৯।

অর্জন করে। এক শ্রেণীর কারিগররা হস্তশিল্পী একটি বিশেষ কাজে বংশ পরম্পরায় নিযুক্ত থাকত। সেজন্য তাদের প্রস্তুত সামগ্রী উন্নত মানের হত। নওয়াজেস মোহাম্মদের দেওয়ান রাজবল্লভ ঢাকার কাছে রাজনগরে হস্তশিল্পী ও কারিগরদের আহ্বান করে বসিয়েছিলেন। রাজনগরের পিতল কাঁসার বাসন, লোহার জিনিস, অস্ত্রশস্ত্র, মাটির তৈজসপত্র ও সূতিবস্ত্র সারা পূর্ববাংলায় জনপ্রিয় হয়েছিল। এযুগে ঢাকার শাঁখার কাজ সারা বাংলায় সুপরিচিত। মুর্শিদাবাদের হাতির দাঁতের কাজ ও চন্দননগরের কাঠের কাজ বাংলার প্রয়োজন মেটাত।[৯৮]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঢাকা বাংলার নৌবহরের প্রধান ঘাঁটি। চট্টগ্রামেও একটি নৌঘাঁটি ছিল। নৌবহরের প্রয়োজন ছাড়াও বাংলার অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম নৌকা। বাংলার নৌ কারিগর ও শিল্পীরা অসংখ্য সৌখিন ও বৃহৎ নৌকা তৈরি করত। করম আলি 'মুজাফফর নামায়' বাংলার তৈরি নৌকাগুলি নাম উল্লেখ করেছেন। সমসাময়িক সাহিত্যেও বজরা, ময়ূরপংখী, খোসখান, পাল বা সেরিঙ্গা, স্লুপ প্রভৃতি নৌকার পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলার কারিগররা সামরিক প্রয়োজন, নৌবাণিজ্য ও দ্রুত যাতায়াতের জন্য বিশেষ বিশেষ নৌকা প্রস্তুত করত। শতাব্দীর শেষদিকে ইউরোপীয়দের পরিচালনায় সমকালীন ইউরোপীয় প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগে বাংলার নতুন জাহাজ নির্মাণ শিল্প গড়ে ওঠে। কলকাতায় জাহাজ তৈরি ও মেরামতের কাজ শুরু হয়। জাহাজ নির্মাণ ছাড়া রেশম ও চিনি শিল্পেও আধুনিক ইউরোপীয় প্রযুক্তি জ্ঞানের প্রয়োগ হয়েছিল।

---

[৯৮] কে. সি. কর্মকার, *ওয়েস্ট ডুপ্লে*, কলিকাতা-১৯৬৩, চন্দননগর।

লবণ :

আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যে অন্যতম প্রধান পণ্য হল বাংলার লবণ। বাংলা থেকে লবণ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সরবরাহ করা হত। আর এই বাংলা থেকে লবণ পাঠাবার সুবিধা থাকায় পরিবহণ ব্যয় বেশি হত না এবং এর ফলে লবণের দাম কম থাকত। বাংলা থেকে বিপুল পরিমাণ লবণ পাঠানো হত কালী ও মির্জাপুরে। যেমন: এ থেকে লবণ চালান যেত অযোধ্যা, এলাহাবাদও বুন্দেলখন্ড ও মালবরাজ্যে।[৯৯]

বাংলা থেকে প্রচুর পরিমাণে লবণ আসামে পাঠানো হত। পাঁচশ-ছ'শ টনের অন্ততঃ চল্লিশখানি বড় নৌকা বা জাহাজ বাংলার লবণ নিয়ে আসামে যেতো। প্রায় শতকরা ২০ ভাগ লাভ হত বাংলা আসাম লবণ ব্যবসায়ে।

চট :

পাট থেকে উৎপন্ন চট প্রথমদিকে অভ্যন্তরীণ প্রয়োজন মেটাত। এ পণ্যের রপ্তানি প্রায় ছিল না বললেই চলে। পরবর্তীতে কিছু কিছু চট ও চটের তৈরি ব্যাগ বাংলা থেকে বাইরে চালান শুরু করে। ১৭৫৩ তে কোম্পানীর বোম্বাই প্রেসিডেন্সি থেকে এবং ১৭৫৯ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি থেকে কলকাতায় চট কেনার নির্দেশ আসে। ১৭৫৫ তে কোম্পানীর নথিপত্রে ২০০০ গানিব্যাগের উল্লেখ আছে। এসব সাক্ষ্য থেকে বাংলার বাইরে বাংলার চট এবং চটের ব্যাগের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রমাণ পেয়ে এবং বাংলা এ পণ্য রপ্তানি করে বেশ কিছু অর্থোপার্জন শুরু করেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে বাংলায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পাট চাষ অনেকখানি বেড়ে যায়।

উপকূলীয় বাণিজ্য পণ্য:

পশ্চিম-পূর্ব উপকূলের প্রদেশগুলোতে প্রধান প্রধান পণ্যগুলো ছাড়াও অন্যান্য কৃষিজ পণ্য যেমন লংকা, চাল, আফিম, আদা, হলুদ, প্রভৃতি পণ্য রপ্তানি হত। এর বিনিময়ে বাংলা এ অঞ্চল থেকে তার প্রয়োজনীয় ওষুধ, ভেষজ দ্রব্যাদি, ফল, কড়ি, টিন, আঁখ প্রভৃতি সংগ্রহ করত।[১০০]

ইংরেজ, ফরাসি, ওলন্দাজ কোম্পানী বাংলা থেকে চিনি, চাল, চটের ব্যাগ, আদা, হলুদ, তেল এবং নানা খনিজ দ্রব্য বোম্বাই, মাদ্রাজ, সুরাট, পন্ডিচেরি, মাহে- পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের অন্যান্য বন্দরও

---

[৯৯] আলেক জান্ডার ডাও, *দি হিস্ট্রি অব হিন্দুস্থান*, (লন্ডন: ১৭৬৮-৭২) ১ম খন্ড, পৃ. ১১৯-১২০।

[১০০] এস.সি.হিল, *বেঙ্গল ইন ১৭৫৬-১৭৫৭*, ৩য় খণ্ড, (লন্ডন: ১৯০৫) পৃ. ৩১০।

শহরে বিক্রি করত। ইউরোপীয় কোম্পানীগুলির কর্মচারীরা ও উপকূল বাণিজ্যের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিল/কালী ও অযোধ্যায় বারবোসা এবং আগ্রা অঞ্চলে নীলের ব্যবসায় কোম্পানীর কর্মচারীরা বেশ লাভ করত।

ইংরেজ স্বাধীন বণিক (free merchant) এবং লাইসেন্সহীন বেআইনি বণিক (Interloper) বাংলার আন্ত:প্রাদেশিক ও উপকূল বাণিজ্যে অংশ নিত। সে সময় বাংলা লংকা, এলাচ, দারুচিনি ও চন্দনকাঠ প্রভৃতি পণ্য ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম মালাবার উপকূলীয় কতকগুলো বন্দর থেকে সংগ্রহ করত। সিন্ধুদেশের থাট্টাতে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একটি বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। সুলতানের সঙ্গেও এ সময় বাংলার বাণিজ্যক যোগাযোগ দেখা যায়। বাংলা থেকে জলপথে সিন্ধুদেশে নানারকম ধাতব দব্র্য, চিনি, চাল রেশম যেত। করমন্ডল উপকূলীয় বন্দরগুলিতে যেত খাদ্যশস্য, ডাল, চিনি, সোরা, গুড়, আদা, লম্বা, লংকা, মাখন, তেল, রেশম ও রেশমী বস্ত্র, মসলিন, হলুদ সোহাগা প্রভৃতি।[১০১]

ইউরোপীয় বণিকদের জাহাজ পরিবহণ ব্যবসার সুবিধার্থে করমন্ডল উপকূল থেকে বাংলায় লবণ (কুরকুতা) আমদানি চলতে থাকে।

২.৬ বাংলার শিক্ষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

শিক্ষার সার্বিক অবস্থা

মুঘল সম্রাটগণ, তাঁদের কর্মকর্তা, নবাব ও আমির-ওমরাহগণ শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। শাসকবর্গ নিজেরা ও অনেক ওমরাহ জমি এবং মসজিদ, খানকাহ ও ব্যক্তিবিশেষ যথা দরবেশ ও পণ্ডিতদরে নগদ অর্থ প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। প্রায় প্রত্যেক মসজিদের সঙ্গে একটি মক্তব থাকত যেখানে এলাকার ছেলেমেয়েরা প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করত। সে সঙ্গে শহরে ও গ্রামাঞ্চলে হিন্দু ছাত্রদের সুবিধার্থে সংস্কৃত ও দেশীয় ভাষার পাঠশালা চালু ছিল।[১০২]

ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতির জন্য সম্রাট আকবর শুধু মুসলমান ঐতিহাসিক নয় বরং সব ধর্মাবলম্বীদের দ্বারাই প্রশংসিত হয়েছেন। ত্রিবেণীর বাঙ্গালা কবি মাধবচার্য তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে সম্রাটের ভূয়সী

---

[১০১] এন. কে সিংহ, *দি ইকনোমিক হিস্ট্রি অব বেঙ্গল*, কলকাতা, ১৯৫৬-৭০, ১ম খন্ড, পৃ. ১২৫।

[১০২] Kalikinkar Datta, *An advanced History of India*. Macmillan India Press, Madras, P. 578

প্রশংসা করেন।[১০৩] সম্রাটের উৎসাহে আমির ওমরাহগণও শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর একজন শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন, অতএব তিনি শিক্ষার প্রতি বিশেষ নজর দেন। দিল্লীতে অবস্থিত দার আল বাকা নামক কলেজটিকে তিনি মেরামত করেন।[১০৪] এই কলেজের জন্য তিনি কয়েকজন জ্ঞানী অধ্যাপক নিয়োগ করেন। দিল্লীর প্রধান বিচারক মাওলানা মুহাম্মদ সদর-আল-দ্বীন খান বাহাদুরকে তিনি এই কলেজের পরিচালক নিয়োগ করেন যাতে কলেজটি উন্নতি লাভ করে।[১০৫] মুঘল সম্রাটগণ নারীশিক্ষার প্রতিও মনোনিবেশ করেন। মুঘল আমলে শিক্ষার স্তর বর্তমানের ন্যায় তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল-প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর। প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া হতো প্রাইমারি স্কুল বা মক্তবে এবং নিজস্ব ঘরে।[১০৬] শিক্ষা পদ্ধতিও ছিল বর্তমানের ন্যায় অতি সাধারণ। শিক্ষার্থীকে প্রথমে সঠিক উচ্চারণসহ বর্ণমালা শেখানো হতো। অতঃপর তাকে ছোট ছোট বাক্য পড়তে ও লিখতে দেয়া হতো। তাকে কিছু অনুশীলন ও দেয়া হতো যা সে তার শ্লেটে লিখত এবং এভাবে সে লেখা এবং পড়া শিখতো। এভাবে লেখা ও পড়া শেখার পর সে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে বড় বড় স্কুল-কলেজে কলা ও বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞানার্জন করত। মাধ্যমিক শিক্ষা দেয়া হতো মসজিদ ও উপসনালয়ে। মধ্যযুগীয় ইউরোপের গীর্জার ন্যায় প্রত্যেক মসজিদে ধর্মীয় ও সাধারণ শিক্ষা প্রদান করা হতো।[১০৭]

উচ্চশিক্ষা কেন্দ্রিভূত ছিল প্রধানত বিখ্যাত পণ্ডিতদের হাতে। তারা যুবকদের উচ্চশিক্ষার জন্য নিজেদের সদা নিয়োজিত রাখতেন। মসজিদ বা খানকাহ সংলগ্ন উচ্চ শিক্ষার বিদ্যালয়গুলো একাজে প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং সরকারি বা বেসরকারি বদান্য ব্যক্তিদের দ্বারা এগুলোর খরচ নির্বাহ হতো। ভারতে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্নে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থার পুর্ণাঙ্গ চিত্র ফুটে উঠেছে। ডঃ বুকানন ও উইলিয়াম এ্যাডামের তাঁদের জরিপের মাধ্যমে বুঝা যায় যে, তখন বিদ্যালয়গুলো এবং তাদের দাতাদের অবস্থা নিতান্তই জরাজীর্ণ ছিল। এককালে এগুলোর যে সুদিন ছিল তার বর্ণনা এফ.এ. কী (F.A. Keay) এর সমাপনী বক্তব্য থেকে বোঝা যায় :“আওরঙ্গজেবের সমালোচনা এবং এ্যাডামের বক্তব্য থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, মধ্যযুগের ইউরোপীয় শিক্ষার ন্যায়

---

[১০৩] Dinesh Chandra Sen, *History of Bengali Literature*, Kessinger Publishen LLC, June-2008, P. 335, 336।

[১০৪] Kalikinkar Datta, *An advanced History of India*. Macmillan India Press, Madras, P. 579।

[১০৫] N.N.Law., *Promotion of Learning in India*, 30 August, 2003, Cosmopublications, New Delhi, India p. 181।

[১০৬] S. M. Jaffar, *Education in Muslim India*, Idarah.1.adadiyat.1, Delhi 2009, Qasimjan Street, Delhi 6, India, p. 20।

[১০৭] Ibid, p. 18।

ভারতে মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থাও নিয়মতান্ত্রিক ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল এবং উভয় ক্ষেত্রে ব্যাকরণের উপর খুব জোর দেখা হয় এবং শুল্ক, অস্পষ্ট অধিবিদ্যার আলোচনায় সময়ক্ষেপণ করা হয়। এর চেয়ে আরও অধিক কিছু পাঠ যে অন্তর্ভূক্ত ছিল, যেমনটি ইউরোপের ক্ষেত্রে দেখা যায় সে সম্পর্কে আমরা অনেকটা নিশ্চিত হতে পারি। কিছু কিছু বিজ্ঞান পঠন-পাঠনের পাশাপাশি সাহিত্য এবং ইতিহাসও পড়ানো হয়। প্রকৃতপক্ষে ইতিহাস ভারতীয় মুসলমানদের অতি প্রিয় বিষয়। মুসলমানদের দ্বারা প্রণীত বিপুল সংখ্যক ইতিহাস গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য বিপরীতে হিন্দুদের দ্বারা প্রণীত ইতিহাস সাহিত্যের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। সমালোচনামূলক ও নিরপেক্ষ মনোবৃত্তি যা আধুনিক বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিকগণ চর্চা করতে চান, তা সত্যিই পাওয়া যায় না, তবে অনুরূপ ইতিহাস চর্চা সেকালের ক্ষেত্রে অবশ্য আমরা আশাও করতে পারি না। আমরা বোধ হয় খুব ভুল করব না যদি বলি ছাপাখানা প্রবর্তনের পূর্বে ইউরোপে শিক্ষার যে অবস্থা ছিল ভারতে মুসলমানদের শিক্ষার অবস্থাও ছিল অনুরূপ।[১০৮]

সামাজিক অবস্থা

যেকোনো দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ সেদেশের সমাজব্যবস্থার উপর প্রতিফলিত হয়,কিন্তু রাজবংশের উত্থান পতনের ঘটনা কোনো দেশের সামাজিক প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না। সমাজ লাগাতারভাবে বিকাশমান, এর প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন প্রকার রূপলাভ করে এবং সময়ের কার্যকারিতায় ধীর গতিতে সাড়া দেয়। যুগান্তকারী ঘটনাসমূহ অতি বিরল। বাংলায় এ ধরনের ঘটনা সংগঠিত হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যখন ইসলামের আবির্ভাব ঘটে এবং ষোড়শ শতাব্দীতে যখন শ্রীচৈতন্যদেব তার বৈষ্ণব আন্দোলন আরম্ভ করেন।[১০৯]

বৃটিশ পূর্ব ভারতীয় সমাজের উপাদান ছিল প্রধানত চারটি: রাজা ও তাঁর সভাসদগণ রাষ্ট্রের বুর্জোয়া শ্রেণী গঠন করে। ধর্মতাত্ত্বিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণী যার অন্তর্ভূক্ত ছিল পণ্ডিতবর্গ এবং পেশাজীবী শ্রেণীও। বণিক শ্রেণী যাদেরকে বলা হতো বৈশ্য, এবং কৃষিজীবী যার মধ্যে শিল্পকার এবং কৃষকরাও অন্তর্ভূক্ত ছিল।[১১০] মুঘল সামাজ্যের প্রাদেশিক প্রশাসনিক কাঠামো ছিল অবিকল কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক কাঠামো প্রতিলিপি মাত্র।[১১১] প্রদেশে ছিলেন গভর্নর[১১২] (সুবাহদার বা নাজিম), দিওয়ান, বখশী, কাজী, সদর,

---

[১০৮] F. E. Keay, *A History of Education in India,* Oxford University Press, 1 Feburary 1963, P. 135.

[১০৯] Abdul Karim, *Murshid Kuli Khan and his times,* Asiatic Socity of Pakistan, Dhaka, 1963, P. 237.

[১১০] বি.বি. মিশ্র, *দি ইন্ডিয়ান মিডিল ক্লাসেস*, নিউইয়র্ক: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬১, পৃ. ২১।

[১১১] Jadunath Sarkar, *Mughal Adminstration,* Kalkata-1936, P. 37।

বয়ূতাত এবং নৈতিকতা নিয়ন্ত্রণকারী, কিন্তু কোনো খান-ই সামান্য ছিলেন না। প্রাদেশিক রাজধানীতে প্রশাসন কেন্দ্রিভূত থাকে। এটি অনেকটা নগরের অধিবাসী এবং তাদের আশেপাশের জনবসতির দেখাশোনার কাজে ব্যস্ত থাকে।[১১৩] সুবাহদারকে সরকারিভাবে বলা হয় নাজিম বা প্রদেশের নিয়ন্ত্রণকারী। তাঁর প্রধান দায়িত্বের মধ্যে থাকে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, সহজভাবে খাজনা আদায়ে সাহায্য করা এবং তাঁর নিকট প্রেরিত সরকারি আদেশসমূহ জারি করা। অবশ্য তিনি বেরসকারি প্রধানও পরিচালনা করেন। বেসামরিক দিক থেকে তাঁর দায়িত্ব হল চাষাবাদে উৎসাহ প্রদান এবং তা বৃদ্ধিতে সহায়তা দান। চাষীদের সবরকমের সাহায্য প্রদান এবং আমিল নিয়োগ করা ও তাদের উপর নজর রাখা তাঁর দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত। পুকুর, কূপ, খাল খনন এবং সরাইখানা ও অন্যান্য জনস্বার্থের ভবনাদি নির্মাণ করাও ছিল তাঁর কর্তব্য। ফলের বাগান ও অন্যান্য সবজীর বাগান নির্মাণেও তিনি তদারকী করেন।

মুঘল রাজত্বের শেষভাগে বাংলার জমিদারদের তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।[১১৪] (১) স্বাধীন বা প্রাচীন যুগের হিন্দু সামন্ত রাজা। মুসলিম শাসনামলে এসব রাজা স্বাধীনভাবে বা অর্ধস্বাধীনভাবে এলাকা শাসন করেন। এদের কেউ কেউ পেশকাশ বা সালামী প্রদান করেন। (২) হিন্দু বা মুসলিম করদ রাজন্যবর্গ। তাঁরা রাজধানী থেকে অনেক দূরে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাস করেন। ক্ষমতাশালী সুবাদার এলে তাঁরা নিয়মিত রাজস্ব আদায় করেন আর অপেক্ষাকৃত দুর্বল সুবাদার হলে মোটেই গ্রাহ্য করেন না। অভ্যন্তরীণ প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থা তাঁদের হাতেই থাকে। (৩) প্রাক্তন রাজস্ব আদায়কারী, তালুকদার ও অন্য কর্মচারীগণ অন্যান্য জমিদার থেকে রাজস্ব আদায়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হন এবং সুযোগ বুঝে দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষমতা দখল করার চেষ্টা করেন।[১১৫]

হিন্দু সমাজের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল বর্তমান যুগের ন্যায় বর্ণ প্রথা। মুসলিম প্রভাবে অনেক পুরাতন সামাজিক ও আইনগত প্রথা বিলুপ্ত হয়। প্রাচীন ক্ষত্রীয় বা হিন্দুস্থানের বিধিসম্মত শাসকদের পতনের ফলে ব্রাক্ষণদের বিধিবদ্ধ ও প্রচলিত ক্ষমতায় বেশ পরিবর্তন সাধিত হয়। অপরদিকে ক্ষত্রীয়দের নিজেদের নৈতিক দ্বন্দ্বের ফলে ব্রাক্ষণদের ক্ষমতা ও বর্ণপ্রথার প্রভাব হিন্দু জনগণের মধ্যে

---

[১১২] Jadunath Sarkar, *Mughal Adminstration*, Kalkata-1936, P. 1

[১১৩] Ibid 37৩৭।

[১১৪] কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৭, পৃ. ৪৮৫

[১১৫] কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৪-৪৮৬।

বেশ বেড়ে যায়। নিজেদের আয়ত্তের মধ্যে পেয়ে ব্রাহ্মণগণ বিবাহ, খাদ্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কড়া বিধিনিষেধ চালু করে।[১১৬]

আলোচ্য যুগে বাংলার হিন্দু সমাজ তিনটি প্রধান বর্ণে বিভক্ত ছিল। মুকুন্দরামের কাব্যে প্রস্ফুটিত ভাবধারা অনুযায়ী সমগ্র ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে এটিই ছিল সম্ভবত প্রকৃত সামাজিক চিত্র।[১১৭] সতীশচন্দ্র মিত্র হিন্দু সমাজে কৌলীণ্য প্রথা প্রচলনের নায়ক বলে রাজা বল্লাল সেনকে সনাক্ত করেন। গৌড়ের ব্রাহ্মণ্যধর্মকে রক্ষার জন্য মহারাজ বল্লাল সেন কৌলীণ্য প্রথা প্রবর্তন করেন। কালক্রমে এই প্রথা তাঁর বংশে লালিত পালিত হয় এবং সমগ্র বাংলায় একটি অভিজাত শ্রেণী সৃষ্টি করা হয়। এটিই সেন বংশের প্রবীণ ও স্থায়ী কৃতিত্ব।[১১৮] হিন্দু রাজত্ব শেষ কিন্তু অভিজাতের প্রাধান্য শেষ হয়ে যায়নি। এমনকি আলোচ্য সময়ে কোনো রাজা না থাকলেও সমাজের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জনগণ রাজনীতি ভুলে গেছে কিন্তু সামাজিক শাসন ভোলেনি। যে কেউ জ্ঞান বা সম্পদের বলে বলীয়ান হতে পারে কিন্তু তাকে আভিজাত্যের সামনে মাথা নত করতে হবে।[১১৯]

সাংস্কৃতিক অবস্থা

সাধারণভাবে সংস্কৃতি অর্থ মানব মনের উৎকর্ষ। অন্যকথায় সংস্কৃতি একটি নমনীয় শব্দবহুল অর্থ ও ব্যাখ্যা হতে পারে। সংস্কৃতির জটিল ব্যাখ্যা নিয়ে প্রথমেই বাধাগ্রস্থ না হয়ে বলা যেতে পারে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একটি জাতির কৃতিত্বের বহিঃপ্রকাশের নামই সংস্কৃতি। যে পরিবেশে মানুষের জন্ম সে পরিবেশের প্রতিক্রিয়া ও ফলাফলে যে চেতনাবোধের সৃষ্টি হয় তাই সংস্কৃতি। দৈনন্দিন জীবনচর্চায় একে অপরের সঙ্গে মেলামেশায় মানব মনের যে অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটে তাই সংস্কৃতি।

ইসলামি সংস্কৃতি আন্তর্জাতিক। এটি কোনো বিশেষ দেশ কালে আবদ্ধ নয়। দৈনন্দিন জীবনে হিন্দুরা কিছুটা প্রাদেশিকতা স্বীকার করে তাদের সামাজিক আচার ব্যবহার, পোষাক ও ধর্মীয় রীতিনীতি বাংলার বাইরে তাদের স্বধর্মীয়দের সাথে মেলে না। কিন্তু মুসলমানেরা বাঙালি সংস্কৃতি গ্রহণ করলেই আপত্তি উত্থাপিত হয় কারণ এটি ইসলামি বিশ্বজনীনতা ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের বিরোধী। মুসলমানদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি দেশ, শ্রেণী বা জাতীয় সীমানা স্বীকার করে না তাদের সংস্কৃতি তাদের সমাজের ন্যায় অবিভাজ্য। আফ্রিকায় হোক বা চীনের, মুসলমানরা কখনও কোনো বিশেষ দেশে বা সাংস্কৃতিক

---

[১১৬] কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৭, পৃ. ১০৮, ১০৯।
[১১৭] কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, ২০১৭, পৃ. ২৮১।
[১১৮] সতীশচন্দ্র মিত্র, *যশোর-খুলনার ইতিহাস*, কলিকাতা: ১৯৬৩, ১৯৬৫ ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৩।
[১১৯] সতীশচন্দ্র মিত্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৩।

পরিবেশে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না; একজন মুসলমান বিশ্বজনীন মুসলিম সমাজে ও সংস্কৃতিতে আগন্তুক নয়।[১২০] অতএব একজন মুসলমান যদি তার বাঙালিত্বকে তার সাংস্কৃতিক বিকাশের বাহন হিসাবে গ্রহণ করে তবে সে মুসলমানিত্বই থাকবে না। এতদসত্ত্বেও এই বিশ্বজনীনতা কখনও হাসিল করা যায়নি কারণ দার আল ইসলাম কখনও বিশ্বজনীনতা লাভ করে নি, এবং একই বিষয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এই সমস্যা সমাধানের জন্য একটি আন্তর্জাতিক ক্ষমতার মাধ্যমে মুসলিম সংস্কৃতি নামে একটি একক সংস্কৃতি গঠন করা যায়। তা সত্ত্বেও রাজনৈতিক ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল এই ঐক্য জাতীয় সাংস্কৃতিক ধারার উর্ধ্বে উঠতে ব্যর্থ হয়। একথা মনে রাখা প্রয়োজন, মুসলিম সাংস্কৃতিক নাম দেয়া সঠিক যেখানে মুসলিম রাজনৈতিক ক্ষমতা বিদ্যমান, কারণ এই রাজনৈতিক ক্ষমতার দরুন অমুসলিমগণ মুসলিম পোষাক পরিধান করে, মুসলিম ছাঁচে গৃহ নির্মাণ করে, এবং মুসলিম আদর্শ ও মালমসলা নিয়ে চিত্র কলার চর্চা করে যেমনটি আজকাল পাশ্চাত্য ধাঁচে করা হয়।[১২১] মুসলিম ও অমুসলিম অবদানে পালিত এই সংস্কৃতির নমুনা বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন পরিবেশের সাহিত্য, চিত্রকলা, স্থাপত্য, পোষাক ও আচার ব্যবহার বিভিন্নভাবে ফুটে উঠেছে। রাজনৈতিক ক্ষমতার বাইরে আরেকটি বিষয় হল মুসলমানদের ধর্মীয় বিধিবিধান ও চিন্তা চেতনার ভাষা। একারণে মসজিদের আকৃতি একরকম হলেও খুঁটিনাটি বিষয়ে পরিবেশের প্রভাব এর মধ্যে পড়েছে। সাহিত্যে ও চিত্রকলায় ভাষা ও প্রক্রিয়া একপ্রকার হলেও এতে একটি জাতীয় প্রভাব ফুটে উঠেছে।[১২২]

মুঘল আমলে বাংলার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড উপরোল্লিখিত পটভূমিকার আলোকে আলোচনা করা যায়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বাংলার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। টি.কে. রায়চৌধুরী বলেন, সমগ্র মধ্যযুগে বাংলার সংস্কৃতি জনগণের ধর্মীয় জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত ছিল। প্রকৃতপক্ষে এগুলো এত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল যে লোকেরা মনে করেন এগুলো একটি বস্তুর এক অভিন্ন সত্তা।[১২৩] এ যুগের সমস্ত সাহিত্যিক কর্ম একথার সত্যতা বহন করে। এর প্রায় সমগ্র আয়তন ধর্মীয় চরিত্রের। সুলতানী আমলে এবং মুঘল আমলেও কবি সাহিত্যিকগণ হয়ত ঐন্দ্রজালিক ভাবাবেশপূর্ণ ছন্দে বা আর্য বা স্থানীয় বিশেষ দেবদেবীর জনপ্রিয় উপখানের সাথে সম্পৃক্ত ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করতেন, অথবা গোরক্ষ নাথ বা

---

[১২০] আবু মহামেদ হাবীবুল্লাহ, *সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস*, ঢাকা: ১৯৭৪, পৃ. ১৭১।

[১২১] ডি. ডি. বার্টোল্ড, অনুবাদ ফজলুল রহমান, *মুসলমান সংস্কৃতি*, ঢাকা: ১৯৭৬, পৃ. ২৮।

[১২২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।

[১২৩] Tapan Kr. Ray Chowdhury, *Bengal Under Akbar and Jahangir*, Re-print Delhi-1964, p. 145।

গোপীচাঁদের ন্যায় ঋষিদের অলৌকিক ক্ষমতা ও কার্যাবলি ছন্দে প্রকাশ করতেন।[১২৪] অনেক কাব্যগ্রন্থ বিশেষ বিশেষ দেবতার দর্শন ও রীতিনীতি ব্যাখ্যা করে। এমনকি যখন মুসলমান বা হিন্দু পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙালি কবিগণ বিভিন্ন কাব্য অনুবাদে নিমগ্ন সে সময়ও তাদের কার্যাবলি গভীর ধর্মীয় চেতনায় পরিব্যাপ্ত। আবার চৈতন্য আন্দোলনের দ্বারা সাহিত্যিক কর্মকাণ্ডে সৃষ্টির নতুন দ্বার উন্মুক্ত হলে সেখানেও দেখা যায় এমনকি জীবনীগ্রন্থ রচনায়ও ধর্মীয় ভাবধারা এবং সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে।[১২৫]

---

[১২৪] Tapan Kr. Ray Chowdhury, *Bengal Under Akbar and Jahangir*, Re-print Delhi-1964, p. 145
[১২৫] Ibid.

তৃতীয় অধ্যায়

ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী গঠন

১৬০০ সালে যে রাজকীয় সনদের মাধ্যমে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয়েছিল তা ১৮৫৮ সালের আইনের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে। রাজার নিকট থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন সনদের মাধ্যমে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষে ব্যবসা সংক্রান্ত অধিকারের পাশাপাশি সীমিত আইন বা বিভিন্ন নিয়মনীতি প্রণয়ন করা, ভারতীয় ভূখণ্ডে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা, সামরিক বাহিনী গঠন, গর্ভণর নিয়োগ, মুদ্রাজারী, দেশীয় রাজাদের সঙ্গে সন্ধি-চুক্তি করা প্রভৃতি অধিকার লাভ করে। এই অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয় ১৬০০ সাল থেকে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত কোম্পানী যেসব রাজকীয় সনদ লাভ করে বা ইংলিশ পার্লামেন্ট কোম্পানী সংক্রান্ত যে সকল আইন পাস করে তা সংক্ষিপ্তভাবে অনুসন্ধান করা। উল্লেখ্য, রাজকীয় সনদের মধ্যে ১৬০০, ১৬০৯, ১৬১৫, ১৬২৩, ১৬৫৭, ১৬৬১, ১৬৮৬, ১৬৯৮, ১৭২৬ এবং ১৭৫৩ সালের বিশ্লেষণ করা।

৩.১ ১৬০০ সালের রাজকীয় সনদ

ইংরেজরাও অন্যান্য ইউরোপীয়দের মত দূরপ্রাচ্য ও ভারতবর্ষে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী অর্জন করতে আগ্রহী হয়ে উঠে। ১৫৮৮ খ্রিঃ স্পেনীয় আর্মাডার উপর বিজয় তাদের এই আকাঙ্ক্ষাকে তীব্রতর করে। ১৫৯৯ সালে সেপ্টেম্বরে লর্ড মেয়রের সভাপতিত্বে ভারতবর্ষে সরাসরি ব্যবসার উদ্দেশ্যে একটি সংগঠন তৈরি করার প্রস্তাব পাস হয়। ১৬০০ সালের ৩১ ডিসেম্বর বৃটেনের রাণী এলিজাবেথ The Governor and Company of Merchants of London কে ব্যবসা করার অনুমতি প্রদান করে। এই সনদ বিলেতি কোম্পানীটিকে স্বাধীনভাবে ইস্ট ইন্ডিয়ায় ব্যবসা করার অনুমতি প্রদান করে। ১৬০০ সালের সনদটি মূলত বাণিজ্যের সাথে সম্পর্কিত ছিল। ভারতবর্ষে ডোমিনিয়ন প্রতিষ্ঠার কোন অভিপ্রায় সনদের বিধানে লিপিবদ্ধ ছিলনা। এই সনদের মাধ্যমে কোম্পানী নিজেদের কর্মচারীদের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষা ও ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করার জন্য সীমিত ভাবে আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা লাভ করে। ১৬০০ সালের এই সনদে কোম্পানীকে ১৫ বছরের জন্য ব্যবসা করার সুযোগ প্রদান করা হয়। তবে ২ বছরের নোটিশ প্রদান করে ব্যবসা করার অনুমতি বাতিল করা যেত।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে ১৬০০ সালের সনদটির নিম্নলিখিত বৈশিষ্টগুলো উল্লেখযোগ্যঃ

১। এই সনদটি কোম্পানীকে একটি একচেটিয়া বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ব্যবসা করার অনুমতি প্রদান করে।

২। সনদ অনুসারে কোম্পানীর আয়ুস্কাল ছিল মাত্র ১৫ বছর এবং ২ বছরের নোটিশ প্রদান করে তার পরিসমাপ্তির বিধান ছিল। পরবর্তী সময়ে কোম্পানীর মেয়াদকাল বাড়তে বাড়তে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত টিকে ছিল।

৩। কোম্পানীর নিকট হতে পূর্বানুমতি ব্যতীত কোন ব্রিটিশ নাগরিক ব্যবসা পরিচালনা করতে পারত না। অনুমোদিত ব্যাবসায়ীদের জাহাজ ও মালামাল বাজেয়াপ্ত করার বিধান এই সনদে ছিল।

৪। কোম্পানীর কর্মচারীদের মধ্যে শৃংখলা রক্ষার জন্য সনদ অনুযায়ী কোম্পানী সীমিতভাবে আইন প্রনয়ণ করতে পারত।

৫। কোম্পানী তার গভর্নর, ডিরেক্টর ও শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হত।

১৬০০ সনের সনদের কিছু সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়। এসকল সীমাবদ্ধতাসমূহের মধ্যে অন্যতম ছিল কোম্পানীর সীমিত আইন প্রণয়ন ক্ষমতা। এ কারণে কোন কর্মচারী গুরুতর অপরাধ করলে কোম্পানী তার বিচার করতে পারত না। তাছাড়াও ভূখন্ড পরিচালনার কোন ক্ষমতা কোম্পানীর ছিল না।

এতদসত্ত্বেও ১৬০০ সালের রাজকীয় সনদ ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী গঠনে অশেষ গুরুত্ব বহন করে।

৩.২ ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর গঠন অনুযায়ী প্রাথমিক সনদসমূহ

৩.২.১ ১৬০৯ সালের সনদ

১৬০৯ সালের ৩১ মে রাজা ১ম জেমস কোম্পানীকে একটি নতুন সনদ প্রদান করে। যা কোম্পানীর ব্যবসা করার সুযোগকে ১৫ বছরের মেয়াদকাল পরিবর্তন করে আজীবন করা হয়। তবে ৩ বছরের নোটিশ প্রদান পূর্বক এই সুবিধা প্রত্যাহার করা যেত। ১৬০০ সালের সনদের মাধ্যমে রানী এলিজাবেথ কোম্পানীকে যে সকল সুবিধাদি, ক্ষমতা ও অধিকার প্রদান করেছিলেন তা এই সনদে বহাল থাকে।[১]

---

[১] John William Kaye, *History of Administration of East India company*, London: Richard Bentley, New Burlington Street, p.66

৩.২.২ ১৬১৫ সালের সনদঃ

১৬০১ সালে রাজকীয় কমিশনের মাধ্যমে দীর্ঘ সমুদ্রপথে সংঘটিত গুরতর অপরাধের শাস্তি প্রদানের যে ক্ষমতা কোম্পানীকে দেয়া হয় তা ১৪ ডিসেম্বর ১৬১৫ সালের সনদের মাধ্যমে কোম্পানীকে এর ক্যাপ্টেন বরাবর তদ্রুপ কমিশন প্রদানের কর্তৃত্ব দেয়া হয়। তবে অধিকতর মারাত্মক অপরাধ যেমনঃ ইচ্ছাকৃত খুন বা বিদ্রোহের ক্ষেত্রে কোম্পানীর কর্মচারীদের মধ্যে ১২ সদস্যের একটি জুরি বোর্ড এর রায় প্রদান করতেন। দীর্ঘ সমুদ্রপথে জাহাজে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কোম্পানীকে এই ক্ষমতা প্রদান করা হয়।[২]

৩.২.৩ ১৬২৩ সালের সনদ

১৬২৩ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি রাজা ১ম জেমস কোম্পানীর ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এই সনদ প্রদান করেন। এই সনদ বলে কোম্পানী কর্মচারী কর্তৃক স্থলে সংঘটিত অপরাধের বিচার করার কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হয়। এই সনদ প্রদানের পর কোম্পানী তার কর্মচারীদের কর্তৃক স্থলে ও উন্মুক্ত সমুদ্রে সংঘটিত অপরাধের বিচার করার কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হয়।

৩.২.৪ ১৬৫৭ সালের সনদ

রাজা ১ম চালর্স ১৬৩৫ সালে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিজে কোর্টেনস এসোসিয়েশনস (Courten’s Association) নামে একটি নতুন কোম্পানী গঠন করে ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্য স্যার ইউলিয়াম কোর্টেনকে অনুমতি দেন। এতে করে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য করার ক্ষেত্রে নতুন কোম্পানীর সাথে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়। এছাড়া ইংল্যান্ডেও নানাবিধ জটিলতার সৃষ্টি হয় যা ১৬৫৭ সাল পর্যন্ত চলে। অলিভার ক্রমওয়েল ১৬৬৭ সালে একটি নতুন চার্টার অনুমোদনের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে সকল জয়েন্ট স্টক কোম্পানীগুলোকে একটি কোম্পানীতে সংযুক্ত করে। এভাবে বিভিন্ন কোম্পানীর মধ্যে চলমান দ্বৈরথের অবসান ঘটে। প্রকৃত পক্ষে, ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করে ভারতবর্ষে এর কর্ম ও ক্ষমতার ভবিষ্যৎ পরিধি বৃদ্ধি করা হয়।

---

[২] John William Kaye, *History of Administration of East India company*, London: Richard Bentley, New Burlington Street, p. 67.

৩.২.৫ ১৬৬১ সালের সনদ

ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৬৬০ সালে একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে আঞ্চলিক শক্তিতে পরিণত হয়ে পুরোদস্তুর একটি নতুন যুগে প্রবেশ করে। অত:পর ১৬৬১ সালের ৩ এপ্রিল রাজা ২য় চালর্স কোম্পানীকে এই সনদ প্রদান করে কোম্পানীর সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে এবং এর কাঠামোগত পরিবর্তন আনে। এই সনদ কোম্পানীকে ভারতে মাদ্রাজ, বোম্বে এবং কলকাতায় একজন গভর্নর ও কাউন্সিল নিয়োগের ক্ষমতা প্রদান করে। ইংলিশ আইন অনুযায়ী দেওয়ানি ও ফৌজদারিসহ কোম্পানীর অধীনস্ত সকল ধরনের মামলা বিচার করার ক্ষমতা গভর্নর ও কাউন্সিলকে প্রদান করা হয়। উপরন্তু তারা এ সকল রায় কার্যকর করার ক্ষমতাও প্রাপ্ত হন। উল্লেখ্য যে, উপরে উল্লিখিত তিন প্রেসিডেন্সি শহরে বসবাসরত ভারতীয় নাগরিকরাও গভর্নর এবং কাউন্সিলের এখতিয়ারাধীন ছিলেন। এভাবে ১৬৬১ সালের সনদটি প্রকাশ্যে ইংলিশ আইন প্রয়োগ এবং বিচার বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগের উপর গভর্নর ও কাউন্সিলের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।

৩.২.৬ ১৬৮৩ সালের সনদ

১৬৮৩ সালের ৯ আগস্ট রাজা ২য় চালর্স কোম্পানীকে এই সনদ প্রদান করে। যার মাধ্যমে কোম্পানী সামরিক সৈন্য সংখ্যা বাড়ানোর ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়। তাছাড়াও কোম্পানী তিন সদস্য বিশিষ্ট 'কোর্ট অব জুডিকেচার' (Court of Judicature) প্রতিষ্ঠা করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়। এ আদালতের সকল বিচারক কোম্পানী নিজেই নিয়োগ দিতে পারতেন। তিনজন বিচারকের মধ্যে একজন দেওয়ানী আইনে বিশেষজ্ঞ, অন্য দুইজন বণিকদের মধ্যে থেকেই নিযুক্ত হত। ন্যায়পরায়ণতা, সুবিবেচনা এবং ব্যবসা সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এই আদালত সিদ্ধান্ত প্রদান করত। এভাবে এই চার্টারের অধীনে কোম্পানী তার পছন্দসই জায়গায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক এ্যাডমিরালটি কোর্ট প্রতিষ্ঠা করার কর্তৃত্ব লাভ করে।[৩]

৩.২.৭ ১৬৮৬ সালের সনদ

রাজা ২য় জেমস কোম্পানী বরাবর এই সনদটি অনুমোদন করেন। যে সকল ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা কোম্পানী আগে থেকেই প্রয়োগ ও ভোগ করে আসছিল; এই সনদের মাধ্যমে সেগুলো নবায়ন করা হয় এবং আরো নতুন করে কিছু ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়। উদাহরণস্বরূপ- এই সনদ

---

[৩] V.D Kulshrestha, *Land Marks in Indian legal and Constitational History,* Universal Law Publisher co.pvt. Ltd, New Delhi, Fifth addition, P. 40.

কোম্পানী জাহাজে এ্যাডমিরাল ও অন্যান্য সি-অফিসার (Sea Officer) নিয়োগ করার ক্ষমতা লাভ করে। সকল নৌ কর্মকর্তাগণ নৌসেনার সংখ্যা বৃদ্ধি ও যুদ্ধের সময় মার্শাল ল (সামরিক আইন বা শক্তি) প্রয়োগ করার ক্ষমতা লাভ করেছিলেন।

৩.২.৮ ১৬৯৮ সালের সনদ

কোম্পানীর প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচলিত বিধানের কিছু পরিবর্তন করে রাজা তৃতীয় উইলিয়াম ১৬৯৮ সালের ১৩ এপ্রিল কোম্পানীকে এই সনদ প্রদান করেন। এই সনদটির মাধ্যমে কোম্পানীর সামগ্রিক কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কোর্ট অব ডিরেক্টরস (Court of Directors) এবং কোর্ট অব প্রোপাইটরস (Court of Propritors) নামে দুটি আদালত সৃষ্টি হয়। কোম্পানীর এই গঠন ১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং এ্যাক্ট পাস হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

৩.২.৯ ১৭২৬ সালের সনদ

১৭২৬ সালে ২৪ সেপ্টেম্বর রাজা প্রথম জর্জ কোম্পানী বরাবর এই সনদ প্রদান করেন। এই সনদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিধান ভারতবর্ষের ইতিহাসে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। এই সনদের মাধ্যমে বোম্বে, কলকাতা ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে একটি করে করপোরেশনে প্রতিষ্ঠা করা হয়। করপোরেশনের কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য উপ-আইন, বিধি বা অধ্যাদেশ প্রণয়ন করার ক্ষমতা গভর্নর-ইন-কাউন্সিল (Governor-in-Council) এর উপর ন্যাস্ত করা হয়। তবে এ সকল উপ-আইন বা বিধি প্রণয়নের পূর্বে কোম্পানীর কোর্ট অব ডিরেক্টরসের নিকট হতে লিখিতভাবে পূর্বানুমতি নিতে হতো। সুতরাং ১৭২৬ সালের সনদটি ভারতের তিনটি প্রেসিডেন্সি শহরে (মাদ্রাজ, কলকাতা ও বোম্বে) প্রথমবারের মত একটি অধীনস্ত আইন প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষের সৃষ্টি করে। তাছাড়াও একজন মেয়র ও নয়জন অলডারম্যান (Alderman) এর সমন্বয়ে প্রত্যেকটি প্রেসিডেন্সি শহরে মেয়রের আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়।[8]

এই আদালতের কার্যবিধি বিস্তারিতভাবে সনদে উল্লেখ ছিল এবং এটা অনেকাংশেই ইংলিশ আদালত কর্তৃক গৃহীত কার্যবিধির উপর ভিত্তি করে তৈরী কার হয়েছিল। এই সনদ অনুযায়ী মেয়রের আদালতের বিরুদ্ধে গভর্নর এবং কাউন্সিলের নিকট আপীল করা যেত এবং মামলার মূল্যমান ভেদে

---

[8] M.C. Setalved, *The Common Law of India*, London: Stevens and Sons Ltd. 1960, p. 12-18.

কোন কোন ক্ষেত্রে গভর্নর এবং কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরাসরি কিং ইন কাউন্সিল (King-in-Council) এর নিকট দ্বিতীয় আপীল করা যেত।

৩.২.১০ ১৭৫৩ সালের সনদ

১৭২৬ সালের সনদের মাধ্যমে প্রত্যেকটি প্রেসিডেন্সি শহরে করপোরেশন ও মেয়রের আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়। মেয়রের আদালত এ স্বাধীনভাবে কাজ করার কথা থাকলেও নির্বাহী বিভাগ তথা গভর্ণর ও কাউন্সিলের সাথে সম্পর্ক অবনতি হয়। প্রকৃতপক্ষে নির্বাহি বিভাগ বিচার বিভাগের এই স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গির উপর হিংসা ও বিদ্বেষ ছড়ায়। বোম্বে, কলকাতা ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে মেয়রের আদালত এবং গভর্নর অফ কাউন্সিলের মধ্যে চলমান এই অসন্তোষ, বিবাদ, হিংসা, ও বৈরিতার জন্য কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ১৭২৬ সালের এই সকল দোষ-ত্রুটিকে দূরীভূত করার উদ্দেশ্যে ১৭৫৩ সালে ৮ জানুয়ারী রাজা ২য় জর্জ (2nd Jorge) একটি রাজকীয় সনদ জারি করে।

১৭২৬ সালের সনদের কিছু বিধানের সংস্কার করে মাদ্রাজ, কলকাতা ও বোম্বেতে পুনরায় এই সনদ মেয়রের আদালত প্রতিষ্ঠা করে। তাছাড়াও প্রত্যেক প্রেসিডেন্সিতে স্বল্প মূল্যমানের দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচারের জন্য কোর্ট অফ রিকুয়েস্ট (Court of Request) প্রতিষ্ঠা করে।[৫]

৩.৩ দেওয়ানী উত্তর কোম্পানীর সনদসমূহ

১৭৬৫ সালের ১৬ আগস্ট শাহ আলমের কাছ থেকে ২৬,০০,০০০ টাকার বিনিময়ে বাংলা, বিহার ও উড়িশ্যার দেওয়ানী (দেওয়ানী বলতে খাজনা সংগ্রহ ও গ্রহণের ক্ষমতাকে বুঝায়) লাভ করে।

৩.৩.১ ১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং এ্যাক্ট

১৭৬৫ সালে দিল্লীর বাদশাহের নিকট থেকে বাংলা-বিহার উড়িষ্যার দিউয়ানি লাভ করে কোম্পানী একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানে পরিনত হয়। কোম্পানী কর্তৃক এই দিউয়ানি প্রাপ্তির পরের বছর ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কোম্পানীর অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য একটি কমিটি গঠন করে। এই আইনগুলোর মধ্যে দু'টি আইনের মাধ্যমে কোম্পানীকে চার লক্ষ পাউন্ড দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয় পরপর দু'বছর। এর বিনিময়ে কোম্পানী ঐ সময়কালে ভারতের অধিকৃত অঞ্চল ও সংগৃহীত রাজস্ব ভোগদখল করতে পারবে। এই আইনগুলোর মাধ্যমে ঘোষিত হয় ভারতবর্ষে

---

[৫] Henry Daviso Love, *Vestiges of old Madres*, 1640-1800, Mitali Publication, 110059, India, V-11, p-440.

কোম্পানীর আয় ও দখলিকৃত অধিকার নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা পার্লামেন্টের আছে। কিন্তু অন্যদিকে শেয়ারহোল্ডারগণ যারা কোম্পানীর অংশীদারিত্বের নামে দূর্নীতিতে অংশগ্রহণ করেছিল তাদের পকেটে প্রচুর অর্থের সমাগম হলেও কোম্পানীর মুনাফা দিন দিন কমে যাচ্ছিল। তাছাড়া দিউয়ানি প্রাপ্তির পর বাংলার ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় যে বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করছিল তার পরিপেক্ষিতে ১৭৭০ সালে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। দুর্ভিক্ষে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ মানুষ মারা যায় এবং কৃষি শ্রমের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ভূমি অনাবাদি জলাভূমিতে পরিণত হয়। ব্রিটিশ সরকার এসময় উপলব্ধি করে যে, কোম্পানীর কার্যকলাপের উপর ব্রিটিশ সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকা দরকার। ব্রিটিশ সরকারের এই উপলব্ধি থেকেই পার্লামেন্টে পাশ করা হয় কোম্পানী নিয়ন্ত্রণ করার আইন।

বাংলার ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন ও দায়িত্ব সংজ্ঞায়িত করে বৃটিশ পার্লামেন্ট প্রণীত সাংবিধানিক আইন হল ১৭৭৩ সালে রেগুলেটিং এ্যাক্ট বা নিয়ন্ত্রক আইন। এতদিন ভারতে কোম্পানীর শাসনকার্যে বৃটিশ পার্লামেন্ট হস্তক্ষেপ করেনি। ডিরেক্টর সভা দুটিই ভারত সংক্রান্ত সকল কার্য স্বাধীনভাবে নির্বাহ করত। বাংলা জয়ের পূর্বে কোম্পানী একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান ছিল। কিন্তু, বাংলা বিজয়ের পর কোম্পানীর কর্মকর্তা কর্মচারীদের লুটপাটের কারণে শাসনকার্য একদিকে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় অন্যদিকে কোম্পানী লোকসানে দেউলিয়া হয়ে পড়ে। ঐতিহাসিক তৃপ্ত দেশাই এর মতে-

From 1767-1769, The financial difficulties of the company became very gerious. ফলে, ইতিপূর্বে কোম্পানী বৃটিশ সরকারকে বাৎসরিক ৪৫.৭ মিলিয়ন পাউন্ড প্রদান করলে ও ১৭৬৬ সাল থেকে কোম্পানী তা প্রদানে ব্যর্থ হয় এবং কোম্পানীর লোকসানের অবসান ঘটানোর উদ্দেশ্যে বৃটিশ সরকারের কাছে ১ মিলিয়ন ঋণের আবেদন করে। এমতাবস্থায় কোম্পানীর কর্মচারীদের দুর্নীতি, দ্বৈত শাসনের ফলে শাসন ব্যবস্থার জটিলতা, সুষ্ঠু বিচার ব্যবস্থার অভাব, কোম্পানীর কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রনের জন্য কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের অভাব, ১৭৬৯ সালে ইঙ্গ-মহিসুরের যুদ্ধে হায়দার আলীর নিকট কোম্পানীর পরাজয় এবং সর্বোপরি ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ফলে বৃটিশ সরকার কোম্পানীর নব বিজিত রাজ্যটিকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচতে কোম্পানীর ব্যবসা বাণিজ্যের উপর হস্তক্ষেপ করা আবশ্যক মনে করে। আর ১৭৭৩ সালে কোম্পানীর সনদ নবায়নের সময় কোম্পানীর বঙ্গরাজ্য বিষয়ে পার্লামেন্টে আলোচিত হয়।

আলোচনায় দাবি করা হয় যে, কোম্পানীর বঙ্গরাজ্য আসলে বিট্রিশের সম্পত্তি।

১৭৭৩ সালের ১৮ মে ব্রিটেনের ১১ তম প্রধানমন্ত্রী লর্ড নর্থ কোম্পানীর সংবিধান পরিবর্তনের জন্য হাউজ অফ কমন্সে রেগুলেটিং আইন পাশ করেন। অবশেষে ২১ জুন লর্ড সভার রাজকীয় সম্মতির মাধ্যমে এটিকে আইনে পরিণত করা হয়। আইনটির বিভিন্ন অনুচ্ছেদ বা ধারায় ৬৪টি অধ্যায় ছিল। কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা ও নতুন রাষ্ট্রের প্রশাসন কিভাবে পরিচালিত হবে সে বিষয়ে রেগুলেটিং এ্যাক্টে ব্যাখ্যা দেয়া হয়। এর মাধ্যমে দুটি সমান্তরাল বিষয়ের জন্ম হয়।

ক. কোম্পানী ব্যবস্থাপনায় ধীরে ধীরে সরকারী (ব্রিটিশ) নিয়ন্ত্রণ প্রবেশ করে এবং

খ. ১৮৫৮ সালে কোম্পানীর সম্পূর্ণ বিলুপ্তি হওয়া পর্যন্ত সময়ে কোম্পানীর ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়।

রেগুলেটিং আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ভারত কোম্পানীকে তার অবস্থান ও ক্ষমতা ধরে রাখার অনুমতি দেয়া হবে। তবে, সকল ব্যবস্থাপনা বৃটিশ সরকারের অধীনে আনা হয়। এই আইন হওয়ার কাল থেকেই ভারতের শাসনকার্যে হস্তক্ষেপ করতে থাকে এবং ব্রিটিশ শাসিত ভারতের প্রজাবৃন্দের ও শুভাশুভের দায়িত্ব ক্রমশ গ্রহণ করে।[৬]

হেস্টিংসের জীবনীকার L.J Trotter বলেন- The regulating Act of 1773 was the first serious attempt made by British Legislature to set up in India a form of government suitable to changes condition of the company’s official work.[৭]

১৭৭৩ সালের Regulating Act শুধু কলকাতা শহর ও শহরতলীর উপর ব্রিটিশ সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে নিশ্চুপ থাকে। কোম্পানী কর্মকর্তাদের অসদাচারণ ও দুর্নীতি দমন করে স্বদেশীয়দের কল্যাণের জন্য এ নিয়ন্ত্রক আইন প্রণীত হলেও দেখা যায় যে, এ বিধানগুলো দুর্নীতি দমন করতে ব্যর্থ হয় এবং সর্বোচ্চ গর্ভনর জেনারেল থেকে শুরু করে নিম্নতর স্তর জেলা কর্মকর্তাদের মধ্যে ঢালাওভাবে দুর্নীতি আসতে থাকে।[৮] এছাড়া শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা যায়। এভাবে এই আইনসমূহ ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তনের বদলে কোম্পানীর কর্মচারীদের মধ্যে ব্যাপক আকারে দ্বন্দ্ব ও মতবিরোধ সৃষ্টি করে।

---

[৬] ইনাম-উল-হক, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৯) পৃ. ১৬০; Vincent Smith, *Oxford History of India*, Oxford at the clarndon press, 1914, p. 521.

[৭] L.J Trotter, *Waren Hastings* (United Kingdom: Baker Press, 2009), p. 75.

[৮] বাংলাপিডিয়া, *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি*, ২০০৪, খণ্ড ১২, পৃ. ২২৩।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং আইনের নিম্নলিখিত বৈশিষ্টগুলো প্রণিধানযোগ্যঃ

১৭৭৩ সালের নিয়ন্ত্রণকারী আইনের প্রধান প্রধান ধারা সমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

১. এ আইনের মাধ্যমে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক অধিকৃত ভারতের স্থল অঞ্চলের ওপর ব্রিটেনের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

২. এ আইন দ্বারা বাংলার সর্বোচ্চ শাসনকর্তাকে গভর্ণর জেনারেল বা বড়লাট আখ্যা দেয়া হয় এ আইন দ্বারা ৪ সদস্য বিশিষ্ট্য কার্যনির্বাহী পরিষদ বা গভর্ণর জেনালের পরিষদ গঠন করা হয়। পরিষদের কাজ ছিল গভর্ণর জেনারেলের প্রশাসন কর্মকান্ডে সহযোগিতা করা। পরিষদের কার্যকাল ছিল ৫ বছর। এ আইন অনুযায়ী প্রথম গভর্ণর জেনারেল নিয়োগ লাভ করেন ওয়ারেন হেস্টিংস।

৩. এ আইনে বলা হয়, গভর্ণর জেনারেল পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে কার্য পরিচালনা করবেন।

৪. বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয় সপরিষদ গভর্ণর জেনারেলের ওপর।

৫. এ আইনে বলা হয়, বোম্বাই ও মাদ্রাজের সপরিষদ গভর্ণরগণ সপরিষদ গভর্ণর জেনারেল আদেম নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।

৬. এ আইনে বলা হয়, নতুন বিধি-বিধান প্রবর্তনের পূর্বে সপরিষদ গভর্ণরগণ সপরিষদ গভর্ণর জেনারেলকে অবহিত করবেন।

৭. সপরিষদ গভর্ণর জেনারেলকে কিছু বিষয় আইন প্রণয়ন ও অধ্যাদেশ জারীর ক্ষমতা দেয়া হয়।

৮. প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য ৩ জন বিচারপতি সমন্বয়ে কলকাতায় একটি সুপ্রিম কোর্ট করা হয়। সুপ্রিম কোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন স্যার ইলিজা ইম্পে (Sir Elijah Impay)

৯. এ আইন দ্বারা কোম্পানীর কর্মচারীদের উপহার, উপঢৌকন বা দান গ্রহণ এবং ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্য নিষিদ্ধ করা হয়।

১০. এ আইনে অপরাধ করলে ইংল্যান্ডস্থ রাজকীয় বিচারালয় (Kings Banch) সপরিষদ গভর্ণর জেনারেল, সপরিষদ গভর্ণরগণ, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অধঃস্তন বিচারকগণ ও কোম্পানীর ব্রিটিশ কর্মচারীগণের বিচার ও শাস্তি দিতে পারবে।

১১. এ আইন দ্বারা গভর্ণর জেনালের পরিষদের সদস্যবৃন্দ, বিচারকসহ অন্যান্যদের সম্মানজনক বেতন-ভাতাদির নির্ধারণ করা হয়।

৩.৩.২ ১৭৮১ সালের সংশোধনী আইনঃ

১৭৭৩ সালের নিয়ামক আইন প্রয়োগ করাকালীন সময়ে এ আইনের অনেক ত্রুটি ধরা পড়ে। দীর্ঘ আট বছর পর ১৭৮১ সালে এর ত্রুটির প্রতি পার্লামেন্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ১৭৮১ সালে পার্লামেন্ট ভারতে বিচারব্যবস্থা কিভাবে পরিচালিত হচ্ছে তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য একটি কমিটি গঠন করে। ঐ বছরই কমিটি তাদের প্রথিমিক রিপোর্ট পেশ করেন যার উপর ভিত্তি করে ১৭৮১ সালে একটি সংশোধনী আইন (Amending Act) পাশ করা হয়।

১৭৭৩ সালের নিয়ামক আইনের কতিপয় ত্রুটি দূর করাই ছিল ১৭৮১ সালের সংশোধনী আইন এর প্রধান উদ্দেশ্যে।

প্রথমতঃ ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সাধারণ কর্মচারীদের সরকারিভাবে পালনকৃত কোন কার্যকলাপ সুপ্রিম কোর্টের আওতায় পড়বে না। তাছাড়াও গর্ভনর জেনারেল এবং তার কাউন্সিলের যুগ্ম কিংবা পৃথকভাবে পালনকৃত কোন সরকারি কার্যকলাপও সুপ্রিম কোর্ট এর আওতায় পড়বে না। তবে ভারতে বসবাসরত ব্রিটিশ নাগরিক সংক্রান্ত আদেশ সুপ্রিম কোর্টের আওতাধীন থাকবে। কোম্পানীর রাজস্ব আদায়কারী এবং রাজস্ব আদায় সম্পর্কিত কোন বিষয়ও সুপ্রিম কোর্ট এর আওতাধীন থাকবে না। অন্যান্য স্থানে বিচারকার্যে নিয়োজিত কোম্পানীর কর্মচারীরাও তাদের বিচারকার্য সুপ্রিম কোর্টের আওতামুক্ত থাকবে।

দ্বিতীয়তঃ কোম্পানীর কর্মচারী এবং দেশের সাধারণ লোকদের উপর সুপ্রিম কোর্টের কি ধরণের ক্ষমতা থাকবে তা ১৭৮১ সালে সংশোধনী আইন নির্ধারণ করে দেয়। যেমনঃ

ক, কলকাতায় বসবাসরত সব নাগরিকদের উপর সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা থাকবে তবে বিবাদীদের ক্ষেত্রে তাদের ব্যক্তিগত আইন প্রযোজ্য হবে।

খ. কোম্পানীকে তাদের ভারতীয় কর্মচারীদের নাম, ঠিকানা, পেশা ইত্যাদির রেকর্ড লিখিতভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

গ. কোম্পানীর কর্মচারী, অথবা তাদের ব্রিটিশ অফিসার অথবা ভারতে বসবাসরত যে কোন ইংরেজ দিওয়ানী সংক্রান্ত মামলার সুপ্রিম কোর্টের আওতায় থাকবে।

তৃতীয়তঃ সুপ্রিম কোর্ট ভারতে কি ধরনের আইন প্রয়োগ করবে, ১৭৮১ সালের সংশোধনী আইন তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করে দেয়। জমি, সম্পত্তি সম্পর্কিত এবং অন্যান্য সব মামলার আসামী ও বিবাদীদের ব্যক্তিগত আইন (personal Law) দ্বারা পরিচালিত হবে অর্থাৎ দু'পক্ষ মুসলমান হলেও মুসলিম আইন, দু'পক্ষ হিন্দু হলে পৃথকভাবে দু-আইনই তাদের উপর প্রয়োগ করা হবে। এছাড়াও প্রত্যেক পক্ষের সামাজিক রীতিনীতি, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, পরিবারের প্রধানের কর্তৃত্ব এ সবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও স্বীকৃতি দিতে হবে। ব্রিটিশ আইনের চোখে এসব অবৈধ বলে মনে হলেও সুপ্রিম কোর্ট ব্রিটিশ আইন ভারতে প্রয়োগ করতে পারবে না।

চতুর্থতঃ দেশের অন্যান্য স্থানের কোর্ট কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোর বিরুদ্ধে গভর্ণর জেনারেল-ইন-কাউন্সিলের কাছে আপীল করার ক্ষমতা এবং গভর্নর জেনারেল-ইন-কাউন্সিলকে ঐসব সিদ্ধান্ত পুর্নবিবেচনা করার ক্ষমতা দেয়া হয়। যে মামলাগুলো পাঁচ হাজার পাউন্ড পর্যন্ত সেগুলোই শুধু গভর্ণর জেনারেল-ইন-কাউন্সিল কোর্ট এর আওতায় পড়বে। এছাড়াও গর্ভণর জেনারেল-ইন- কাউন্সিল সংক্রান্ত বিষয়ে রাজস্ব কোর্ট হিসেবে কাজ করতে পারবে।

সর্বশেষ, ১৭৮১ সালের আইন গভর্ণর জেনারেল-ইন-কাউন্সিলকে প্রাদেশিক কোর্ট এবং কাউন্সিলের জন্য আইন তৈরী করার ক্ষমতা দেয়। এ অধিকার যদিও ১৭৭৩ সালের আইনেও ছিল কিন্তু এ ধরণের আইন তৈরী করতে গেলে প্রথমে সুপ্রিম কোর্টের অনুমোদনের প্রয়োজন হতো। ফলে এই অধিকার নিয়ে গভণর জেনারেল-ইন-কাউন্সিল এবং সুপ্রিম কোর্টের মধ্যে দ্বন্দ্ব লেগেই থাকতো। ১৭৮১ সালের আইন সুপ্রিম কোর্টের অনুমোদন করার অধিকার বাতিল করে গভর্ণর জেনারেল-ইন-কাউন্সিলকে স্বাধীনভাবে আইন প্রনয়ন করার ক্ষমতা দেয়।

এভাবে ১৭৮১ সালের সংশোধনী আইনের মাধ্যমে ১৭৭৩ সালের নিয়ামক আইনের অনেক ত্রুটি দূর করা হয়। এ সংশোধনী আইনের মাধ্যমে গভর্ণর জেনারেল-ইন-কাউন্সিলের ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সুপ্রিম কোর্টর এখতিয়ার সুনির্দিষ্ট করা হয়।

৩.৩.৩ ১৭৮৪ সালের পিটের ভারত শাসন আইন

১৭৮৪ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট প্রণীত ভারত বিষয়ক সংস্কারমূলক আইনটির নাম পিটের ভারত শাসন আইন। সে সময় ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন পিট। তাঁর নামানুসারে বিলটির নামকরণ করা হয়। ঐ আইনের মূল উদ্দেশ্য ছিল রেগুলেটিং এ্যাক্টের বিচ্যুতিগুলো দূর করা এবং কোম্পানীর লন্ডন পরিচালক সভার উপর ব্রিটিশ সরকারের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করা।

ভারতবর্ষে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই ইংল্যান্ডের বৃটিশ সরকার কোম্পানীর কার্যকলাপের উপর খুব একটা সন্তুষ্ট ছিলনা।

কোম্পানী ও তার কর্মচারীদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বৃটিশ পার্লামেন্ট একাধিক আইন প্রনয়ন করে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- পিটের ভারত শাসন আইন বা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী আইন ১৭৮৪। রেগুলেটিং এ্যাক্টের প্রধান দুটি লক্ষ্য ছিল। প্রথমটি হল, ব্রিটিশ প্রশাসনিক নীতি অনুযায়ী রাজ্য পরিচালনা করা এবং দ্বিতীয়টি হল কোম্পানীর কর্মচারীদের লাগামহীন দূর্নীতি দূর করা। কিন্তু উদ্দেশ্য সাধনে আইনটি অকার্যকর প্রমানিত হয়।[৯] দশ বছর চালু থাকার পর এ আইনের অনেক ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। ফলে রেগুলেটিং এ্যাক্টের ত্রুটিগুলো দূর করার উদ্দেশ্য ১৭৮৩ সালে চার্লস জেমস ফক্স এবং লর্ড নর্থ কোয়ালিশন সরকার একটি বিল উত্থাপন করে।[১০] কিন্তু লর্ড সভা কর্তৃক বিলটি প্রত্যাখ্যাত হয়। ১৭৮৪ সালে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী পিট (pitt tre younger) ইন্ডিয়া এ্যাক্ট নামে আরেকটি ভারত শাসন আইন পার্লামেন্ট পাশ করেন।

এই আইন অনুসারে বোর্ড অব কন্ট্রোল নামে ইংরেজ রাজা কর্তৃক মনোনীত মন্ত্রী পরিষদের একজন সিনিয়র সদস্যকে প্রধান করে সবোর্চ্চ ৬ জন পার্লামেন্ট সদস্য নিয়ে গঠিত একটি পরিষদের উপর ভারতের শাসনভার ন্যস্ত হয়। এর কাজ হবে ভারতবর্ষে কোম্পানীর রাজ্য পরিচালনার কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করা। কোম্পানীর সমস্ত কাগজপত্রে এর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কোর্ট অব প্রোপাইর্টাস এর ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস করা হয়। গভর্ণর জেনারেল পরিষদের সদস্য সংখ্যা চারজন থেকে কমিয়ে তিনজন করা হয়। এদের মধ্যে একজন থাকবে ভারতবর্ষের রাজার সেনাবাহিনীর কমান্ডার ইন চীফ। পিটের ভারত শাসনে আরও বলা হয় চাকুরীতে যোগদানের দু-

---

[৯] বাংলাপিডিয়া, *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি*, ২০০৪, খণ্ড ৭, পৃ. ৩৫৮।

[১০] Tripta Deshai, *The East India Comapy: A brief survey from (1599-1857) Kanak Publication, 1984,* p. 192.

মাসের মধ্যে সব সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাকে ভারত ও ব্রিটেনে যাবতীয় সম্পদের একটি পূর্ণ তালিকা কোর্ট অব ডাইরেক্টরসের নিকট পেশ করতে হবে। এভাবে কোম্পানীর সর্বোচ্চ ক্ষমতা পরিষদের হাতে নিজস্ব কর্মচারীদের নিয়োগ ও বরখাস্ত সংক্রান্ত ক্ষমতা অবশিষ্ট থাকে।[১১]

তৃপ্ত দেশাই এর মতে-

According to the Act of 1784, the commerce and the political affairs of the company were separated by leaving the company in full control of commerce while the board exercised control on political affairs.[১২]

অন্যদিকে এনসাইক্রোপিডিয়া ব্রিটানিকা তে বলা হয়েছে-

Its essence was institution of a dual control. The directors were left in charge of commerce and political executants, but they were politically superintended by a new board of control.[১৩]

পিটস ইন্ডিয়া এ্যাক্টের মূল্যায়ন করতে গিয়ে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা তে বলা হয়েছে-

Pitt’s India Act proved to be a landmark because it gave the British government control of policy without patronage.[১৪]

১৭৮৪ সালে ভারত আইনে সার্বভৌমত্বের প্রশ্নটি অমীমাংসিত থেকে যায়। এই আইন বাস্তবায়ন করার জন্য পার্লামেন্ট লর্ড কর্নওয়ালিশকে সরাসরি নিয়োগ দান করে।

পিটের ভারত আইনের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য বা ধারাসমূহ নিম্নরূপ:

১. নিয়ন্ত্রণ বোর্ড গঠন:

এ আইনের মাধ্যমে ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি বোর্ড অব কন্ট্রোল গঠিত হয় এ বোর্ডের ৬ জন সদস্য ছিলেন ব্রিটেনের অর্থমন্ত্রী, রাষ্ট্রসচিব ও প্রিভি কাউন্সিলেন ৪ জন সদস্য। রাষ্ট্রসচিব সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন। বোর্ড অব কন্ট্রোলের অফিসিয়াল নাম ছিল Commissioners for the affairs

---

[১১] ইনাম-উল-হক, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৯) পৃ. ১৬১।

[১২] Tripta Deshai, *The East India Comapy: A brief survey from (1599-1857) Kanak Publication, 1984,* p. 234.

[১৩] *Encyclopaedia Britanica,* Vol. 21, p. 88.

[১৪] *Ibid.*

of the India. বোর্ড অব কন্ট্রোল ভারতে কোম্পানীর শাসন কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শনের দায়িত্ব পান। বোর্ড অব কন্ট্রোলের সদস্যগণকে নিয়োগ দান ও বরখাস্তকরণের ক্ষমতা ছিল ব্রিটিশ রাজের হাতে।

২. বোর্ড অব কন্ট্রোলের ক্ষমতা : বোর্ড অব কন্ট্রোল ভারতে প্রশাসন পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্যে ব্যাপক ক্ষমতা লাভ করে।

৩. গোপন কমিটি গঠন: এ আইনের মাধ্যমে ভারতের যুদ্ধ ঘোষণা, শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর প্রভৃতি ক্ষেত্রে ৩ জন সদস্য নিয়ে একটি গোপন কমিটি গঠন করা হয়।

৪. বেতন-ভাতা: এ আইনের মাধ্যমে বোর্ড অব কন্ট্রোলের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য খরচাদি ভারত থেকে প্রদানের আইন করা হয়।

৫. সপরিষদ গভর্ণর জেনারেল: এ আইনের মাধ্যমে ব্রিটিশ ভারতে সকল প্রেসিডেন্সীর কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ ও তদারকের দায়িত্ব দেয়া হয় স্বপরিষদ গভর্ণর জেনারেলকে।

৬. গভর্ণর জেনারেল ও গভর্ণরের নির্বাহী পরিষদের গঠন: এ আইনের মাধ্যমে নির্বাহী পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৩ জন জন করা হয়।

৭. নিয়োগ পদ্ধতি : ভারতের গভর্ণর জেনারেল নিয়োগ লাভ করবেন ব্রিটিশ রাজের অনুমোদন সাপেক্ষে বোর্ড অব ডিরেক্টরস কর্তৃক।

৮. বিশেষ আদালতে গঠন: এ আইন দ্বারা ৩ জন বিচারক, ৪ জন পিয়ের ও ৬ জন কমন্স সভার সদস্য নিয়ে বিশেষ আদালত গঠন করা হয়।

৯. বাণিজ্যিক লেনদেন নিষিদ্ধ : এ আইনের মাধ্যমে কোম্পানীর কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ ভারতীয় রাজন্যবর্গের সাথে যে কোন লেনদেন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

১০. যুদ্ধ ঘোষণা: কোন যুদ্ধ ঘোষণা অথবা শান্তি স্থাপনের পূর্বে গভর্ণর জেনারেলকে বোর্ড অব কন্ট্রোলের অনুমতি নেয়ার বিধান করা হয়।

৩.৩.৪ ১৭৯৩ সালের সনদ আইন:

১৭৮১ সাল থেকে হেস্টিংসের সব সংস্কারের উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা। সদর দিওয়ানি আদালত সদর নিয়ামত আদালত প্রতিষ্ঠা করে তিনি পরোক্ষভাবে সার্বভৌমত্বই ঘোষণা

করেন। হেস্টিংস সার্বভৌমত্বের চূড়ান্ত রূপরেখা রচনা করেন। তার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করেন লর্ড কর্নওয়ালিস।১৭৯০-৯৩ সনে লর্ড কর্নওয়ালিস একটি পুর্নাঙ্গ শাসনতন্ত্র রচনা করেন। সে শাসনতন্ত্রে পরিস্কার ঘোষনা করা হয় যে, দেশের সার্বভৌম কর্তা হলো ইংরেজ।[১৫]

১৭৯৩ সালের ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী আইন। যেটি (চার্টার সনদ, ১৭৯৩ নামে পরিচিত ছিল) তা বৃটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক কোম্পানীর সনদ নবায়নের উদ্দেশ্য প্রণীত একটি আইন।

George D. Bearce এর মতে, From 1784 to 1813 parliament passed almost no significant legislation relating to the East India company or to India. A charter Act of 1793 slightly attend the commercial system of India.[১৬]

এ আইনে ভারতবর্ষে কোম্পানীর শাসন পদ্ধতি ও কর্মকান্ডের প্রতি বৃটিশ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির সামান্য পরিবর্তন আনা হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল এ সনদে বেসরকারি বৃটিশ ব্যবসায়ীদের চাপে কোম্পানীর একচেটিয়া বানিজ্য করার অধিকার কিছুটা শিথিল করা হয়। কোম্পানীর জাহাজগুলোতে বেসরকারি ব্যবসায়ীদের মালামাল পরিবহণ করার জন্য সংরক্ষিত স্থানে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া এই সনদে আরও যে বিষয় অর্ন্তভূক্ত করা হয় তাহলো—

ক. গভর্ণর জেনারেল, গভর্ণর এবং কমান্ডার ইন চীফ নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজকীয় অনুমোদন বাধ্যতামূলক করা হয়।

খ. সিনিয়র কর্মকর্তাদের অনুমতি ছাড়া ভারত ত্যাগের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

গ. অধীনস্থ প্রদেশ সমূহের উপর গভর্ণরের ক্ষমতা অনুমোদন দেয়া হয়।

১৭৯৩ সালে সনদ আইন কোম্পানীর অবস্থান পুন:নির্ধারন করে। এভাবে কোম্পানীর উপর ব্রিটিশ সরকারের ক্ষমতা ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং কোম্পানীর রাজনৈতিক কর্মকান্ড হ্রাস পেতে থাকে। পরবর্তীতে, ১৮১৩ সালে সনদ আইন অনুযায়ী কোম্পানীর সনদ নবায়ন করা হয়।

১৭৯৩ সালের সনদ আইনের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য বা ধারাসমূহ নিম্নরূপ

---

[১৫] N.K. Sinha, *The History of Bengal 1757-1905* (Calcutta: University of Calcutta, History of Bengal Publication Committee, 1967), pp. 80-81.

[১৬] George D. Bearce, *British Attitudes Towards India, 1784-1858* (London: Oxford University Press, 1961), p. 36.

১. বোর্ড গঠন: এ আইনের মাধ্যমে বোর্ড অব কন্ট্রোলের গঠন পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনায়ন করা হয়। এতে বিধান করা হয় যে, বোর্ড অব কন্ট্রোলের কমিশনারদের মধ্যে প্রথম নামোল্লিখিত কমিশনের এর সভাপতি পদ অলংকৃত করবেন। বোর্ডের দু'জন সদস্যের প্রিভি কাউন্সিল হওয়ার বাধ্য-বাধকতা তুলে নেয়া হয়।

২. বোর্ডের সদস্যদের বেতন : এই আইনের মাধ্যমে সর্বপ্রথম বোর্ড অব কন্ট্রোলের সদস্যগণের বেতন প্রদানের বিধান করা হয়। এখন থেকে বোর্ড অব কন্ট্রোলের সদস্য ও বোর্ডের কর্মচারীদের বেতন ভারতীয় জনগণের দেয়া রাজস্ব থেকে প্রদান করা হবে।

৩. মেয়াদ বৃদ্ধি : কতিপয় শর্তসাপেক্ষে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক সুবিধাদির মেয়াদ আরও ২০ বছরের জন্যে বৃদ্ধি করা হয়।

৪. সম্রাটের ক্ষমতা: এ আইনের করা হয় যে ব্রিটিশ রাজ অত্যাবশ্যকীয় ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষার জন্য ভারতের সব রাজস্ব ব্যয় করার ক্ষমতা ভোগ করবেন। এক্ষেত্রে ব্রিটিশ রাজ ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বিনিয়োগের প্রশ্নটি বিবেচনায় আনতে বাধ্য থাকবেন না।

৫. আর্থিক ব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ: এ আইনের মাধ্যমে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আর্থিক ব্যবস্থার ওপর কিছু নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। যেমন, কোম্পানীর রাজস্ব উদ্বৃত্ত ধরা হয় **১২,৩৯,২৪১** পাউন্ড। এর মধ্য থেকে ৫,০০,০০০ পাউন্ড পর্যন্ত ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ঋণ পরিশোধের জন্যে ব্যয় করবে এবং পাঁচ লক্ষ পাউন্ড প্রদান করবে ব্যবসায়ের লভ্যাংশ হিসেবে কোম্পানীতে লগ্নিকারকদের দেয়ার জন্যে।

৬. প্রধান সেনাপতির অবস্থান: এ আইনের বিধান করা হয় যে, ভারতের কমান্ডর ইন চীফ পদাধিকার বলে গভর্ণর জেনারেলের Executive Council এর সদস্য হতে পারবেন না এর জন্যে কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডের অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

৭. নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয় : এ আইনে বলা হয় যে, গভর্ণর জেনালের গভর্ণরগণ ও কমান্ডার ইন চীফ ব্রিটিশ রাজের সম্মতিক্রমে নিযুক্ত হবেন।

৮. বিশেষ ক্ষমতা: এ আইনে গভর্ণর জেনারেল গভর্ণরদ্বয়কে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হয়। বলা হয় গভর্ণর জেনারেল এবং বোম্বাই এ মাদ্রাজের গভর্ণরদ্বয় বিশেষ পরিস্থিতিতে স্ব স্ব নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য থাকবেন না।

৯. গভর্ণর জেনারেলের ক্ষমতা বৃদ্ধি: এ আইনের মাধ্যমে গভর্ণর জেনারেলের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হয়। এ আইনে বিধান করা হয়, গভর্ণর জেনারেল মাদ্রাজ অথবা বোম্বাই পরিদর্শনে গমন করলে তিনি সংশ্লিষ্ট প্রেসিডেন্সির প্রশাসন প্রধান হিসেবে স্থানীয় গভর্ণরের স্থলাভিষিক্ত হবেন। তিনি সেখানকার নির্বাহী পরিষদের সভায়ও সভাপতির আসন অলংকৃত করবেন।

১০. সহ সভাপতি নিয়োগ সংক্রান্ত: এ আইনে বিধান করা হয় যে, গভর্ণর জেনারেল তাঁর নির্বাহী পরিষদের সদস্যগণের মধ্য থেকে একজনকে সহসভাপতি নিয়োগ করবেন। গভর্ণর জেনারেলের অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি তার দায়িত্ব পালন করবেন।

১১. বিধি-নিষেধ আরোপ: এ সদন আইনে বিধান করা হয় যে, গভর্ণর জেনারেল, গভর্ণরগণ, কমান্ডার-ইন-চীফ ও অন্যান্য উচ্চ কর্মকর্তাগণ কার্যকালীন সময়ে Board of Director এর অনুমতি ব্যতিরেকে কেউ ভারত ত্যাগ করতে পারবেন না। বৈধ অনুমতি ব্যতিরেকে ভারত ত্যাগ করলে তা উক্ত কর্মকর্তার পদত্যাগ বলে বিবেচিত হবে।

১২. বিচারক নিয়োগ: এ সনদ আইনে বিধান করা হয় যে, ব্রিটিশ রাজের নামে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে স্বপরিষদ গভর্ণর জেনারেল যে কোন প্রেসিডেন্সিতে বিচারক নিয়োগ দিতে পারবেন।

১৩. পদমর্যাদা ও পদোন্নতি : ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদমর্যাদা নির্ধারণ ও পদোন্নতি প্রদানের জন্যে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা সর্বপ্রথম ও আইনের মাধ্যমে প্রণীত হয়।

১৪. পদপূরণ সংক্রান্ত: কোন প্রেসিডেন্সির চাকরি শূন্য পদ ঐ প্রেসিডেন্সির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দ্বারাই পূরণ করার বিধান করা হয়। কোম্পানীর চাকরিতে বহিরাগতদের নিয়োগ বন্ধ করা হয়।

১৫. সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা বৃদ্ধি: কলকাতাস্থ সুপ্রিম কোর্টের নৌবাহিনী বিষয়ক ক্ষমতা দূর সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত করা হয়।

৩.৩.৫ ১৮১৩ সালের সনদ আইন:

ভারতে কোম্পানীর ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র একটি অনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রে পরিনত হওয়া এবং মুক্ত বানিজ্যের ব্যবসায়ীদের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় পার্লামেন্ট কোম্পানীর স্বার্থ হানিকর কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

নেপোলিয়ান বোনাপোর্ট এর ১৮০৬ সালের বার্লিন ঘোষণা এবং ১৮০৭ সালের মিলান ঘোষণার মাধ্যমে ইংল্যান্ড ও তার ঔপনিবেশগুলোর সাথে ইউরোপের অন্যান্য দেশের বানিজ্যিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ

করে মহাদেশীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এমতাবস্থায় ইউরোপীয় বনিকরা কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় এবং সরকারের নিকট এশিয়ার বন্দরে প্রবেশ করার আবেদন করে। কিন্তু, কোম্পানী তার রাজনৈতিক এবং বানিজ্যিক সুবিধা বিছিন্ন করার ক্ষেত্রে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করলে **১৮১৩** সালের সনদের মাধ্যমে উপমহাদেশে ব্যবসা-বানিজ্যের উপর কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার রহিত করে ভারতকে অগাধ বানিজ্যের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। কোম্পানী অবশ্য তখনও চীনের সাথে বানিজ্যের একচেটিয়া সুবিধা ধরে রাখতে সক্ষম হয়। এ আইনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সমস্ত সম্পদের উপর রাজকীয় সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৭]

এছাড়া এই আইনের মাধ্যমে খৃষ্টান মিশনারীদেরকে ভারতে ধর্ম প্রচারের সুযোগ দেয়া হয়। তৃপ্তি দেশাই এর মতে-

The charter Act of 1813 greatly weekend the position of the directors, as the boards power were greatly increased.[১৮]

১৮১৩ সালের সনদের ফলে একটি বানিজ্যিক সংগঠন হিসেবে কোম্পানীকে বাজার নিয়ন্ত্রণকারী অন্যান্য শক্তিগুলোর সাথে কাজ করতে হয়েছে। ভারতীয় বাজারে প্রতিযোগীতায় অভ্যস্ত না হওয়ায় কোম্পানী বাণিজ্যিকভাবে ক্রমান্বয়ে একটি দুর্বল সংগঠনে পরিণত হয়। পরবর্তীতে **১৮৩৩** সালে কোম্পানীর সনদ পুনরায় নবায়ন করা হয়।

নিম্নে **১৮১৩** সালের সনদ আইনের প্রধান প্রধান ধারা সমূহ আলোচনা করা হলো:

১. মেয়াদ বৃদ্ধি: ১৮১৩ সালের সনদ আইনের মাধ্যমে ভারতে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসা-বাণিজ্যের মেয়াদ ২০ বছরের জন্যে বৃদ্ধি করা হয়। চীনের সঙ্গে চা ব্যবসাসহ একচেটিয়া বাণিজ্য অক্ষুণ্ন রাখার অনুমতি দেয়া হয়। যা চলবে আরো ২০ বছর।

২. অনুমতি গ্রহণ: এ সনদ আইন দ্বারা ব্রিটিশ ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্যে ইচ্ছুক ইংরেজ বণিক, খ্রিস্ট ধর্ম প্রচার ইচ্ছুক কোন ব্রিটিশ নাগরিক অথবা যেসব ব্রিটিশ নাগরিক ভারতে ইংরেজি ভাষা প্রবর্তন ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করতে চায় অথবা জমি খরিদ করে বসবাস করতে চায় তাদের Board of Directors এর নিকট থেকে অনুমতি নেয়ার বিধান করা হয়।

---

[১৭] ইনাম-উল-হক, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৯) পৃ. ১৬১।

[১৮] Tripta Deshai, *The East India Comapy: A brief survey from (1599-1857) Kanak Publication, 1984,* p. 253.

৩. দন্ডের বিধান: বৈধ অনুমতি ব্যতিরেকে কোন ব্রিটিম নাগরিক ভারতে আগমণ করলে আইনত দন্ডনীয় হবে বলে বিধান করা হয়।

৪. Board of Control এর ক্ষমতা বৃদ্ধি : এ আইনের মাধ্যমে Board of Control এর তত্ত্বাবধান ও নির্দেশ দানের ক্ষমতা সুনির্দিষ্ট, স্পষ্ট ও বৃদ্ধি করা হয়।

৫. অংশীদারদের লভ্যাংশ: এ সনদ আইনে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী অংশীদারদের কোম্পানীর লভ্যাংশ হতে নিয়মিত ১০.৫০% প্রদানের গ্যারান্টি দেয়া হয়।

৬. হিসাব সংরক্ষণ: এ সনদ আইনের মাধ্যমে বাণিজ্যিক হিসাব খাতও রাজস্ব হিসাব খাত নামে দু'টি স্বতন্ত্র হিসাব খাতে ব্রিটিশ ভারতে কোম্পানীর আর্থিক হিসেব রাখার ব্যবস্থা করা হয়।

৭. রাজস্ব ব্যবহারের নীতি প্রণয়ন: এতে বিধান করা হয় যে, ভারতীয় রাজস্ব থেকে প্রাপ্ত অর্থ প্রথমে সশস্ত্র বাহিনী সংরক্ষণ ও পরে কোম্পানীর ঋণের সুদ পরিশোধ করতে হবে।

৮. কর সংক্রান্ত: ভারতের স্থানীয় সরকারগুলোকে জনগণের ওপর কর বসানো ক্ষমতা দেয়া হয়। কর ফাঁকিবাজাদের সুপ্রিম কোর্টের মাধ্যমে শাস্তির আওতায় আনা হবে।

৯. গভর্ণর জেনারেলের বিশেষ ক্ষমতা: যে কোন ব্যক্তির অনুমতিপত্র বা লাইসেন্স বাতিল করার এবং ঐ ব্যক্তিকে দেশ থেকে বহিষ্কারের ক্ষমতা গভর্ণর জেনারেলকে প্রদান করা হয়।

১০. তদারকী ক্ষমতা বৃদ্ধি: ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে Board of Control এর তদারকির ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। একই সঙ্গে কোম্পানীর কর্মচারীদের সামরিক ও বেসামরিক প্রশিক্ষণের ওপর বোর্ডকে ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়।

১১. সেনাবাহিনী সংক্রান্ত: ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে ২৯০০০ এর বেশি সেনা পরিপোষণের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়।

১২. কর্মচারী নিয়োগ : এ সনদে সামরিক কর্মকর্তাদের এডিস কম্ব (Adis Comboo) সামরিক বিদ্যালয় থেকে সার্টিফিকেট অর্জনকে বাধ্যতামূলক করা হয়।

১৩. ধর্মীয় বিষয়: ভারতে খ্রিস্টান জনগণের আধ্যাত্মিক মঙ্গলার্থে চার্চ নির্মাণ ও কলকাতায় একজন বিশুদ্ধ এবং অধ:স্তন তিনজন যাজক নিয়োগের বিধান ও সনদে করা হয়।

১৪. বিজ্ঞান চর্চা সংক্রান্ত : ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রাজস্ব থেকে বছরে এক লক্ষ টাকা ভারতীয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিবাসীদের সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং বিজ্ঞান চর্চার উন্নতি বিধানে ব্যয় করার নির্দেশ এ সনদ আইনে প্রদান করা হয়।

১৫. সার্বভৌম ক্ষমতা: ১৮১৩ সালের সনদ আইনের মাধ্যমে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অধিকৃত অঞ্চলসমূহের ওপর ব্রিটিশ সরকারের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়।

৩.৩.৬ ১৮৩৩ সালের সনদ আইন:

বৃটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে দেওয়া বিভিন্ন সনদ আইনের মধ্যে ১৮১৩ এবং ১৮৩৩ সালের সনদ আইন দুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৩৩ সালের সেন্ট হেলেনা আইন বা সনদের মাধ্যমে কোম্পানীকে পুনরায় ২০ বছরের জন্য ভারতে বানিজ্য করা ও কোম্পানী কর্তৃক অধিকৃত রাজ্য ইংল্যান্ডের রাজার পক্ষে পরিচালনা করার অনুমোদন দেয়া হয়। এ আইনের ফলে চীনের সাথে কোম্পানীর একচেটিয়া বানিজ্য সুবিধা বাতিল করা হয়। বাংলার গর্ভণর জেনারেলকে সমগ্র ভারতের গভর্ণর জেনারেল হন। এ আইন বলে গভর্ণর সমগ্র বৃটিশ ভারতের আইন প্রনয়নের ক্ষমতা পান। এভাবে সনদটির মাধ্যমে কোম্পানীকে অন্যদের সাথে একই সমতলে অবস্থান দিয়ে প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়।[১৯] এরপর থেকে কোম্পানী, রাজার পক্ষে একটি প্রশাসনিক প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতে থাকে। কোম্পানীর সর্বশেষ সম্মান ও সুবিধাটি ছিল ডাইরেক্টর কর্তৃক সিভিল সার্ভিসে ক্যাডেট মনোনীত করা। তৃপ্তি দেশাই এর মতে-

After this charter act the company lost all the commercial priviliges, now it was left only with administrative duties which it retained till 1857.[২০]

১৮৩৩ সালের সনদ আইনের বৈশিষ্ট্য বা ধারাসমূহ নিম্নরূপ

১. ২০ বছরের জন্যে সনদ প্রদান: ১৮৩৩ সালের সনদ আইনের মাধ্যমে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে আরো ২০ বছরের জন্যে ভারত শাসনের সনদ দেওয়া হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর কোম্পানীর একচ্ছত্র অধিকার রহিত করা হয়। এ সনদে শর্ত প্রদান করা হয় যে, ইংল্যান্ডে রাজা বা তাঁর উত্তরাধিকারীদের পক্ষে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অছি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।

---

[১৯] *বাংলাপিডিয়া*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৪, খণ্ড ৪, পৃ. ৩১৬।

[২০] Tripta Deshai, *The East India Comapy: A brief survey from (1599-1857) Kanak Publication, 1984,* p. 253.

২. এককেন্দ্রীক শাসন ব্যবস্থা: এই সনদ আইন দ্বারা ভারতে এককেন্দ্রীক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়।

৩. একীভূত আইন প্রণয়ন: ব্রিটিশ ভারতে সর্বত্র একই ধরনের আইন প্রণীত ও প্রবর্তিত হবে। জেনারেলের নির্বাহী পরিষদসহ গভর্ণর জেনারেল এ আইন প্রণয়ন করবেন।

৪. প্রচলিত আইন সংশোধন: প্রয়োজনে প্রচলিত আইন সংশোধন ও নিষিদ্ধকরণের ক্ষমতা অর্পণ করা হয় সপরিষদ গভর্ণর জেনারেলের হাতে।

৫. কোম্পানীর নাম সংক্ষিপ্তকরণ: ১৮৩৩ সালের সনদ আইনের মাধ্যমে কোম্পানীর পূর্ববর্তী নাম পরিবর্তন করা হয়। এ আইনের বলা হয়, এখন থেকে কোম্পানী 'East India Company' নামে পরিচিত হবে।

৬. গভর্ণর জেনারেল: এ সনদ আইনে বিধান করা হয় যে, বাংলার গভর্ণর জেনারেল সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের গভর্ণর জেনারেল হিসেবে গণ্য হবেন। ব্রিটিশ ভারতের বেসামরিক এবং সামরিক প্রশাসন তত্ত্বাবধান, নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশনা দেয়ার ক্ষমতা অর্পণ করা হয় সপরিষদ গভর্ণর জেনারেলকে।

৭. মন্ত্রী ও তাঁর সহকারী: এ সনদ আইনের Board of Control এর সভাপতি ভারত বিষয়ক মন্ত্রীর দায়িত্ব পাবেন। ২জন কমিশনার তাঁকে সাহায্য করবেন।

৮. মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সির আইন প্রণয়ন ক্ষমতা: ১৮৩৩ সালের সনদ আইনের মাধ্যমে বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির গভর্ণরদের স্ব স্ব প্রেসিডেন্সির আইন রচনার ক্ষমতা রহিত ঘোষণা করা হয়।

৯. আইন সদস্য নিয়োগ: গভর্ণর জেনারেলের নির্বাহী পরিষদকে আইন রচনায় সহযোগিতা দানের উদ্দেশ্য একজন আইন বিষয়ক সদস্য নিয়োগ দেয়া হয়।

১০. আইন কমিশন: ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন আইন সংগ্রহ করে তা পরীক্ষা নিরীক্ষা ও বিধিবদ্ধ করতে সপরিষদ গভর্ণর জেনারেলকে একটি আইন কমিশন গঠনের ক্ষমতা এ সনদ আইনে প্রদান করা হয়।

১১. আইন ও শাসন বিভাগ পৃথকীকরণ: সর্বপ্রথম ১৮৩৩ সালের সনদ দ্বারা ভারতের শাসন বিষয়ক দপ্তরকে আইন বিষয়ক দপ্তর থেকে পৃথক করা হয়।

১২. ঋণ ও দায়-দায়িত্ব: এ সনদের বিধান মতে, কোম্পানীর যাবতীয় ঋণ ও দায়-দায়িত্ব ভারতীয় রাজস্ব হতে নির্বাহের ব্যবস্থা করা হয়।

১৩. রাজস্ব আদায়: সপরিষদ গভর্ণর জেনারেলের কর্তৃত্বাধীনে সকল ধরনের রাজস্ব আদায়ের বিধান করা হয়।

১৪. বৈষম্য দূরীকরণ: প্রথমবারের মত এ সনদ আইন দ্বারা ভারতীয়দের প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের উদ্যোগ গৃহীত হয়। ধর্ম, জন্মস্থান, বংশ বা বর্ণ নির্বিশেষে কোম্পানীর সব ভারতীয় প্রজা কোম্পানীর কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ লাভের সুযোগ পাবে।

১৫. রাজনৈতিক কার্যক্রম: এ সনদ আইনে বিধান করা হয়, ১৮৩৩ সালের পর কোম্পানীর বাণিজ্যিক কার্যক্রম থাকবে না, শুধু রাজনৈতিক কার্যক্রম থাকবে।

৩.৩.৭ ১৮৫৩ সালের সনদ আইন:

ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর জন্য প্রণীত ১৮৫৩ সালের সনদ আইন হচ্ছে সর্বশেষ সনদ আইন। যেটি ১৮৩৩ সালের সনদ আইনের মেয়াদোত্তীর্ণের সময় প্রদান করা হয়। অন্যান্য সনদ আইনের সাথে এর ব্যতিক্রম হল এর মাধ্যমে কোম্পানীর সনদ নবায়ন করা হলেও এতে নবায়নের কোন নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ করা হয়নি। ১৮৫৩ সালের সনদ আইন ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য অধিকার ও পৃষ্ঠপোষকতা জনিত বিশেষ সুবিধা সব বিলোপ করা হয়।[২১]

এখন থেকে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে মেধার ভিত্তিতে সিভিলিয়ান নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়।[২২]

ডাইরেক্টরদের সংখ্যা ২৪ থেকে ১৮ তে জমানো হয়। যার মধ্যে ৬ জন নিয়োজিত হবেন রাজা কর্তৃক। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার প্রশাসনিক দায়িত্ব একজন লেফটেন্যান্ট গভর্ণরের উপর ন্যস্ত করা হয়। কাউন্সিল পুর্ণগঠন করে এর সদস্য সংখ্যা ৬ থেকে বাড়িয়ে ১২ সদস্যে সীমিত করে দেয়া হয়। গভর্ণর জেনারেলের সম্মতি ছাড়া কোন আইন পাশ না করার ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া উপমহাদেশের আইনসমূহকে বিধিবদ্ধ করার জন্য করোমন্ডলে একটি আইন কমিশন নিয়োগ করা হয়।[২৩]

---

[২১] *বাংলাপিডিয়া*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৪, পৃ. ৩১৭।

[২২] Encyclopedia *Britanica*, Vol. 21, p. 88.

[২৩] ইনাম-উল-হক, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৯) পৃ. ১৬২।

১৮৫৩ সাল থেকে কোম্পানী পার্লামেন্ট কর্তৃক বেধে দেয়া নিয়মানুযায়ী ইংল্যান্ডের রাজা ও পার্লামেন্টের পক্ষে ভারত শাসনকরার বিধান করা হয়। কোম্পানীর প্রকৃত ক্ষমতা বলতে এখন তেমন আর কিছুই রইল না।[২৪]

ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা এবং দুই শত বছর ধরে ব্রিটেনের সবচেয়ে বড় সংগঠন ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এরপর একটি খোলাসে পরিনত হয় এবং ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের পর ১৮৫৮ সালে রানীর ঘোষণার মাধ্যমে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী আনুষ্ঠানিকভাবে বিলুপ্ত হয়।

১৮৫৩ সালের সনদ আইনের বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. মেয়াদবিহীন সনদ: এ সনদ আইনে বলা হয় যে, ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কোম্পানীকে যে কোন সময়েই ভারত শাসনের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিতে পারবে। অর্থাৎ এ সনদ দ্বারা কোম্পানী কর্তৃক ভারত শাসনের মেয়াদ সুনির্দিষ্ট করা হয়নি।

২. শাসন ও আইন সংক্রান্ত কার্যাদি স্বতন্ত্রীকরণ: এ সনদ আইনের মাধ্যমে গভর্ণর জেনারেলের নির্বাহী পরিষদের শাসন সংক্রান্ত ও আইন প্রণয়ন বিষয়ক কার্যাবলিকে পৃথক করা হয়। এ সনদে উল্লেখ করা হয় যে, গভর্ণর জেনারেল আইন প্রণয়ন করার সময় তাকে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, একজন পুইন জজ (Puisne Judge) বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং আগ্রা-অযোধ্যা-যুক্তপ্রদেশ কর্তৃক নিযুক্ত একজন করে প্রতিনিধি অর্থাৎ মোট ৬ জন অতিরিক্ত সদস্য সহযোগিতা করবেন।

৩. নির্বাহী পরিষদ: এ সনদ আইনের মাধ্যমে গভর্ণর জেনারেলের নির্বাহী পরিষদের সংখ্যা ৪ জনে উন্নীত করা হয়।

৪. গভর্ণর জেনারেলের আইন পরিষদ: সর্বমোট ১২ জন সদস্যের সমন্বয়ে গভর্ণর জেনারেলের আইন পরিষদ গঠন করা হবে। এ ১২ জন সদস্য হবেন-১. গভর্ণর জেনারেল স্বয়ং ২. সেনাপ্রধান ৩. গভর্ণর জেনারেল নির্বাহী বিভাগের ৩ জন সদস্য, ৪. সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, ১. জন পুইন জজ, ৬. বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও যুক্তপ্রদেশের একজন করে প্রতিনিধি।

---

[২৪] *বাংলাপিডিয়া*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৪,*খণ্ড ৪*, পৃ. ৩১৭।

৫. আইন পরিষদের কার্যপ্রণালী: আইন পরিষদে গৃহীত যে কোন বিল আইনে পরিণত হতে হলে গভর্ণর জেনারেলের অনুমোদন আবশ্যক হবে। ৭ জন সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হবে এবং কাজ আরম্ভ করা যাবে। অনুপস্থিতিতি প্রতিনিধির প্রদেশ সংক্রান্ত বিষয়ে কোন আলোচন করা যাবে না।

৬. আইন সদস্যকে পরিষদের সদস্য পদে আসীন: আইন বিষয়ক সদস্য গভর্ণর জেনারেলের নির্বাহী পরিষদের পূর্ণাঙ্গ ও স্থায়ী সদস্যপদে আসীন হবেন বলে এ আইনে বিধান করা হয়। এ বিধান বলে তিনি নির্বাহী পরিষদের বৈঠকে আসন গ্রহণ ও ভোটদানের অধিকার প্রাপ্ত হন।

৭. নিয়োগ সংক্রান্ত: Board of Control কর্তৃক প্রণীত বিধি মোতাবেক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নতুন শূণ্যপদ পূরণ করার বিধান করা হয়। এ উদ্দেশ্যে ১৮৫৪ সালে লর্ড মেকলেকে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠন করা হয়।

৮. আইন প্রণয়ন ক্ষমতা ফেরত প্রদান: এ আইনের মাধ্যমে কতিপয় শর্তসাপেক্ষে মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশ বা প্রেসিডেন্সি সরকারসমূহের নিকট আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

৯. বেতন-ভাতা সংক্রান্ত: এ আইনের বিধান করা হয় যে, Board of Control ও কোম্পানীর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি কোম্পানীকেই বহন করতে হবে। তবে বেতন ভাতা ব্রিটিশ রাজ কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

১০. Court of Directors: এ সনদ আইনের মাধ্যমে Court of Directors এর সদস্য সংখ্যা ১৮ জন নির্ধারণ করা হয়। এর মধ্যে ৬ জন মনোনীত হবেন ব্রিটিশ রাজ কর্তৃক।

১১. আইন কমিশন: এ সনদ আইনের মাধ্যমে ব্রিটেনে ভারত বিষয়ে একটি আইন কমিশন গঠনের ক্ষমতা ব্রিটিশ রাজকে দেয়া হয়। আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে সুপারিশ করার দায়িত্ব আইন কমিশনের নিকট অর্পণ করা হয়েছিল।

১২. পৃথক গভর্ণর: বাংলা প্রেসিডেন্সির জন্যে একজন গভর্ণর জেনারেল নিয়োগের বিধান এই সনদ আইনে করা হয়। তিনি নিয়োগ লাভ করবেন Court of Directors কর্তৃক।

৩.৩.৮ ১৮৫৮ সালের গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া এ্যাক্ট

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর ১৮৫৮ সালের ২ আগষ্ট ব্রিটেনের তৎকালীর লর্ড পামারস্টোন (১৮৫৫-৫৮) এর উদ্যোগে গর্ভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া এ্যাক্ট নামে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একটি নতুন আইন

পাশ করা হয়। এ আইনের মাধ্যমে ভারতে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের অবসান ঘটিয়ে সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয়।[২৫]

এ আইন ছিল ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের প্রত্যক্ষ ফল। এ বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও এটি ভারতের ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থাতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটতে সক্ষম হয়। ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তার কার্যকারিতা ও সক্ষমতা অনেক আগেই হারিয়ে ফেলেছিল। ফলে, ব্রিটিশ সরকার উপলব্ধি করে ব্রিটিশ ভারতীয় সরকারের উপর সরাসরি বৃটিশ সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। এই প্রয়োজনীয়তা ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের পর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সরকার ইন্ডিয়া এ্যাক্ট ১৮৫৮ প্রনয়ন করে। এ আইনের মাধ্যমে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের পরিসম্পপ্তি ঘটিয়ে রাজ শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়। সপ্তদশ প্রকাশ করে দ্বিতীয়ার্ধে কোম্পানীর কর্মচারীরা সংকল্প প্রকাশ করে এদেশকে তাদের অধিনস্ত করার জন্য। আর যে প্রতিজ্ঞা পুরোপুরি সাফল্য অর্জন করে উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে এসে। এ সময়কালে মুঘল রাজশক্তির পতনের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় কোম্পানীর আধিপত্য ও সর্বশেষ ঘোষিত হয় ব্রিটিশ সার্বভৌমত্ব।

নিম্নে ১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইনের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য বা ধারাসমূহ আলোচনা করা হলো:

১. ব্রিটিশ রাজ কর্তৃক ভারতের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ: এই আইন দ্বারা ভারতে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের অবসান ঘটে এবং ভারত শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন মহারাণী ভিক্টোরিয়া। অর্থাৎ ভারত শাসন ক্ষমতা কোম্পানীর নিকট হতে ব্রিটিশ রাজের হাতে অর্পিত হয়।

২. ভারতীয় কাউন্সিল গঠন: এই আইন দ্বারা ভারত সংক্রান্ত বিষয়ে ভারত সচিবকে তথ্য ও পরামর্শ প্রদান করে সাহায্য করার জন্য ১৫ সদস্য বিশিষ্ট ভারতীয় কাউন্সিল গঠন করা হয়। এর মধ্যে পরিচালকমন্ডলী সভা ৭ জনকে নির্বাচন করবেন আর ব্রিটিশ রাজ কর্তৃক নিযুক্ত হবেন ৮ জন। এ কাউন্সিলের সভাপতি হবেন ভারত সচিব। ন্যূনপক্ষে ১০ বছর ভারতে বসবাস বা চাকরির অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত কেউ এ কাউন্সিলের সদস্য হতে পারবেন না। কোন মজুরি দান বা ভারতীয় রাজস্বের কোন অংশ বরাদ্দ দিতে হলে কাউন্সিলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সম্মতি প্রয়োজন হবে।

---

[২৫] এমাজউদ্দীন আহমদ, *রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা* (ঢাকা, ২০১০), পৃ. ৬০৯।

৩. ভারত সচিবের পদ সৃষ্টি: এই আইনের মাধ্যমে সর্বপ্রথম ভারত সচিবের পদ সৃষ্টি করা হয়। তিনি ভারত সরকারের যাবতীয় কার্যাদি পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা লাভ করবেন। ভারত সচিব হবেন ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ও ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের সদস্য। তিনি পার্লামেন্টের নিকট দায়বদ্ধ থাকবেন।

৪. সামরিক দায়িত্ব গ্রহণ: এই আইনের মাধ্যমে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর স্থল ও নৌবাহিনীর সৈন্যদের ব্রিটিশ রাজের নিকট অর্পণ করা হয়। এ বাহিনীর পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক হবেন ব্রিটিশ রাজ।

৫. বোর্ড অব কন্ট্রোল ও কোর্ট অব ডিরেক্টরস বিলোপ : এই আইনের মাধ্যমে বোর্ড অব কন্ট্রোল ও কোর্ট অভ ডিরেক্টরস বিলোপ করা হয়। উভয় পরিষদের ক্ষমতা অর্পণ করা হয় ভারত সচিব ও তার কাউন্সিলের নিকট।

৬. পার্লামেন্টারী আন্ডার সেক্রেটারীর পদ সৃষ্টি: ভারতসচিবকে আইন সংক্রান্ত বিষয়ে সহায়তা করতে একটি পার্লামেন্টারী আন্ডার সেক্রেটারী পদ সৃষ্টি করা হয়।

৭. ভারত সচিবের বিশেষ ক্ষমতা: এই আইনে বিধান করা হয় যে, ভারতীয় কাউন্সিলের সাথে পরামর্শ ব্যতীতই ভারত সচিব গভর্ণর জেনারেলের নিকট যুদ্ধ, শান্তি, অন্যান্য কিছু বিষয়ে গোপন বাণী ও নির্দেশ প্রদান এবং সরকারি দলিলাদি আদান-প্রদান করতে পারবেন।

৮. ভারত সচিব ও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সম্পর্ক: এই আইন দ্বারা ভারত সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিকট ন্যস্ত করা হয়। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট দায়িত্ব পালনে অযোগ্যতার অজুহাতে ভারত সচিবকে বরখাস্ত করতে পারবে।

৯. গভর্ণর জেনারেল সংক্রান্ত: একই ব্যক্তি ব্রিটিশ ভারতের ভাইসরয় ও গভর্ণর জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি হবেন ভারতে ব্রিটিশ রাজের প্রতিনিধি। ভারতীয় প্রদেশ সমূহের ক্ষেত্রে তিনি গভর্ণর জেনারেল এবং দেশীয় রাজ্যসমূহের ক্ষেত্রে ভাইসরয় হিসেবে সমাসীন থাকবেন। ভারত শাসনের সকল কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা স্বপরিষদ গভর্ণর জেনারেলের নিকট অর্পণ করা হয়। তিনি দায়ী থাকবেন ভারত সচিবের নিকট।

১০. ভারত সচিবের আর্থিক বিষয়ে সম্পর্কিত দায়িত্ব: সেক্রেটারী অব স্টেট ইন কাউন্সিলের ওপর ভারতের রাজস্ব ব্যয়ের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ভারতের রাজস্ব আয়-ব্যয় সম্পর্কে ভারত সচিব একটি বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে উপস্থাপন করবেন।

১১. সন্ধি ও চুক্তি সংক্রান্তঃ এ আইনে বলা হয়, ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক স্বাক্ষরিত সন্ধি ও চুক্তি মেনে নিতে ব্রিটিশ রাজ বাধ্য থাকবেন।

১২. রাজ ঘোষণাঃ রাজ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ভারতের শাসন প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণের বিষয়টি রাজফরমানের মাধ্যমে ভারতের রাজন্যবর্গ ও জনগণের অবগতির জন্যে ঘোষণা করা হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রাচ্যে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আগমনের প্রেক্ষাপট

এ অধ্যায়ের মূল উদ্দেশ্য প্রাচ্যে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আগমনের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করা। এজন্য এ অধ্যায়টি দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগে ইংরেজ ব্যতীত অন্যান্য ইউরোপীয় যথা-পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ফরাসি বণিকদের আগমনের প্রেক্ষাপট অনুসন্ধান করা হয়েছে। এ অধ্যায়টির দ্বিতীয় ভাগে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রাচ্যে আগমনের প্রেক্ষাপট বিচার করা হয়েছে। ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে একদেশীয় বণিক অন্যদেশীয় বণিকদের চেয়ে আগে বা পরে আসলেও তারা দীর্ঘ দিন যুগপৎভাবে বাণিজ্য পরিচালনা করেছে। তাই এ অধ্যায়টির অন্যতম সীমাবদ্ধতা হলো, তারিখ ও সালের অ-ধারাবাহিকতা।

৪.১ প্রাচ্যে অন্যান্য ইউরোপীয়দের আগমন

ইংরেজরা ছাড়াও ওলন্দাজ ও ফরাসি কোম্পানী বাংলায় কর্মরত ছিল যারা ব্যবসা বাণিজ্য এবং বাংলার রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ডেনমার্কের রাজকীয় কোম্পানীও (The Royal Company of Denmark) সে সময় বাংলায় কর্মরত ছিল, কিন্তু ড্যানিসদের বাণিজ্য এত গুরুত্বহীন ছিল যে তা উল্লেখ করার মত নয়। যদিও পর্তুগীজরাই সবার আগে বাংলায় আগমন করে কিন্তু তারা সপ্তদশ শতাব্দী শেষ হবার পূর্বেই তাদের শক্তি হারিয়ে ফেলে। ব্যবসা পরিচালনার জন্য কার্যকর কোনো ফ্যাক্টরি তাদের ছিল না। এ সময়ের পতুর্গীজরা হলো প্রধানত এদেশেরই সন্তান। তাই যে শক্তিশালী ও তেজস্বী পর্তুগীজরা এক সময় শক্তিশালী মুঘল সম্রাট শাহজাহানের মোকাবিলা করেছিল সেই তেজ এদের ছিল না।[১] এ সময় তারা মুগল সরকারের এবং ইউরোপীয় কোম্পানীগুলোতে চাকুরি করে জীবিকা নির্বাহ করত। ইংরেজরা তাদের সময় সৈন্য হিসাবে বা বন্দুকে আগুন লাগাবার কাজে নিয়োজিত করত এবং তাদের বেতন ছিল মাসিক পাঁচ টাকা, অথচ একাজে অন্যান্য ইউরোপীয় সৈন্যরা পেত দশ টাকা।[২]

নিম্নে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ফরাসি বণিকদের আগমন ও বাণিজ্য বিস্তার পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হলোঃ

---

[১] Abdul Karim, *Murshid Kuli Khan and his times*, Asiatic Socity of Pakistan, Dhaka, 1963, P.192.
[২] Abdul Karim, Ibid, P.192.

৪.১.১ পর্তুগিজ বণিকদের বাণিজ্য বিস্তার

প্রাচ্যে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য করার পূর্বের কাহিনী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এর পিছনে রয়েছে পর্তুগিজদের প্রাচ্যে লাভজনক বাণিজ্যিক কার্য প্রণালী স্থাপন। ইউরোপের অন্যান্য জাতিও পর্তুগীজদের এই লাভজনক বাণিজ্য করার সফল প্রচেষ্টা দেখে অগ্রসর হয়েছিল।

পর্তুগিজদের আগমনের মাধ্যমে বাংলায় ইউরোপীয় বণিকদের যাত্রা শুরু হয়। প্রাসঙ্গিকক্রমে উল্লেখ্য যে, এশিয়ায় প্রথম আগমনকারী ইউরোপীয় বণিকদল ছিল পর্তুগিজরা। পর্তুগিজরা প্রাচ্যের বাণিজ্যে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে সুদূর ইউরোপ থেকে ভারত তথা এশিয়া মহাদেশে আগমন করেছিল। অবশ্য প্রাচ্য খ্রিষ্টধর্মের প্রচার, জন প্রেস্টারের রাজ্য আবিস্কার, স্বর্ণের সন্ধান লাভ প্রভৃতি তাদের প্রাচ্যে আগমনকে ত্বরান্বিত করেছিল।[৩] প্রাচীনকাল থেকে এশিয়ার মসলা ও অন্যান্য মূল্যবান পণ্যসামগ্রী (মসলিন, সূতিবস্ত্র, লবণ, মরিচ ইত্যাদি) মধ্য এশিয়া ও পশ্চিম এশিয়া হয়ে ইউরোপে যেত। জেনোয়া, ভেনিস, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশীয় বণিকরা এ বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করত। তাদের মাধ্যমে প্রাচ্যের পণ্যসামগ্রী ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রেরিত হতো। একাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ক্রুসেডের প্রভাবে এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে উসমানীয় তুর্কিদের মধ্য প্রাচ্যে উত্থান ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে প্রাচীনকাল থেকে এশিয়ার সাথে ইউরোপে চলমান বাণিজ্য বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। কিন্তু এশিয়ার পণ্য ব্যবহারে ইউরোপীয়রা এমনভাবে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে তারা কোনভাবে এর ব্যবহার ভুলতে পারছিল না। তাছাড়া তারা এ বাণিজ্য থেকে প্রচুর মুনাফা অর্জন করত। এ প্রেক্ষিতে তারা মুসলমানদের এড়িয়ে বিকল্প পথে সরাসরি এশিয়া তথা প্রাচ্যে আগমনের চেষ্টায় লিপ্ত হয়। পর্তুগিজ নাবিক জোআঁ গণজালভেজ জারকো যথাক্রমে ১৪১৮ খ্রিস্টাব্দে সান্টো বন্দর এবং ১৪২০ খ্রিস্টাব্দে মাদাইরা দ্বীপপুঞ্জ অতিক্রম করে আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূল বরাবর অগ্রসর হতে থাকে। ১৪৩৭ খ্রিস্টাব্দে আজোরস এবং ১৪৪৪ খ্রিস্টাব্দে কেপভার্দ দ্বিপপুঞ্জপর্তুগীজদের দৃষ্টিগোচর হয়।[৪] তারা এখানে ক্ষান্ত না হয়ে আফ্রিকার আরও দক্ষিণ উপকূল বরাবর অগ্রসর হতে থাকে। আফ্রিকা মহাদেশ ঘুরে একদিন হয়ত ভারতবর্ষে পৌঁছা যাবে এই আশায় তারা ক্রমাগত অভিযান চালিয়ে একটু একটু করে আরও দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

---

[৩] ইমতিয়াজ আহমেদ, *দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় পর্তুগিজ বাণিজ্য*, ১৪৯৮-১৬৪১, বাংলা একাডেমি-২০০৮, পৃ. ৭০-৯৮

[৪] ইমতিয়াজ আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১

১৪৮৮ খ্রিস্টাব্দে বার্থোলোমিউ দিয়াজ নামে একজন পর্তুগিজ নাবিক আফ্রিকার সর্ব দক্ষিণ প্রান্তে পৌঁছাতে সক্ষম হন।[৫] এখানে পৌঁছে তিনি প্রচন্ড ঝড়ের সম্মুখিন হন এবং আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে উপনীত হন। নাবিকদের অনীহার কারণে সামনে আর অগ্রসর না হয়ে তিনি লিসবনে ফিরে আসেন। সে সময় ঝড়ের কবলে পতিত না হলে ও সহকর্মীদের চাপের মুখে দেশে প্রত্যাবর্তন না করলে ভারত আবিষ্কারের কৃতিত্ব তিনিই লাভ করতেন। পর্তুগীজ রাজা দ্বিতীয় জন (১৪৮১-১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দ) দিয়াজের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে ভারতবর্ষে অভিযান পাঠাতে আরও উৎসাহিত হন। ঐবছর রাজা দ্বিতীয় জন গনজালো-দা পাভিয়া এবং পেরো দ্য কোভিলহাম নামক দুইজন পর্তুগীজকে স্থল পথে ভারতের বাণিজ্য সম্পর্কে গোপনে বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য প্রেরণ করেন। তারা ভেনেসীয়দের জাহাজে চেপে ভূ-মধ্যেসাগর পার হয়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় এসে পৌঁছান। সেখান থেকে পাভিয়া ইথিওপিয়ার দিকে জন প্রেস্টারের রাজ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।[৬] আর কেভিলহাম আরবীয় পোষাক পরে আরবীয়দের জাহাজের চেপে কালিকট বন্দরে অভতরণ করেন।[৭] তার ঠিক দশ বছর পর পর্তুগালের নতুন রাজা ম্যানুয়েল ভাস্কো-দা-গামাকে ভারত অভিযানের দায়িত্ব দেন। তিনি ১৪৯৭ খ্রিস্টাব্দে ৮ই জুলাই তিনটি জাহাজ নিয়ে পর্তুগালের লিসবন বন্দর ত্যাগ করেন। ভাস্কো-দা-গামা সান গাব্রিয়েল নামক জাহাজে নেতৃত্ব দেন। উক্ত জাহাজগুলোতে অভিজ্ঞ নাবিকগণ ছাড়াও বিপুল সংখ্যক সৈন্য, অস্ত্রশস্ত্র, কম্পাস, অক্ষাংশ মাপার যন্ত্র, সূর্যের অবস্থিতি জানার জন্য পঞ্জিকা, পথ চলার সুবিধার জন্য তির্যক স্মরণী এবং প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পেশার লোক ছিল।[৮] পশ্চিম আফ্রিকার গিনি উপসাগরের প্রবল স্রোত পরিহার করার লক্ষে কেপভার্দ হতে সোজা দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগর হয়ে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তামাশা অন্তরীপ পেরিয়ে ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দের ২ মার্চ আফ্রিকার পূর্ব উপকূলীয় রাষ্ট্র মোজাম্বিকে পৌছেন। সেখান থেকে এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে কেনিয়ার মালিন্দি শহরে উপনিত হন।

মালিন্দির সুলতান গামাকে পথ দেখানোর জন্য আহমদ ইবনে মজিদ নামক একজন গুজরাটী নাবিককে সঙ্গে প্রেরণ করেন।[৯] আহমদ ইবনে মজিদের দেখানো পথে ক্রমাগত ২১ দিন জাহাজ

---

[৫] R.C. Majumdar, H.C. Raychaudhuri & Kalikinkar Datta, *An Advanced History of India* (London : Macmillan and Company Limited, 1963), p. 553.

[৬] ইমতিয়াজ আহমেদ, ইমতিয়াজ আহমেদ, *দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় পর্তুগিজ বাণিজ্য*, ১৪৯৮-১৬৪১, বাংলা একাডেমি-২০০৮, পৃ. ১০২।

[৭] সত্যেন সেন, *মসলার যুদ্ধ* (ঢাকা: মুক্তধারা, ২০০৩), পৃ. ১০-১১।

[৮] ইমতিয়াজ আহমেদ, প্রাগুক্ত,পৃ. ১০৩।

[৯] Martin David Eaton, *Portugal*, *Microsoft Encarta*, DVD, Version, 2009

চালনা করে ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দের ২০ মে মাসে ভারতের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তস্থিত মালাবার উপকূলের কালিকট বন্দরে অবতরণ করেন।[১০] ইউরোপীয়দের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম আফ্রিকা মহাদেশ অতিক্রম করে ভারতবর্ষের মাটিতে পদার্পন করেন। ইন্দো-ইউরোপীয় যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত তৈরি হয়। পর্তুগিজরা কালিকট বন্দরে অবতরণ করলে সেখানে অবস্থানরত মুসলিম বণিকদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে ভাস্কো দা-গামা আত্মরক্ষার জন্য পার্শ্ববর্তী শহরে আশ্রয় নেন। সেখান থেকে মসলাসহ বিভিন্ন প্রকার পণ্য-সামগ্রী নিয়ে লিসবনে ফিরে যান। সেই যাত্রায় প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হলেও লাভের পরিমাণ দাড়ায় ষাট গুণ।[১১] শতাব্দীর প্রথম ভাগে পর্তুগিজরা আফ্রিকার উপকূল ঘুরে নিয়মিতভাবে প্রাচ্যের দেশগুলোতে যাতায়াত করত এবং বিভিন্ন প্রকার মসলা, রেশমী বস্ত্র, মূল্যবান পাথর, হাতির দাঁত ইত্যাদি পণ্য-সামগ্রী নিয়ে দেশে ফিরত। ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে ৯ মার্চ প্রেড্রো অ্যালভারেজ কাব্রাল নামক জৈনক পর্তুগীজ নাবিক লিসবন থেকে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে কালিকট বন্দরে আগমন করেন এবং সেখানে একটি বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করেন।[১২] কালিকট বন্দরে পর্তুগিজরা আরবীয় বণিকদের বিরোধিতার সম্মুখিন হয় এবং জ্যামোরিনও তাদের প্রতি বিরুপ হয়ে উঠেন। তাতে ১৫০৪ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, পর্তুগিজরা ভারতের বিভিন্ন ভূখণ্ড আবিষ্কারের চেষ্টা না করে শুধু ব্যবসার নিরাপত্তার খাতিরে যেখানে প্রয়োজন সেখানে দূর্গ নির্মাণ করবে। তবে মালাবার উপকূলে যত বড় সম্ভব একটি নৌবাহিনী নিযুক্ত করবে এবং ভারতে তিন বছর মেয়াদী একজন শাসনকর্তা পাঠাবে।[১৩] ভারতে পর্তুগিজদের স্বার্থরক্ষা ও বাণিজ্যিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য নিয়মিতভাবে পর্তুগিজ গর্ভনর বা শাসনকর্তা ভারতে আসতে শুরু করে।

১৫০৫ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সিস্কো আলমিডাকে ভাইসরয় উপাধি দিয়ে প্রথম শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। আলমিডাকে ভারতের শাসনকর্তা ভাইসরয় উপাধি দিয়ে প্রথম শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। আলমিডা ভারতের শাসনকতা হিসেবে আগমনের পর ব্যবসায়িক নিরাপত্তার খাতিরে কানানোরসহ কয়েকটি স্থানে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করেন। পর্তুগিজ নির্মিত দূর্গগুলোর মাধ্যমে ভারতে উপকূলীয় অঞ্চলে তাদের বাণিজ্যক স্বার্থরক্ষা এবং স্থানীয় শক্তির উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়। আলমিডার নৌবহর কালিকটের স্থানীয় রাজা জ্যামরিনের নৌবহরকে ধ্বংস করে। মিশরের সুলতান আরব

---

[১০] Michael Edwardes, The Battle of Plassey and the conquest of Bengal, Macmillan, 1963, p.131.

[১১] আবদুল হালিম ও নূরুন নাহার বেগম, মানুষের ইতিহাস, মধ্যযুগ, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯১, পৃ. ৩৪।

[১২] R.C. Majumdar, H.C. Raychaudhuri & Kalikinkar Datta, *An Advanced History of India* (London : Macmillan and Company Limited, 1963), p. 553^{c}-533^{D}.

[১৩] মুহাম্মদ ইনাম-উল হক, *ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাস*, ৭১২ খ্রিস্টাব্দ-১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২৮৫।

বণিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য একটি নৌবহর পাঠালে পর্তুগিজ সেনাপতি আলমিডা আরব সাগরে দিউর যুদ্ধে সেটিও ধ্বংস করেন।[১৪]

এভাবে আলমিডা আরব সাগর ও ভারত মহাসাগরে পর্তুগিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। আলমিডার পর ১৫০৯ খ্রিস্টাব্দে আফন্সো আলবুকার্ক পর্তুগিজদের শাসনকর্তা হিসেবে ভারতে আগমন করেন। আলবুকার্কের ঘটনা বহুল কার্যকালে পর্তুগিজরা ভারতে ক্ষমতার সর্বোচ্চ সীমায় উপনীত হয়।[১৫] ভারতে আলবুকার্কের লক্ষ ছিল প্রথমত; ভারত মহাসাগরে পর্তুগিজ নৌশক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা। এই লক্ষ পূরণের জন্য তিনি গভীর কুটনৈতিক সম্পর্ক ও যুদ্ধ উভয় পন্থা অবলম্বন করেন। পর্তুগাল ছিল সীমানায় ও জনসংখ্যায় অতি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র এবং ভারতে উপনিবেশ স্থাপনের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক সৈন্য পাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই আলবুকার্ক পর্তুগিজ বণিক ও সৈন্যদেরকে ভারতীয় নারী বিবাহ করে পর্তুগিজ বংশ বিস্তারের জন্য উৎসাহ দেন। আলবুকার্ক তার উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষে মালাবার উপকূলের কালিকট বন্দরে আগমন করেন। কিন্তু সেখানে তিনি ব্যর্থ হন। তারপর ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে আলবুকার্ক আরব সাগরের উপকূলে বিজাপুর রাজ্যের অন্তর্গত গোয়া বন্দরের দিকে দৃষ্টি দেন। তুলার্জী নামে গোয়ার এক হিন্দু প্রধানের সাহায্যে বিনা যুদ্ধেই আলবুকার্ক গোয়া অধিকার করেন।[১৬] গোয়া ভারতে পর্তুগিজদের শক্তির প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও চীনের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য আলবুকার্ক মালাক্কা অঞ্চল দখলের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং আরব বণিকদের তীব্র বাধা ঠেলে ১৫১১ খ্রিস্টাব্দে মালাক্কা দখল করেন।

বাংলায় ইউরোপীয় বণিকদের আগমন দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে পর্তুগিজরা সর্বপ্রথম বাংলায় আগমন করে ১৫১৬ খ্রিস্টাব্দে।[১৭] তবে ড. আবদুল করিম বলেন, পর্তুগিজগণ ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ষোড়শ শতাব্দীর সূচনালগ্নে ঢাকায় রাজধানী স্থাপনের পূর্বেই বাংলায় আসে।[১৮] পর্তুগিজদের বাংলায় আগমনের উদ্দেশ্য ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। ভারতের পশ্চিম উপকূলের গোয়া ছিল তাদের প্রধান ঘাঁটি। সেখান থেকে মৌসুমী বাতাসের সাহায্য নিয়ে বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করত।[১৯] প্রথমে তারা প্রতি বছর বাংলায় আসত এবং ব্যবসায়ীক সময় উত্তীর্ণ হলে আবার দেশে ফিরে যেত। কিন্তু বাংলার ব্যবসায় তাদের

---

[১৪] প্রভাতাংশু মাইতি, *ভারত ইতিহাস পরিক্রমা*, ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ-১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ (কলিকাতা : শ্রীধর প্রকাশনী, ১৯৯৫) পৃ. ৭৩।

[১৫] Michael Edwardes, *The Battle of Plassey and the conquest of Bengal, Macmillan*, 1963, p. 132.

[১৬] সত্যেন সেন, *মসলার যুদ্ধ* (ঢাকা: মুক্তধারা, ২০০৩), পৃ. ৩৯।

[১৭] এম এ রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ২০১১) পৃ. ৩৩৬।

[১৮] আবদুল করিম, মোগল রাজধানী ঢাকা, পৃ. ৫৭।

[১৯] এম এ রহিম ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৬।

অত্যাধিক লাভ হওয়ার কারণে তারা সাতগাঁও অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। বাংলার স্থানীয় জমিদার ও শাসকবর্গও পর্তুগিজদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য উভয় পক্ষের জন্যই লাভজনক মনে করে তাদের সাথে সদয় ব্যবহার করেন।

বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে ভাস্কো-দা-গামা প্রথম তার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তারপর আলবুকার্ক ভারতের গোয়ায় পর্তুগিজ গভর্ণরের দায়িত্ব পালনকালে তিনি তার সরকারের কাছে ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তারের জন্য সুপারিশ পাঠান।[২০] ভাস্কো-দা-গামা ও আলবুকার্কের সুপারিশ অনুযায়ী পর্তুগিজ রাজা ম্যানুয়েল বাংলার সাথে সরাসরি বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দে এনডেভারের নেতৃত্বে চারটি জাহাজ প্রেরণ করেন। কিন্তু জাহাজগুলো নিয়ে এনডেভারের পক্ষে বাংলায় পৌঁছা সম্ভব হয়নি। তবে তার প্রতিনিধি জোঁ-আ-কোয়েল হো আরবীয় জাহাজে করে চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছেন এবং স্থানীয় শাসনকর্তার কাছে বাণিজ্যিক সুবিধা প্রার্থনা করেন। কিন্তু তিনি কোনভাবেই উক্ত সুবিধা আদায় করতে পারেননি। কারণ ভারতের পশ্চিম উপকূলে ভাস্কো-দা-গামার অত্যাচারের কাহিনী বাংলা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। পরবর্তীতে ১৫১৮ খ্রিস্টাব্দে যথাক্রমে জো আঁ দে সিলভেইরা এবং রুই ভাজ পেরেরার নেতৃত্বে বাংলায় বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের চেষ্টা করা হয়।[২১] কিন্তু সেখানেও তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তবে আকস্মিকভাবে বাংলার রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনে তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটে। বাংলার সুলতানী আমলের শেষ পর্যয়ে ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে পাঠান নেতা শের খানের আক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বাংলার সুলতান মাহমুদ শাহ পর্তুগিজদের সাহায্য প্রার্থী হন।[২২] সুলতান মাহমুদ শাহের আমন্ত্রণে পর্তুগিজ সৈন্যরা তেলিয়াগড় দূর্গ ও পাণ্ডুয়া অঞ্চল শের খানের দখল থেকে রক্ষা করে।

পর্তুগিজরা প্রথমে সাতগাঁওয়ে কুঠি স্থাপন করে ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করে। সে সময় তারা হুগলিতে অস্থায়ীভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করত। সরস্বতী নদীর গতি পবির্তনের ফলে সাতগাঁও বন্দরে জাহাজ চলাচলে অসুবিধার সৃষ্টি হলে তারা হুগলি বন্দরের দিকেই অধিক মনোনিবেশ করে। ক্রমান্বয়ে হুগলি বন্দর বাংলার বৈদেশিক বাণিজ্যের একটি বড় কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ঐতিহাসিক আবদুল করিমের মতে, ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবর ভাগীরথীর তীরে হুগলি নামক একটি নগন্য গ্রামে

---

[২০] ইমতিয়াজ আহমেদ, *বাংলায় পর্তুগিজদের ইতিহাস*, রাজশাহী: ইউরেকা বুকস্, ২০০৯, ১৫৩৮-১৬৩২, পৃ. ২০।

[২১] Sir Jadunaathk Sarkar, ed., *The History of Bengal*, Voi-11, Muslim Perid, 1200-1757 (Dacca : The University of Dacca, 2006), pp. 352-354.

[২২] এম এ রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, (ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ২০১১), পৃ. ৩৩৬।

পর্তুগিজদেরকে স্থায়ীভাবে বসতি ও কুঠি নির্মাণের অনুমতি প্রদান করেন।[২৩] হুগুলিতে পর্তুগিজদের বাণিজ্য কুঠি নির্মাণের ফলে ক্রমেই হুগলি একটি সমৃদ্ধ শহর ও বাংলায় পর্তুগিজ বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র করে উঠে।[২৪] তাছাড়া বাংলার হিজলী, শ্রীপুর, ঢাকা, যশোর, বরিশাল ও নোয়াখালী জেলার পর্তুগিজদের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। ষোড়শ শতাব্দীর শেষে চট্টগ্রাম ও ডিয়াঙ্গা এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে সন্দ্বীপ, দক্ষিণ শাহবাজপুর প্রভৃতি জায়গা পর্তুগিজদের অধিভুক্ত হয়।

কিন্তু বাংলায় পর্তুগিজদের প্রভাব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। শাহজাহান যুবরাজ হিসেবে সম্রাটের বিরুদ্ধে যখন বিদ্রোহী হয়ে বাংলায় আশ্রয়লাভ করে পর্তুগিজরা তখন তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। তারা রণপোত, কামান, বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুবরাজ শাহজাহানের পক্ষে যোগদান করে এলাহাবাদ পর্যন্ত যায়। কিন্তু পরে শাহজাহান যখন সম্রাটের সেনাপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধের চুড়ান্ত প্রস্তুতি নেন ঠিক ঐ সময় তারা তাঁর পক্ষ ত্যাগ করে টংক নদীর তীর থেকে রাতের অন্ধকারে কাউকে কিছু না বলে হুগলীতে ফিরে যায়।[২৫] ফিরতি পথে পর্তুগিজরা সম্রাটের দুইজন বাঁদীকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। টংকের যুদ্ধে শাহজাহান পরাজিত হয়ে বাংলা ছেড়ে যেতে বাধ্য হন।

তাছাড়া সম্রাট শাহজাহানের সিংহাসনে আরোহনের প্রাক্কালে চট্টগ্রামের পর্তুগিজ জলদস্যুরা মেঘনার অববাহিকায় আক্রমণ করে মোগল এলাকায় ব্যাপক লুটতরাজ করে এবং মোগল অভিজাত মহিলাদের অপহরণ করে নিয়ে যায়। এমন ঘটনার প্রেক্ষিতে বাংলার সুবাদার কাসিম খান জুয়ুনীকে হুগলি আক্রমণ করে পর্তুগিজদের বহিষ্কারের আদেশ দেন। ১৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার সুবাদার কাশিম খান পর্তুগিজদের হুগলি বন্দর অধিকার করলে পর্তুগিজরা হুগলি থেকে বিতাড়িত হয়।[২৬] হুগলি বন্দর পতনের সাথে সাথে বাংলায় পর্তুগিজ শক্তির প্রাধান্য শেষ হয়।[২৭] পর্তুগিজরা হুগলি থেকে বিতাড়িত হওয়ায় ফলে বাংলায় তাদের ব্যবসা বাণিজ্য হ্রাস পায় এবং মোগল সাম্রাজ্য ভীষণ আর্থিক ক্ষয় ক্ষতির সম্মুখিন হয়। পরের বছর ১৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজরা আবার হুগলিতে ফিরে আসে। সম্রাট তাদেরকে একটি ফরমানের মাধ্যমে বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও স্বীয় ধর্ম পালনের অধিকার প্রদান করেন। পর্তুগিজদের স্বাধীন ভাবে ব্যবসা বাণিজ্যের অনুমতি দিলেও তারা আর পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেতে পারেনি।

---

[২৩] আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস*, মুসলিম বিজয় থেকে সিপাহী বিপ্লব পর্যন্ত, ১২০০-১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১৫৯।

[২৪] রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, মধ্যযুগ ২য় খণ্ড, দিব্য প্রকাশ, ১ম প্রকাশনা, ২০১৭ পৃ. ১৫৫।

[২৫] রমেশ চন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫।

[২৬] Michael Edwardes, *The Battle of Plassey and the conquest of Bengal, Macmillan*, 1963, p. 132.

[২৭] রমেশ চন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬।

পর্তুগিজরা বাংলায় নানাবিধ পণ্যসামগ্রী আমদানি রপ্তানি করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করত। ১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার রপ্তানি বাণিজ্য প্রায় পর্তুগিজদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হতো। বাংলা থেকে তারা চাল, তেল, ঘি, সুতি কাপড়, রেশমী কাপড়, এ দেশের উপকরণে তাদের তৈরি বিভিন্ন প্রকার মিষ্টান্ন-সামগ্রী প্রভৃতি পণ্যসামগ্রী রপ্তানি করত। তখন বাংলার পন্যসামগ্রীর মূল্য খুব কম ছিল। ফলে এদেশের পণ্যসামগ্রী বিদেশে রপ্তানি করে তারা প্রচুর মুনাফা অর্জন করে। কিন্তু পর্তুগিজদের পূর্বের সে একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিদ্বন্দ্বি হয়ে দাঁড়ায় ওলন্দাজ ও ইংরেজরা। ট্যার্ভানিয়ার বলেন, ওলন্দাজরা এ সময় বাংলায় না এলে পর্তুগিজ কুঠিগুলো সোনা-রূপা দিয়ে মোড়ান যেত।[২৮] পর্তুগীজদের সে লাভজনক ব্যবসায় ইংরেজ ও ওলন্দাজদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, তাদের নৈতিক চরিত্রের অধপতন, জোরপূর্বক এদেশীয়দের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিতকরণ প্রভৃতি কারণে বাংলায় তাদের পতন ঘটে।

৪.১.২ ওলন্দাজ বণিকদের বাণিজ্য বিস্তার

পর্তুগিজদের পর ওলন্দাজরা বাংলায় আগমণ করে। ১৫৮০ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ পর্তুগালের লিসবন বন্দর ওলন্দাজ ব্যবসায়ীদের জন্য বন্ধ করে দেন। ওলন্দাজ লবণ, মরিচ, মসলাসহ প্রাচ্যের বিভিন্ন পণ্য-সামগ্রী পর্তুগালের লিসবন বন্দর থেকে সংগ্রহ করে ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় চালান দিত। লিসবন বন্দর বন্ধ হয়ে গেলে ওলন্দাজ ব্যবসায় বিপুল ক্ষতি হয়। বাধ্য হয়ে ওলন্দাজরা লিসবন বন্দর ত্যাগ করে প্রাচ্য বাণিজ্যে সরাসরি অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। এ অবস্থায় মসলার সন্ধানে ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে হুটম্যানের অধীনে চারটি জাহাজ ও আড়াই বছর পর তারা স্বদেশে ফিরে। ঐ অভিযানে ওলন্দাজদের অনেক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখিন হতে হয়। ২৫৯ জন লোকের মধ্যে মাত্র ৮৯ জন লোক জীবিত থাকে। তারপরেও উক্ত অভিযানে তাদের অনেক লাভ হয়।[২৯] এতে ওলন্দাজ ব্যবসায়ীরা আরও উল্লসিত হয়ে ২০ মার্চ ১৬০২ খ্রিস্টাব্দে ৭৬টি কোম্পানীর সমন্বয়ে ‘দি ডাচ ইউনাইটেড ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী’ (Verenigde Oost-Indische Company বা VOC) গঠন করে।[৩০]

ওলন্দাজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হবার পর প্রাচ্যে ওলন্দাজ বাণিজ্য একটি বৃহৎ জাতীয় উদ্যোগের রূপ নেয়। ১৬০২ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে ওলন্দাজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রাচ্যের উদ্দেশ্যে

---

[২৮] আরেফিন বেগম, *পর্যটকদের দৃষ্টিতে বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা*, ১২০৪-১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ, এম.ফিল. থিসিস, অপ্রকাশিত, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদালয়, ২০০৩, পৃ. ১৫২।

[২৯] সত্যেন সেন, *মসলার যুদ্ধ* (ঢাকা: মুক্তধারা, ২০০৩), পৃ. ৫৩।

[৩০] C.R. Boxer, *The Dutch Seaborne Empire, 1600-1800* (London: Hutchinson & Co. Ltd. 1966), p. 24.

যাত্রা শুরু করে। এক বছর পর ওলন্দাজ বণিকরা কালিকট বন্দরে উপস্থিত হয়। সে সময় পর্তুগিজদের অত্যাচারে কালিকটের স্থানীয় রাজা অস্থির ছিলেন। তিনি পতুর্গিজদের ব্যবহার ও কর্মকান্ডে বিরক্ত হয়ে তাদের বিতাড়নের উপায় খুঁজছিলেন। এমতাবস্থায় ওলন্দাজদের আগমনে জ্যামোরিন খুশি হন এবং তাদেরকে বাণিজ্যিক সুবিধা ও ঘাঁটি নির্মাণের অনুমতি দেন। কিন্তু ওলন্দাজরা কালিকটের চেয়ে মসলা-দ্বীপপুঞ্জেই বেশি সুবিধা মনে করে বান্টামে চলে যায়। ১৬১৯ খ্রিস্টাব্দে তারা বাটাভিয়াতে প্রাচ্যের বাণিজ্যিক সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠা করে।[৩১] ১৬২০-১৬৫০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে মসলা দ্বীপের অধিবাসীদের তারা সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করে। এতদঞ্চলে আগমন করে ইউরোপীয় অন্যান্য কোম্পানীর উপর নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করে মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যে মসলা দ্বীপপুঞ্জের প্রায় সবগুলো এলাকা থেকে তারা পর্তুগিজদের বিতাড়িত করে।[৩২] সে সময় মালয় দীপপুঞ্জে গুজরাট ও করমণ্ডলে পণ্য-সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় ওলন্দাজরা ভারতের দিকে অগ্রসর হয়।

১৬১৮ খ্রিষ্টাব্দে ওলন্দাজ কোম্পানী ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছে থেকে একটি ফরমান লাভ করে সুরাটে একটি ফ্যাক্টরি স্থাপন করে।[৩৩] সেখান থেকে ১৬২৭ খ্রিস্টাব্দে ওলন্দাজরা বাংলার ব্যবসায় আকৃষ্ট হয় এবং করোমন্ডলের গভর্ণর কর্তৃক বাংলায় প্রেরিত একদল বণিক পিপলিতে একটি বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করে।[৩৪] কিন্তু কিছু দিন পরে তারা পিপলি ত্যাগ করে বালেশ্বরে যায়। সেখান থেকে চুঁচুড়ায় কুঠি স্থাপনের পর বাংলায় ওলন্দাজদের বাণিজ্যিক প্রসার ঘটে। চট্টগ্রাম পর্যন্ত ওলন্দাজদের ব্যবসার বিস্তার ঘটে। বাংলায় আগত ওলন্দাজদের সমসাময়িক ইউরোপীয় অপর বণিকগোষ্ঠী ছিল ইংরেজ বণিকগোষ্ঠী।

ওলন্দাজরা ভারতীয় বাণিজ্যে ইংরেজদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। তারা ছিল অগ্রগামী এবং ইংরেজরা তাদের অনুকরণ করত মাত্র।[৩৫] ইংরেজদের তুলনায় তাদের বৈদেশিক বাণিজ্য ছিল অনেক প্রসারিত। সমসাময়িক লেখকদের মতে তারা ইতোমধ্যে সারাবিশ্বের মালামাল বহনকারী হিসাবে খ্যাতি অর্জন

---

[৩১] William Wilson Hunter, *History of British India, Vol-2*(London: Longmans Green & Co., 1899), p.347.

[৩২] জহর সেন, *দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস, মালই-ইন্দোনেশিয়া* (কলিকাতাঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৯৬), পৃ. ৮১।

[৩৩] মুহাম্মদ ইনাম-উল হক, *ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাস শাসনের ইতিহাস, ৭১২ খ্রিস্টাব্দ-১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দ* (ঢাকাঃ জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০৬), পৃ. ১০৭।

[৩৪] H. H. Dodwell, ed., *The Cambridge History of India, Vol-v, British India, 1497-1858),* Delhi: s. Chand & Co.,nd), p.40-41

[৩৫] L.S.S. Omalley, *History* of *Bengal, Bihar and Orissa under British Rule*. Callcutta, Bengal Seoritariat book depot. P. 18

করে এবং লন্ডনে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানীর তুলনায় এটি ছিল অনেক বেশি সম্পদশালী ও শক্তিধর। এর মূলধন শুধু অনেকগুণ বেশিই ছিল না বরং এটি ওলন্দাজ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতাও লাভ করত। প্রকৃতপক্ষে, এটি ছিল একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এবং নামে মাত্র একটি প্রাইভেট কোম্পানী। অপরদিকে ইংলিশ কোম্পানী সরকারের অবাধ-বাণিজ্য নীতিতে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এর ক্ষমতাও ছিল অনেক ব্যাপক, কারণ এটি যুক্ত নেদারল্যাণ্ড ও তার সরকারের পক্ষে যে কোনো চুক্তিতে উপনীত হতে পারত, দুর্গ নির্মাণ এবং গভর্ণর নিয়োগ করতেও পারত। তাদের ব্যবসায় উন্নত জায়গা দখল বা অসম বাণিজ্যের চাইতে চুক্তির উপরই অধিক নির্ভরশীল ছিল।[৩৬]

ওলন্দাজ জাহাজসমূহ সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বত্র বিচরণ করলেও ওলন্দাজ ইউনাইটেড ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী (The Dutch United East India Company) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৬৫০ সালের মার্চ মাসে।[৩৭] ভারতে তারা তাদের কুঠি স্থাপন করে সুরাটে ও মালাবার উপকূলে (Coromendal Coast)।[৩৮] ১৬১৬ সালে ভ্যান ডেন ব্রুক Van Den Brook-এর অধীনে একটি ওলন্দাজ জাহাজ উপকূলীয় নোঙ্গরস্থলে আগমন করলে তাকে কোনো কুঠি স্থাপন করতে দেয়া হয়নি। পরের বছর দু'টি ওলন্দাজ জাহাজ উপকূলের অদূরে বিধ্বস্ত হয় এবং তাদের উদ্ধারকৃত দশজন নাবিক সুরাটেই থেকে যায়। ১৬১৮ সালে তারা ব্যবসা করার জন্য মুঘল সরকার থেকে অনুমতি লাভ করে যদিও স্যার থমাস রো তাদের বের করে দেবার জন্য অনেক চেষ্টা তদবির করেন; ১৬২০ সালে ভ্যান ডেন ব্রুক ওলন্দাজ ব্যবসার পরিচালক হিসাবে সুরাট ফিরে আসেন।[৩৯] কিন্তু বার্বার দ্বীপের প্রধানদের সঙ্গে পরিচিত ওলন্দাজরা বুঝতে পারেনি যে তারা এমন একটি সাম্রাজ্যের আওতায় এসেছে যারা সৎ ব্যবহারের উপর জোর দিয়ে থাকে এবং ক্ষুদ্র কাফের বসতিসমূহ এক কলমের খোঁচার ধ্বংস করে দিতে পারে।[৪০] আরেক বর্ণনামতে ১৬১৮ সালে সম্রাট জাহাঙ্গীর থেকে একটি ফরমান লাভের পর ওলন্দাজগণ সুরাটে একটি ফ্যাক্টরি স্থাপন করে। ১৬২১ সালে ভ্যান ডেন ব্রুক তার পরিচালক হন এবং ওলন্দাজদের প্রকাশ্য শত্রু বাংলার পর্তুগীজদের সঙ্গে

---

[৩৬] L.S.S. Omalley, *History* of *Bengal, Bihar and Orissa under British Rule*. Callcutta, Bengal Seoritariat book depot. P.18

[৩৭] H.H. Dodwell, *The Cambridge History of India*, Vol. V (Cambridge, 1920), p. 30

[৩৮] William Wilson Hunter, *History British India,*V-II, London: Longsmans Green and Company, 1899, p. 65

[৩৯] William Wilson Hunter, Ibid, p. 65

[৪০] William Wilson Hunter, Ibid, p. 65

ব্যবসা আরম্ভ করেন।[৪১] অন্য সূত্র অনুযায়ী, ১৬২১ সালের আগে থেকেই ওলন্দাজ ব্যবসা বাটাভিয়ায় অবস্থিত একজন গভর্ণর জেনারেল ও কাউন্সিল দ্বারা পরিচালিত হতো; একাজে তাদের স্থানীয় জ্ঞানী এবং ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করে, অপরদিকে ইংলিশ কোম্পানী তখনও সুদূর লন্ডন থেকে নিয়ন্ত্রিত হত। সেই ১৬৩৪ সালে ঈর্ষার সঙ্গে অভিযোগ করা হয় যে ওলন্দাজরা কখনও অলস নয়। কখনও তারা এক বন্দর থেকে আরেক বন্দরে ব্যবসা করে থাকে আর অন্য সময় তারা যোদ্ধা হিসেবে নিযুক্ত থাকে, অথচ সে সময় ইংরেজরা মুঘল সরকারের নিকট থেকে আরও সুযোগ-সুবিধা সংবলিত বাণিজ্যক সুবিধা আদায়ের চিন্তায় নিমগ্ন।

ওলন্দাজদের পরিকল্পনায় শুধু ভারতীয় বাণিজ্যই অন্তর্ভূক্ত ছিল না, তাদের প্রধান আকর্ষণ ছিল পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ব্যবসা। সেখানে তারা মসলার ব্যবসায় একচেটিয়া সুবিধা ভোগ করতে চায়। মসলার মধ্যে ছিল দারুচিনি, জায়ফল, মরিচ এবং সর্বোপরি লবঙ্গ। ইউরোপের বাজারে এগুলোর চাহিদা ছিল প্রচুর, কারণ সেযুগের খাদ্য তালিকা অনুযায়ী সবুজ শাকসবজি ও অন্যান্য তরকারি ইউরোপে দুষ্প্রাপ্য ছিল। ওলন্দাজদের ছোট ছোট জাহাজ এবং পর্তুগীজদের চাইতে উত্তম নাবিক বিদ্যার দরুন তারা পূর্ব সমুদ্রের কর্তৃত্ব দখল করে নেয়। বাটাভিয়ার সরকার গঠন করে তারা সুদূর চীন ও জাপান পর্যন্ত তাদের ব্যবসা সম্প্রসারিত করে। ১৬২৩ সালে আম্বয়না (Amboyna) নামক স্থানে ইংরেজ কোম্পানীর বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ী নিহত হবার পর তারা দূর প্রাচ্যের বাণিজ্যে সংঘর্ষ ত্যাগ করে ভারতে মনোনিবেশ করে। তবে এখানেও তাদের অনেকদিন পর্যন্ত ওলন্দাজদের সঙ্গে সংঘর্ষ চালিয়ে যেতে হয়।[৪২]

১৬২৭ সালে মালাবারের ওলন্দাজ গভর্ণর বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য তাঁর কয়েকজন প্রতিনিধিকে বাংলায় প্রেরণ করেন। প্রথম দিকে এই নতুন জায়গার ব্যবসা মালাবার থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কিন্তু ক্রমশ এই বাণিজ্য কেন্দ্রের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেলে ১৬৫৫ সালে একে বাটাভিয়ার নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা হয় এবং বাংলার অধিদপ্তর (Directorate of Bengal) হিসাবে একে পৃথকভাবে কাজ চালিয়ে যেতে দেয়া হয়। পিপলি নামক যেস্থানে ওলন্দাজরা প্রথমে তাদের কুঠি স্থাপন করেছিল তা ত্যাগ করে তারা বালেশ্বরে গিয়ে ওঠে।[৪৩] স্টুয়ার্টের মতে, ওলন্দাজদের আগমনের সঠিক সময় নির্ণয় করা না গেলেও

---

[৪১] Anjali Chatterjee, *Bengal in the Reign of Aurangzib*, 1658-1707, Calcutta: Prograssive Publishers, 37, College street, 1967, p.188

[৪২] Anjali Chatterjee, Ibid, p. 19, 20

[৪৩] Charles Robert Wilson, *The Early Annals of the English in Bengal (V-I) Asiatic Society*, 1963, The university of California. P. 302

এই জাতীয় প্রতিনিধিগণ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে স্থান লাভ করে। বর্তমান চুঁচুঁড়া, চন্দননগর ও সেরামপুরস্থ নামক স্থানে হুগলীর কিছু নিচে তারা তাদের কুঠি স্থাপন করে।[৪৪]

বাংলায় ওলন্দাজদের ব্যবসা উপকূলীয় অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকে আর অধিকাংশ আন্তর্জাতিক ব্যবসা ছিল হুগলি থেকে বহিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত পর্তুগীজদের হাতে। এই সুযোগে ওলন্দাজরা দেশের অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করে। তারা হুগলিতে একটি বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন করে, কিন্তু মুঘল কর্তৃপক্ষের করারোপের ফলে তারা তাদের মূলকেন্দ্র পিপলিতে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। ১৬৪৫ থেকে ১৬৫০ সালের মধ্যে তারা হুগলির শহরতলি চুঁচুঁড়ায় তাদের দ্বিতীয় এবং সফল প্রচেষ্টা চালায়। এটিকে বউরি (Bowry) এশিয়ার সর্ববৃহৎ এবং একটি পূর্ণাঙ্গ ফ্যাক্টরি হিসাবে অভিহিত করেছেন। আরেকটি ফ্যাক্টরি তারা পাটনায় প্রতিষ্ঠা করে আর তারপর তাদের ব্যবসা অতি দ্রুত বিস্তার লাভ করে। ওলন্দাজদের ব্যবসা চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। সেখান থেকে তারা ক্রীতদাস এবং চাউল রপ্তানি করে। বাটাভিয়ায় এসব ক্রীতাদাসের প্রচুর চাহিদা ছিল।[৪৫]

১৬৫৩ সালে ওলন্দাজরা হুগলি নদীর উপরিবাগে অবস্থিত চুঁচুঁড়ায় তাদের শক্তিশালী ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করার পর বালেশ্বরকে তারা হাতে রাখে শুধু জাহাজের সুবিধার জন্য। চুঁচুঁড়া, কাশিম বাজার ও পাটনা অবশ্য অত্যন্ত উন্নয়নশীল ও লাভজনক ব্যবসাকেন্দ্রে পরিণত হয়। ওলন্দাজরা কর্ণাটকে যে অবাধ বাণিজ্যের সুবিধা ও স্বাধীনতা লাভ করেছিল তা এখানে না পেলেও বাংলার নবাব তাদের যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। নবাবের কাছ থেকে তারা চুঁচুঁড়া ও বরানগর গ্রাম দুইটি অনেকটা "স্থায়ী জায়গির" হিসাবেই ভোগ করত।[৪৬] সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ ওলন্দাজরা কাশিম বাজার, পাটনা, ঢাকা, মালদা, বালেশ্বর ও চুঁচুঁড়ায় তাদের ফ্যাক্টরি স্থাপন করে।[৪৭] আওরঙ্গজেবের শাসনকালে ওলন্দাজরা তাঁর কাছ থেকে ব্যবসার জন্য ফরমান লাভ করে। ১৬৬২ সালে সুরাটের ডাইরেক্টর ডার্ক ভ্যান এডারিচাম (Dirk Van Adricham) সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ফলে বাংলাবিহার ও উড়িষ্যায় ব্যবসা করার জন্য একটি ফরমান জারি হয়, বিনিময়ে তাদেরকে যে কোনো একটি বন্দরে

---

[৪৪] L.S.S. Omalley, *History of Bengal, Bihar and Orissa under British Rule.* Callcutta, Bengal Seoritariat book depot. P. 20.

[৪৫] L.S.S. Omalley, Ibid. P. 20, 21.

[৪৬] H. H. Dodwell, ed., *The Cambridge History of India, Vol-v, British India, 1497-1858),* Delhi: s. Chand & Co.,nd), pp. 41

[৪৭] Anjali Chatterjee, *Bengal in the Reign of Aurangzib*, 1658-1707, Calcutta: Prograssive Publishers, 37, College street, 1967, p. 190

বার্ষিক $৩\frac{১}{২}$ % হারে শুল্ক শুধু একবার দিতে হতো।[৪৮] রাজকীয় ফরমান লাভের পরবর্তী বছরগুলোতে ওলন্দাজ ব্যবসা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। নবাব মুর্শিদকুলী খানের সুবাদারি আমলে ওলন্দাজরা মুঘল সরকার ও ইংরেজদের মধ্যে সংঘটিত সংঘর্ষের সুযোগ গ্রহণ করে। মুঘল সৈন্যরা যখন হিজলি, হুগলি ও অন্যান্য স্থানে ১৬৮৬-৮৭ সালে ইংরেজদের সেই শোচনীয় অবস্থায় ওলন্দাজ ও ফরাসিরা, বিশেষ করে ওলন্দাজরা অবস্থার সদ্ব্যবহার করে নদীতে অবস্থিত তাদের এগারোটি জাহাজে তারা বেশ ভাল বিনিয়োগ লাভ করে এবং তাদের কারখানা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। এসব প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন প্রতিকূলতার জন্য তারা ত্যাগ করার সিদ্ধান্তই নিয়েছিল।[৪৯]

বাংলায় ওলন্দাজরা শুভাসিং ও রহিম খানের বিদ্রোহের সময় একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিদ্রোহীরা হুগলি অভিমুখে অগ্রসর হলে হুগলির ফৌজদার নূরউল্লাহ খান হুগলি দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং চুঁচুড়ার ওলন্দাজদের সাহায্য কামনা করেন। বাংলায় বিদ্রোহ দমনের জন্য বিদেশীদের সাহায্য চাওয়ার ওটাই ছিল সূচনা।[৫০] নূর উল্লাহ পলায়ন করেন এবং বিদ্রোহীরা ১৬৯৬ সালের আগস্ট মাসে হুগলি দখল করে। হুগলি দখলের পর ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে তারা আশে পাশের এলাকায় ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবার চুঁচুড়ার ওলন্দাজদের নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় করে। হুগলি মাত্র একদিনের জন্য বিদ্রোহীদের হাতে থাকে। পরদিন চুঁচুড়ার ওলন্দাজ ফ্যাক্টরির গভর্ণর হুগলি নদীতে নোঙ্গর করা যুদ্ধ জাহাজ থেকে হুগলি শহরে বোমা নিক্ষেপ করে। অতঃপর বিদ্রোহীরা সপ্তগ্রামের উদ্দেশ্যে হুগলি ত্যাগ করে।[৫১]

লুণ্ঠনরত বিদ্রোহীরা যখন ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে সমগ্র এলাকা ধ্বংসকার্যে লিপ্ত সে সময় ইউরোপীয় ফ্যাক্টরিসমূহ বিশেষত ওলন্দাজ ও ফরাসি ফ্যাক্টরিগুলো প্রায় অবরোধের মধ্যে উৎকণ্ঠায় দিন কাটায়। সুবাদার ইব্রাহীম খানের অস্পষ্ট ইঙ্গিতে তখন ওলন্দাজরা চুঁচুড়ায় গুস্তাভাস দুর্গ (Fort Gustavas) নির্মাণ করে। বিদ্রোহীদের পর ওলন্দাজরা যুবরাজ আজিম উশ শানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং তাদের বাণিজ্য সুবিধাদি ইংরেজদের সমকক্ষ করার আবেদন জানায়। তবে ইংরেজরা তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ

---

[৪৮] Anjali Chatterjee, *Bengal in the Reign of Aurangzib*, 1658-1707, Calcutta: Prograssive Publishers, 37, College street, 1967, p. 190

[৪৯] Charles Stewart, *The History of Bengal*, Black, Parry and Co. Leadenhall street, watts, printer, broxbourne, 1813. p. 316

[৫০] চারু চন্দ্র রায়, "*শোভা সিংহ এর বিদ্রোহ*", চন্দননগর, ১৯২২, পৃ. ২২৪।

[৫১] প্রাগুক্ত

করে দেয়।[৫২] ১৭০০ সালে মুর্শিদকুলী খান দেওয়ান হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের পর ওলন্দাজরা তাদের ব্যবসা শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করায়। রাজত্বের পঞ্চম বছরে জারিকৃত সম্রাট আওরঙ্গজেবের এক ফরমান বলে ওলন্দাজরা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় বাণিজ্য-সুবিধা লাভ করে, বিনিময়ে তাদের বছরে শুধু একবার ঐসব প্রদেশের যে কোনো এক জায়গায় ৩$\frac{১}{২}$% ভাগ হারে শুল্ক দিতে হয়ে। সম্রাট আওরঙ্গজেব ওলন্দাজদের বাংলায় আর কোনো ফরমান দিয়েছেন কিনা তা জানা যায়নি। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে সুবাদারি কমকর্তাগণ পরবর্তীকালে আরও যে সব পরওয়ানা জারি করেন সেগুলোতে ঐ ফরমানের কথাই উল্লেখ রয়েছে এবং যার ভিত্তিতে তারা ওলন্দাজদের সুযোগ সুবিধাধি নিশ্চিত করেছেন। শুল্ক ধার্য করা ছাড়াও ওলন্দাজদের বেচাকেনায় ও ঋণ আদায়ে সুবিধার জন্য স্থানীয় দালাল নিয়োগ দানের ক্ষমতা প্রদানের জন্যও তিনি সুবাদারদের আদেশ দেন। এই ফরমানের প্রধান ধারাসমূহ ওলন্দাজদের প্রদত্ত পরবর্তী পরওয়ানাসমূহে উল্লেখ করা হয়।

চিরাচরিতভাবে, মুর্শিদকুলী খান ওলন্দাজদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন, কিন্তু ১৭০১ সালে সম্রাটের এক ফরমান বলে সমস্ত ইউরোপীয় ও তাদের মালামাল জব্দ করার আদেশ দিলে ওলন্দাজদের ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল তা জানা যায়নি। এটি ছিল জলদস্যুদল কর্তৃক দুটি মুঘল জাহাজ দখল করে নেয়ার ফলশ্রুতি হিসাবে। এটি অবধারিত যে ফরমান কার্যকর করতে গিয়ে তিনি ইংরেজদের লণ্ডন কোম্পানি ও ইংলিশ কোম্পানীর বিরুদ্ধে যেরূপ ভয়াবহ রূপ নিয়েছিলেন ওলন্দাজগণও তাদের মালামাল দখল করে নেয়ার ব্যাপারে অনুরূপ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। শীঘ্রই ঐ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পর স্বভাবতই ১৭০৪ সালে জারিকৃত এক পরওয়ানা বলে তিনি ওলন্দাজদের পূর্বের ন্যায় সমস্ত সুযোগ সুবিধাদি প্রদান করেছিলেন।[৫৩] প্রায় একই সময় ইংরেজরা মুর্শিদকুলি খানের সঙ্গে সনদ প্রাপ্তির ব্যাপারে আলোচনা আরম্ভ করলে ওলন্দাজরাও তাদের উকিল রাজবল্লভকে দিওয়ানের নিকট প্রেরণ করে তাদের পক্ষে চুক্তি করার জন্য। ওলন্দাজদের ব্যাপার ছিল সাধারণ অর্থাৎ পুরাতন চুক্তি নবায়ন করা, কিন্তু ইংরেজদের দুটি কোম্পানী একীভূত করার পরওয়ানা লাভ করে। বাণিজ্যচুক্তি নবায়নের জন্য ওলন্দাজরা কত টাকা দিয়েছিল তা অবশ্য প্রদান করেছে। তাদের নিকট থেকে নগদ টাকা চাওয়া হয় এবং ১৫,০০০ টাকা বা ২০,০০০ টাকায়ও দিওয়ান রাজি

---

[৫২] Charles Robert Wilson, *The Early Annals of the English in Bengal (V-I) Asiatic Society*, 1963, The university of California. P. 341

[৫৩] Abdul Karim, *Murshid Kuli Khan and his times*, Asiatic Socity of Pakistan, Dhaka, 1963, P. 194

হননি।[৫৪] কিন্তু প্রফেসর আব্দুল করিমের মতে এটি সত্য নয়। সে তারিখের Consulation মতে এ দাবি করা হয় তাতে ইংরেজদের নিকট থেকে ৩০,০০০ টাকা চাওয়ার কথা বলা হয়েছে, ওলন্দাজদের কাছ থেকে ৬০,০০০ টাকা নিয়েছেন-৩০,০০০ টাকা ইংরেজ কোম্পানিদ্বয়ের কাছ থেকে এবং ওলন্দাজ ও ফরাসিদের প্রত্যেকের কাছ থেকে ১৫,০০০ টাকা করে।[৫৫]

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইউরোপে সূচিত ওলন্দাজদের পতন শীঘ্রই ভারতেও প্রভাব বিস্তার করে। ১৭০০ সালের পর ভারতে ওলন্দাজরা দ্রুত ইংরেজদের পেছনে পড়তে আরম্ভ করে। অহেতুক কৃত্রিম আচরণ ও দুর্নীতির দরুন বাংলায় এবং সমগ্র ভারতে আলেকজান্ডার হ্যামিলটন হুগলির বরানগর কুঠিতে ওলন্দাজদের চরম লাম্পট্য লক্ষ্য করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজ ও ফরাসিদের সাথে ব্যবসায় এঁটে উঠতে না পেরে ওলন্দাজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সমৃদ্ধ বিনিয়োগকারীদের দৃষ্টিতে স্বচ্ছল থাকার জন্য কৃত্রিম মুনাফা প্রদান করত হিসাবে ভেল্কিবাজী দেখিয়ে বা এমন কি টাকা ধার করেও।[৫৬]

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংরেজ ও ওলন্দাজ ব্যবসার একটি তুলনামূলক প্রতিবেদন থেকেই ইংরেজদের উঁচু স্থান পরিষ্কার ধরা পড়ে। ওলন্দাজরা যেখানে তাদের সমরাস্ত্রের উপর ৩$\frac{১}{২}$% হারে শুল্ক সরকারকে প্রদান করত, সেখানে ইংরেজরা প্রদান করত সর্বসাকুলে বার্ষিক মাত্র ৩,০০০ টাকা। এটি নিঃসন্দেহে ইংরেজদের সুবিধাজনক অবস্থায় ফেলেছিল। বাংলার ওলন্দাজরা চুঁচুড়া ও বরানগর লাভ করেছিল ইজারা হিসাবে, অথচ ইংরেজ কোম্পানী আরও গুরুত্বপূর্ণ কলকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর লাভ করেছিল জমিদার হিসাবে।[৫৭] তাঁতী ও রুরেজদের প্রদত্ত অগ্রিম আদায়ের জন্য ওলন্দাজরা সরকারি কর্মকর্তাদের বিচারের উপর নির্ভর করতে হতো, অথচ ইংরেজরা নিজেরাই বিচারকার্য কর্মকর্তাদের বিচারের উপর নির্ভর করতে হতো, অথচ ইংরেজরা নিজেরাই দারুণভাবে বাড়িয়ে দেয় এবং তারা অতি সহজে ওলন্দাজদের তাদের প্রভাব বলয় থেকে বিতাড়িত করে।

---

[৫৪] Charles Robert Wilson, *The Early Annals of the English in Bengal (V-I) Asiatic Society*, 1963, The university of California. P. 170

[৫৫] Abdul Karim, *Murshid Kuli Khan and his times*, Asiatic Socity of Pakistan, Dhaka, 1963, P. 194, 195.

[৫৬] Abdul Karim, Ibid, P. 72

[৫৭] সুকুমার ভট্টাচার্য : *দি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এন্ড দি ইকনোমি অব বেঙ্গল*, ১৭০৪-১৭৪০, কলকাতা, ১৯৬৯, পৃ. ৭৩

খার ও সিল্কের ন্যায় কিছু দ্রব্যের প্রতিযোগিতায় তিক্ততা হলেও ওলন্দাজরা সাধারণত ইংরেজদের সাথে মিলে অন্যান্য ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের দূরে রাখার চেষ্টা করত। বাংলায় অস্টেণ্ড কোম্পানীর বিরোধিতার ব্যাপারে ওলন্দজরা ইংরেজেদের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না।[৫৮]

ওলন্দাজদের রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে ছিল সূতীবস্ত্র, সিল্ক, খার, চাউল এবং বিশেষত আফিম। জাভা ও চীনে প্রেরিত আফিম বেশ মুনাফা বয়ে আনত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলায় কোম্পানীর স্থায়িত্ব নড়বড়ে হয়ে গেলেও কোম্পানীর অন্যান্য স্থানের তুলনায় বাংলার ব্যবসাই ছিল সবেচেয়ে বেশি লাভজনক।[৫৯]

৪.১.৩ ফরাসি বণিকদের বাণিজ্য বিস্তার

ফ্রেঞ্চ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী (The French East India Company) ১৬৬৮ সালে সুরাট পৌছে এবং ভারতে প্রথম ফরাসি কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করে। ডিসেম্বর ১৬৬৯ সালে তারা একটি ফরমান লাভ করে যা দ্বারা তাদেরকে সম্রাটের সামাজ্যে আমদানি রপ্তানির শুল্ক কর ছাড়াই ব্যবসার চুক্তিপত্র সম্পাদনে অনুমতি দেয়া হয়; মসুলিপট্টমে ব্যবসা করার জন্য তাদের একটি লাইসেন্সও প্রদান করা হয়।[৬০]

তাদের ব্যবস্থা একস্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করতে হয় একবার ট্রিংকোমালিতে আবার সেন্ট থমাস; শেষপর্যন্ত তাদের প্রতিনিধি ফ্রান্সিস মার্টিন ১৬৭৪ সালের এপ্রিল মাসে পণ্ডিচেরীতে বসতি প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু পরবর্তীতে ওলন্দাজরা জোরপূর্ব পণ্ডিচেরীও দখল করে নেয় এবং শেষ পর্যন্ত রিসউইকের চুক্তি (Treaty of Ryswich) অনুযায়ী ফরাসিরা ওলন্দাজদের নিকট থেকে পণ্ডিচেরী ফেরত পায়।[৬১]

স্টুয়ার্টের মতে শায়েস্তা খানের সুবাদারি আমলে ১৬৭৬ সালে ফরাসিরা বাংলায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে।[৬২]মেলেসনের মতে, তাঁর (শায়েস্তা খান) সুবাদারি আমলে একটি ফরাসি নৌবহর হুগলিতে

---

[৫৮] সম্রাট ফররেখ, সিয়ারের ফরমান ১৭১৭ সাল ধারা ৩ ও ৬। সুকুমার ভট্টাচার্য : *দি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এন্ড দি ইকনোমি অব বেঙ্গল*, ১৭০৪-১৭৪০, কলকাতা, ১৯৬৯, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩।

[৫৯] সুকুমার ভট্টাচার্য : *দি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এন্ড দি ইকনোমি অব বেঙ্গল*, ১৭০৪-১৭৪০, কলকাতা, ১৯৬৯, পৃ. ৭৩।

[৬০] George Bruce Malleson, *History of the French in India*: From the founding of Pondichery in 1674 to the capture in 1761, Cambridg Library Collection South Asia Library, Cambridg University Press, March 5, 2012, P. 15, 16.

[৬১] George Bruce Malleson, Ibid, P. 34, 35.

[৬২] Charles Stewart, *The History of Bengal*, Black, Parry and Co. Leadenhall street, watts, printer, broxbourne, 1813. p. 302.

প্রবেশ করে এবং একদল বসতিস্থাপনকারীদের চন্দনগর গ্রামে নামিয়ে দেয়। ১৬৮৮ সালে আওরঙ্গজেবের এক আদেশবলে ঐ গ্রামটি এসব বসতিস্থাপনকারীদের দিয়ে দেয়া হয়।[৬৩] অন্যান্য ঐতিহাসিকের ন্যায় মেলেসনও ১৬৭৪ সালের এই তারিখের ব্যাপারে স্টুয়ার্টের মত সমর্থন করেন। নিম্ন গঙ্গায় গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপনকারী ফরাসিরা ছিল তুলনামূলকভাবে ওলন্দাজদের চেয়ে অধিক কর্মঠ ও আগ্রাসী এবং ইংরেজদের সম্ভাব্য জোরালো প্রতিদ্বন্দ্বী। বাংলায় তাদের প্রতিষ্ঠা লাভের তারিখ ১৬৭৪।[৬৪] তবে ১৬৭৩ সালে বাংলার চন্দননগর ও অন্যান্য স্থানে তাদের বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপনের প্রমাণও পাওয়া যায়।[৬৫]

ফরাসিরা ওলন্দাজদের চুঁচুঁড়া ফ্যাক্টরির নিকটবর্তী স্থানটি তাদের ফ্যাক্টরির জন্য বেছে নেয়। ওলন্দাজরা ফরাসিদের পছন্দ করত না, তাই হুগলির মুঘল সরকারের নিকট ফ্যাক্টরির জন্য চেষ্টা করেছে বলে মনে হয় না। শেষ পর্যন্ত ১৬৯৩ সালে বাংলা-বিহার ও উড়িষ্যায় ব্যবসা করার জন্য ফরাসিরা ওলন্দাজদের ন্যায় একই শর্তে সম্রাটের নিকট থেকে একটি ফরমান লাভ করে। ফরাসিদের প্রদত্ত বাণিজ্য সুবিধাদি যেহেতু ওলন্দাজদের অনুরূপই ছিল, তাই এগুলো ইংরেজদের প্রাপ্ত সুবিধার তুলনায় নিম্নমানের ছিল। প্রথম চল্লিশ বছরে তাদের অবস্থা বেশ উন্নত হয়েছিল ফলে সরকারি কাগজত্রে তাদের একই শ্রেণীভূক্ত করা হতো এভাবে “প্রদেশে ব্যবসারত তিনটি ইউরোপীয় জাতি।” সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসিরা বরং অন্যান্য ব্যবসাকেন্দ্র যথা কাশিম বাজার, ঢাকা, বালেশ্বর ও পাটনায় তাদের ফ্যাক্টরি স্থাপন করে।

বাংলায় শুভ সিং ও রহিম খানের বিদ্রোহের সময় ফরাসিদের ভূমিকা ছিল সন্দেহপূর্ণ। তিনটি কোম্পানী ইংরেজ, ওলন্দাজ, ফরাসি যখন জানত পারে যে তাদের প্রতিরক্ষা নিজেদের নিতে হবে তারা পেলে নামক একজনকে বিদ্রোহী শিবিরে প্রেরণ করে তাদের নিরপেক্ষতা জানিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় কিন্তু সমগ্র পরিকল্পনার বিষয়ে ওলন্দাজদের ঔদাসীন্যের ফলে এই উদ্যোগ ব্যর্থ হয়।[৬৬] সম্মিলিত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও ফরাসি ও ইংরেজরা গোপনে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং একটি সমঝোতার মাধ্যমে সমাগত বিপদ থেকে নিজেদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। কিন্তু ফরাসি

---

[৬৩] George Bruce Malleson, *History of the French in India*: From the founding of Pondichery in 1674 to the capture in 1761, Cambridg Library Collection South Asia Library, Cambridg University Press, March 5, 2012, P. 32

[৬৪] সুকুমার ভট্টাচার্য : *দি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এন্ড দি ইকনোমি অব বেঙ্গল*, ১৭০৪-১৭৪০, কলকাতা, ১৯৬৯, পৃ. ৭৩।

[৬৫] Abdul Karim, *Murshid Kuli Khan and his times*, Asiatic Socity of Pakistan, Dhaka, 1963, P.200

[৬৬] Abdul Karim, Ibid, P.200.

গভর্ণর ফ্রান্সিস মার্টিন তাঁর প্রচেষ্টার পুরোপুরি সফল হননি।[৬৭] শুভা সিং এর মৃত্যুর পর কাশিম বাজারের ব্যবসায়ীগণ বিদ্রোহী নেতা রহিম খানের নিকট কাশিমবাজার শহর ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য একটি স্মারকলিপি প্রেরণ করে; বিদ্রোহী নেতা তা মঞ্জুর করে। ফরাসি কুঠিয়াল ফনভীল (Fonvielle) পূর্বাহ্নে পলায়ন করেন কারণ তিনি আশংকা করেন বিদ্রোহীরা ওলন্দাজ ও ফরাসি কুঠিয়ালদের নিকট থেকে জোরপূর্বক শুল্ক আদায় করতে পারে।[৬৮] ফনভীল একজন দেশীয় এবং একজন ফরাসি লোককে ফ্যাক্টরির দায়িত্বে দিয়ে যান। তারা টাকা দিতে ব্যর্থ হলে তাদের বেত্রাঘাত করার আদেশ দেয়া হয়। কিন্তু যেভাবেই হোক তারা পালিয়ে যায় এবং অতঃপর ফরাসি ফ্যাক্টরি বিদ্রোহীরা লুণ্ঠ করে।[৬৯] ফরাসি গভর্ণর মার্টিন চন্দননগরে দুর্গের কোণায় আরেকটি বুরুজ নির্মাণ করেন। বিদ্রোহী সৈন্যরা চন্দনগরের নিকট অবিরাম লুটপাট করে। চন্দননগর দুর্গ ক্রমাগত কামানের গোলা নিক্ষেপ এবং তাদের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনার দরুন রক্ষা পায়।

বিদ্রোহ দমনের পর সমস্ত ইউরোপীয় যথাযোগ্য উপঢৌকন নিয়ে যুবরাজ আজিম-উশ-শানের দরবারে হাজির হয়। ফরাসিরা আসে সবার শেষে। কলোন ও ফনভীল (Chalonge and Fonvielle) নামে দুজন ফরাসি ২,৫০০ টাকা মূল্যের উপঢৌকন নিয়ে ১৬৯৮ সালের জানুয়ারি মাসে যুবরাজের দরবারে উপস্থিত হন। ক্যাপলিন (Kaepplin) লেখেনঃ

কোম্পানির কর্মচারী কলোন ও ফনভীলকে (যারা কাশিমবাজার থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন) অতএব, ১৬৯৮ সালের জানুয়ারি মাসে সুলতান মৌসেদীর শিবিরে প্রেরণ করা হয়। তাদের উপহারের মূল্য ২,৫০০ টাকার বেশী না হলেও, মার্টিনের মতে তাঁরা বেশ তোষামোদি সম্মানের পাত্র হন। দেখা করার জন্য ওলন্দাজদের যেখানে একমাস অপেক্ষা করতে হয়েছিল সেখানে তাদের আগমনের তৃতীয় দিনে তারা দুটি শুনানি লাভ করেন। তাঁরা তরবারী কটিদেশে স্থাপিত অবস্থায় আগমন করেন এবং দেহ তল্লাসীর আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই প্রবেশ করেন এবং পূর্বে প্রদত্ত ফরমানের অনুমোদন লাভ করেন।[৭০]

যাহোক, বিদ্রোহ শেষ হবার পর ফরাসি, ইংরেজ ও ওলন্দাজগণ পূর্ব ঘোষিত শর্তাদি পূরণে পর তাদের ব্যবসা পুনরায় চালু করে। ১৭০১ সালে সম্রাটের এক ফরমান বলে সমস্ত ইউরোপীয় ও

---

[৬৭] Abdul Karim, *Murshid Kuli Khan and his times*, Asiatic Socity of Pakistan, Dhaka, 1963, P.200.

[৬৮] চারু চন্দ্র রায়, "*শোভা সিংহ এর বিদ্রোহ*", চন্দননগর, ১৯২২, পৃ. ২২৪।

[৬৯] চারুচন্দ্র রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪।

[৭০] চারু চন্দ্র রায়, প্রাগুক্ত

তাদের মালামাল বাজেয়াপ্ত করা হলে ফরাসিরা তাদের ব্যবসাসহ সমুদয় মালামাল হারায়। পুনরায় ১৭০৪ সালে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হলে ফরাসিরা দিওয়ান মুর্শিদকুলি খানকে ১৫,০০০ টাকা দিয়ে একটি পরওয়ানা লাভ করে।[৭১]

ফরাসি গভর্ণর মার্টিন ভবিষ্যৎ মুঘল দূর্যোগের বিষয় উপলব্ধি করেন। শুভা সিং এর বিদ্রোহের অনতিকাল পরে মার্টিন লেখেন:

“এ সব আংশিক গোলযোগ মূলত: অদূর ভবিষ্যতে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর সমাগত মহাদুর্যোগের পূর্বাভাস যখন তাঁর পুত্রগণ ও তাঁদের সমর্থকরা তাঁর উত্তরাধিকারীর প্রশ্নে বিরোধে লিপ্ত হবেন।”[৭২]

মার্টিন পরিষ্কারভাবে দেশের অবস্থা উপলব্ধি করেন এবং ফরাসিদের পূর্ণ সফলতার সূত্রসমূহ নির্ণয় করেন; তিনি মুঘল সাম্রাজ্যের আসন্ন ভাঙ্গন লক্ষ্য করেন এবং ফরাসিদের বাণিজ্যিক সফলতার পেছনে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক আধিপত্য লাভের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করেন।[৭৩] তিনি তাই পণ্ডিচেরির চতুর্দিকে শক্ত দেয়াল নির্মাণ করেন যা ইতিপূর্বে ছিল না। সে সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ তদারকিতে বাংলার ফরাসি ব্যবসা প্রকৃত উন্নতির মুখ দেখে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই আশাব্যঞ্জক অবস্থা বেশিদিন টেকেনি। ১৭০৪ সালের আগেই ইউরোপে স্পেনীয় উত্তরাধিকারের যুদ্ধ বেধে যায় এবং তাতে ফ্রান্সও জড়িয়ে যায়। এই যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া শীঘ্রই ভারতেও অনুভূত হয়। ব্যবসা বাণিজ্য পুনরায় বাধাগ্রস্থ হয়, বাংলা ও সুরাটের ফ্যাক্টরিগুলো পূর্বের মতো অকর্মণ্য হয়ে পড়ে।[৭৪] ফরাসি কোম্পানীর কাজ কারবার ফান্সে অযোগ্য হাতে পরিচারনা করা হয়। অর্থের অভাবে নিজেদের ব্যবসার কাজ পরিচালনায় ব্যর্থ হয়ে তারা ব্যবসার লাইসেন্স বিক্রয়ে মনোনিবেশ করে। প্যারিসে অর্থ ও উত্তম পরিচালনা তৎসঙ্গে পণ্ডিচেরিতে একজন মার্টিন পাওয়া গেলে ফরাসিরা ভারতে এমন একটি দ্বীপ প্রতিষ্ঠা করতে পারত যাকে অত সহজে ধ্বংস করা যেত না এবং যা মার্টিনের সুযোগ্য উত্তরাধিকারীদের বেশ কিছু উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পায় সাহায্য করতে পারত।[৭৫]

---

[৭১] Abdul Karim, *Murshid Kuli Khan and his times*, Asiatic Socity of Pakistan, Dhaka, 1963, P.194, 195

[৭২] চারু চন্দ্র রায়, “*শোভা সিংহ এর বিদ্রোহ*”, চন্দননগর, ১৯২২, পৃ. পৃ. ১১৬।

[৭৩] H. H. Dodwell, ed., *The Cambridge History of India, Vol-v, British India, 1497-1858),* Delhi: s. Chand & Co.,nd), p. 73

[৭৪] H. H. Dodwell, ed., Ibid. p. 73

[৭৫] George Bruce Malleson, *History of the French in India*: From the founding of Pondichery in 1674 to the capture in 1761, Cambridg Library Collection South Asia Library, Cambridg University Press, March 5, 2012, P. 36

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসি কোম্পানীর সম্পদ প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায়। পণ্ডিচেরির বসতিতে তারা যে সামগ্রীর যোগান দিত তা ছিল খুবই ক্ষুদ্র তালিকার। যে সব ব্যবসায়ী তাদের লাইসেন্স ক্রয় করতো তারা তাদের ভাগ্য গড়ে নিত; অথচ কোম্পানীর পরিচালণগণ যারা এসব লাইসেন্স বিক্রয় করতেন তাঁরা বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে কোনোক্রমে তাদের কর্মচারীদের উপোস থাকা থেকে রক্ষা করতে পারতেন। এটি একটি বিরল দুর্ভাগ্য যখন ভারতে এমন এক ব্যক্তিত্ব ফরাসির কাজ কারবার দেখাশোনা করতেন যিনি যথেষ্ট সততা ও যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন।[৭৬] ৩১ ডিসেম্বর ১৭০৬ সালে মার্টিনের মৃত্যুর পর থেকে ১৭১৮ সাল পর্যন্ত বাংলায় ফরাসি ব্যবসা বন্ধ থাকে। ১৭১৮ সালের পূর্বে কয়েক বছর বাংলায় তারা কোনো জাহাজই প্রেরণ করেননি।[৭৭] কিন্তু ১৭১৮ সালে বাংলায় ফরাসি কোম্পানীর গভর্ণর এম. এ্যারড্যানকোর্ট (M. Ardancourt) বাংলায় ফরাসি ব্যবসা পুনরায় জোরদার করার চেষ্টা করেন।

১৬৯০-১৬৯২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে চন্দননগরের ফরাসিদের কুঠি একটি শক্তিশালী সুরক্ষিত কুঠিতে পরিণত হয়।[৭৮] ১৬৯৩ খ্রিস্টাব্দে উক্ত কুঠি ওলন্দাজগণ কর্তৃক অধিকৃত হলেও পুনরায় তা ফরাসিদের ফেরত দেওয়া হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাবে ফরাসি ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অর্থবল হ্রাস পেলে মসলিপট্টম, সুরাট ও সানটোমের কুঠি তারা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ১৭২০ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি কোম্পানী পুর্নগঠিত হলে তারা মাহে ও কারিকট বন্দর দুটি পুনরুদ্ধার করে। ১৭৪১ খ্রিস্টাব্দে ডুপ্লে ফরাসি কোম্পানীর গভর্ণর হয়ে এ দেশে আগমন করলে ব্যবসা বাণিজ্যের কিছুটা উন্নতি হয়।[৭৯] ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দের পরে ইংরেজদের সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক বাণিজ্যের ফলে তারা ক্রমশ রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারে মনোনিবেশ করে। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা ফরাসিদের চন্দনগর দখল করে নিলে বাংলা-বাণিজ্যে তাদের প্রাধান্য নষ্ট হয়ে যায়। পলাশী যুদ্ধের পরে বাংলায় তাদের পতন ঘটে। ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে তাদের বাণিজ্য কুঠি বন্ধ করে এই দেশ ছেড়ে চলে যায়।[৮০]

১৬১৬ খ্রিস্টাব্দে দিনেমার ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয়। বাংলার শ্রীরামপুরে তারা বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করে। বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্যে তারা অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানীদের সাথে বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে পারেনি। তারা ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে তাদের কুঠিগুলো ইংরেজদের কাছে বিক্রি করে দেয়। সমসাময়িক কালে এই দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্য ওয়েস্টেন্ড নামে একটি জার্মান

---

[৭৬] George Bruce Malleson, *History of the French in India*: From the founding of Pondichery in 1674 to the capture in 1761, Cambridg Library Collection South Asia Library, Cambridg University Press, March 5, 2012, P. 36, 37

[৭৭] Abdul Karim, *Murshid Kuli Khan and his times*, Asiatic Socity of Pakistan, Dhaka, 1963, P.201

[৭৮] Suranjan Chatterjee & Dr. Siddhartha Guha Ray, *op. cit.*, p. 95.

[৭৯] Kalikinkar Datta, *An advanced History of India.* Macmillan India Press, Madras, p. 7.

[৮০] আবদুল করিম, *মোগল রাজধানী ঢাকা*, অনুবাদ, ড. মো: মুহিবুল্লাহ ছিদ্দিকী। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৩, পৃ. ৫৮।

কোম্পানী, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রশিয়ান কোম্পানী, ১৭৩১ খ্রিস্টাব্দে সুইডিস ইষ্ট ইন্ডিয়ান কোম্পানী, ১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দে অস্ট্রিয়ান ইষ্ট ইন্ডিয়ান কোম্পানী প্রভৃতি কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়ে বাংলা বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসি বণিকদের সাথে প্রতিযোগিতায় কোন কোম্পানীই টিকতে পারেনি।

৪.২ প্রাচ্যে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আগমন

উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের অনেকগুলো দ্বীপ নিয়ে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ গঠিত। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে গ্রেট বৃটেন ও আয়ারল্যান্ড সব থেকে বড়। গ্রেট বৃটেন আবার ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ও ওয়েলস এই তিনটি দেশে বিভক্ত। কিন্ত আয়ারল্যান্ড আইরিশ ফ্রি স্টেট ও উত্তর আয়ারল্যান্ড পৃথক দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত। গ্রেট বৃটেন ও উত্তর আয়ারল্যান্ডকে একত্রে যুক্তরাজ্য বলে। আর যুক্তরাজ্য বা ইংল্যান্ডের অধিবাসীদেরকে ইংরেজ বলা হয়।[৮১] খ্রিস্টপূর্ব ৫৫ অব্দে রোমান সেনাপতি জুলিয়াস সীজার বৃটেন আক্রমণ করেন। তখন থেকে বৃটেন রোমান সাম্রাজ্যের অধীন হয়ে পড়ে। দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে রোমান সাম্রাজ্য যখন ভেঙ্গে পড়ে তখন রোমান সৈন্যরা স্বীয় দেশ রক্ষার জন্য বৃটেন ছেড়ে দেয়। সে সময় সম্রাট আরোরিয়স বৃটেনের স্বাধীনতা দান করেন।[৮২]

ইংরেজ বণিকদের বাংলায় আগমন ভারতীয় উপমহাদেশ তথা বিশ্ব ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ষোড়শ শতব্দীতে রেনেসাঁর আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ইউরোপীয়দের মধ্যে নিজেদেরকে চারদিকে বিকশিত করার এক নতুন উদ্যোম দেখা দেয়। পর্তুগিজ ও ওলন্দাজদের পর ইংরেজরা প্রাচ্যে আগমন করে। স্বাভাবিকভাবে ইংরেজরা পর্তুগিজদের সাফল্যজনক নৌ-অভিযান ও সমুদ্র বাণিজ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রাচ্যের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে উৎসাহী হয়। ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সিস ড্রেক (Francis Drake) সমুদ্র পথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করে ইংল্যান্ডে পৌছেন। ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে বেনজামিন উড সাগর পথে প্রাচ্যদেশ পরিভ্রমণ করেন। ১৫৯১ খ্রিস্টাব্দে র‍্যালফ ফীচ ভারত ভ্রমণ করে প্রাচ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের বিপুল সম্ভাবনার কথা স্বদেশবাসীর কাছে প্রচার করেন।[৮৩] জন মিডেল হল ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে স্থল পথে ভারতে আসেন এবং সাত বছর এখানে অবস্থান করে ভারতবর্ষের অতুলনীয় বৈভব ও ঐশ্বর্য দেখে মুগ্ধ হন।

---

[৮১] জে.আর. ব্যানার্জী, *ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস* (কলিকাতা : বুকল্যাণ্ড, ১৯৪০) পৃ. ১-২।
[৮২] জে.আর. ব্যানার্জী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩।
[৮৩] H.H. Dodwell, *The Cambridge History of India*, Vol-5, Reprint, Calcutta, 1968, p. 76.

তাদের বর্ণনায় ভারতবর্ষের অতুলনীয় বৈভব ও ঐশ্বর্যের কথা ইংরেজরা জানতে পারেন। পর্যটকদের বর্ণনায় ভারতবর্ষের অতুলনীয় বৈভব ও ঐশ্বর্য সম্পর্কে জানতে পেরে ইংরেজরা ভারতের সাথে সরাসরি ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে।[৮৪] ইতোমধ্যে ১৫৮৮ খ্রিস্টাব্দে স্পেনীয় আর্মাডার বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধে ইংরেজরা জয়লাভ করলে ইংরেজ নাবিকদের উৎসাহ ও সাহস দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়।[৮৫] কয়েকজন ইংরেজ বণিক প্রাচ্যে বাণিজ্যের জন্য যৌথভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে ২৪ সেপ্টেম্বর ৮০ জন অংশীদার নিয়ে প্রথম ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয়।[৮৬] কোম্পানীর প্রারম্ভিক মূলধন ছিল ৩০,০০০ পাউন্ড। কোম্পানী ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে ২৩ সেপ্টেম্বর পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বাণিজ্য করার জন্য ইংরেজ জাতির পক্ষে ইংল্যান্ডের রাণী প্রথম এলিজাবেথের কাছে একটি সনদ প্রার্থনা করে। ৩১ ডিসেম্বর ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে রাণী প্রথম এলিজাবেথের ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে প্রাচ্যে একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার দিয়ে পনের বছরের জন্য একটি সনদ প্রদান করেন।[৮৭] উক্ত সনদে কোম্পানীর নাম দেওয়া হয় The Governor and Company of Merchants of London Trading into the East Inides।[৮৮]

একজন শাসনকর্তা, একজন সহকারী শাসনকর্তা এবং চব্বিশ জন সদস্যের উপর এই কোম্পানীর পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তবে কোম্পানীর অভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ পরিচালনার দায়িত্ব ইংল্যান্ডের প্রিভি-কাউন্সিলের হাতে রাখা হয়। রাণী এলিজাবেথ নবগঠিত এই ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং তিনি স্বয়ং একজন অংশীদার নিযুক্ত হন। সর্বপ্রথম ইংরেজ কোম্পানীর সামুদ্রিক অভিযান সুমাত্রা, জাভা ও মালাক্কার দিকে প্রেরিত হয়। জেমস ল্যাংকাষ্টারের নেতৃত্বে প্রথম পরপর দুইটি অভিযান মসলা দ্বীপপুঞ্জে প্রেরিত হয়।[৮৯] ইংরেজরা প্রথমে বান্টামে একটি বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করে। কিন্তু ওলন্দাজদের বিরোধিতার জন্য তারা মসলা দ্বীপাঞ্চল থেকে বিতাড়িত হয়। ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে ক্যাপ্টেন উইলিয়াম হকিন্স ইংরেজ রাজা প্রথম জেমসের নিকট থেকে ভারতে মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে উপনিত হয়ে সুরাট বন্দরে একটি বাণিজ্য কুঠি নির্মাণের অনুমতি লাভ করেন।

---

[৮৪] মুহাম্মদ ইনাম-উল হক, *ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাস*, ৭১২ খ্রিস্টাব্দ-১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ, ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন-২০০৬, পৃ. ২৮৭।

[৮৫] .H. Dodwell, *The Cambridge History of India*, Vol-5, Reprint, Calcutta, 1968, p. 76.

[৮৬] সিরাজুল ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস: ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো* (১৭৫৭-১৮৫৭), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ৩।

[৮৭] Om Prakash, *The Dutch East India Company and the Economy of Bengal*, 1630-1720, Princton 1985, p. 10.

[৮৮] সিরাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩।

[৮৯] H.H. Dodwell, Ibid, p. 76-77.

১৬১১ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা মসুলিপট্টমে তাদের বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে।[৯০] তবে পর্তুগিজদের বিরোধিতায় ক্যাপ্টেন ইউলিয়াম হকিন্স উক্ত বছরেই ভারত ত্যাগ করেন।[৯১] ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে ক্যাপ্টেন বেষ্ট দুইটি জাহাজ নিয়ে সুরাট বন্দরে প্রবেশের চেষ্টা করলে সেখানে অবস্থানরত পর্তুগিজ বণিকদের বাঁধার সম্মুখিন হন। ফলে উভয়ের মধ্যে একটি সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। উক্ত সংঘর্ষে বেষ্ট পর্তুগিজ নৌবহরকে বিধ্বস্ত করেন। সে সময় পর্তুগিজদের অত্যাচারে মোগলরা অতিষ্ট হয়ে উঠেছিল এবং ইউরোপীয় অপর কোন শক্তি দ্বারা তাদের ধ্বংস কামনা করেছিল। সুতরাং পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে ক্যাপ্টেন বেষ্টের সাফল্যকে মোগল রাজদরবার অভিনন্দন জানায় এবং সম্রাট জাহাঙ্গীর ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দে একটি ফরমানের মাধ্যমে ইংরেজদেরকে সুরাটে একটি বাণিজ্য কুঠি নির্মাণের অনুমতি প্রদান করেন।[৯২] তার দুই বছর পর ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দে পারস্য সম্রাটের সাহায্য নিয়ে পর্তুগিজদের আরো কয়েকটি নৌযুদ্ধে পরাস্ত করে তাদের নিকট থেকে পারস্যের ওরমুজ বন্দর দখল করে। উক্ত বছরেই ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমস্ স্যার টমাস রোকে পুনরায় মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারের দূত হিসেবে প্রেরণ করেন। তিনি মোগল রাজদরবারে দুই বছর অবস্থান করে তাদের বিরুদ্ধে পর্তুগিজদের সকল চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেন এবং সম্রাটের কাছ থেকে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণসহ ইংরেজ বণিকদের জন্য বেশ কিছু সুযোগ সুবিধা লাভ করতে সক্ষম হন। ফলে ১৬১৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সুরাট, আগ্রা, আহমদাবাদ, ব্রোচ প্রভৃতি জায়গায় ইংরেজদের বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত হয়।[৯৩] ১৬৩৯ সালে ফ্যান্সিস ডে নামক জনৈক বণিক চন্দ্র গিরির রাজার কাছ থেকে মাদ্রাজ লাভ করেন। সেখানে সেন্ট জর্জ নামে সুরক্ষিত দূর্গ ও বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত হয়। ১৬৪২ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ ও পর্তুগিজদের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ফলে ইউরোপ ও প্রাচ্যে উভয় দেশের মধ্যে বিবাদমান শত্রুতার সাময়িক অবসান ঘটে।

১৬৬১ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস পর্তুগিজ রাজকন্যা ক্যাথরিণ ব্রাগাঞ্জাকে বিয়ে করেন।[৯৪] উক্ত বিয়ের যৌতুক হিসেবে ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস ভারতের বোম্বাই শহরটি লাভ

---

[৯০] Nilmani Mukherjee, *The Port of Calcutta, A Short History* (Calcutta: The Commissioners of the port of Calcutta, 1968), p. 19.

[৯১] এ.কে.এম. আবদুল আলিম, *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস*, ৭১০-১৮৫৮ খ্রিস্টব্দ (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩), পৃ. ২৮৭।

[৯২] Suranjan Chatterjee & Dr. Siddhartha Guha Ray, *History of Modern India, 1707-1857, Calcutta: Prograssive Publisher, 1997*, p. 93.

[৯৩] Ibid, p. 93-94.

[৯৪] Catherine of Braganza Microsoft Encarta. DVD. Version. 2009.

করেন।[৯৫] কিন্তু দ্বিতীয় চার্লস কিছুদিন পর উক্ত শহরটি ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাছে বার্ষিক দশ পাউন্ডের বিনিময়ে হস্তান্তর করে। তারপর সুরাটের পরিবর্তে বোম্বাই শহরটি ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৬৩৩ সালে মহানন্দার ব-দ্বীপে হরিহরপুর এবং ১৬৩৬-৩৭ সালে বালেশ্বরে কুঠি নির্মিত হয়।

বাংলায় ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর যোগাযোগ স্থাপনের প্রথম বিশ বছর দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে কাটে। কয়েকবার ব্যবসা বন্ধের জন্য প্রস্তাব করা হয়। অবশেষে ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য কোম্পানী চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে হুগলিতে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে।[৯৬] বাংলায় ব্যাপক বাণিজ্যের সম্ভাবনায় ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে কোর্ট অব ডাইরেক্টর্স নির্দেশ দেয় মাদ্রাজের ফোর্ট সেন্ট জর্জ থেকে পৃথক করে বাংলায় একটি স্বাধীন এজেন্সি খোলার জন্য। ফলে ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় ইংরেজদের একটি পৃথক এজেন্সি প্রতিষ্ঠিত হয়।[৯৭]

সম্রাট শাহজাহানের আমল থেকেই ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বার্ষিক মাত্র তিন হাজার টাকা প্রদানের বিনিময়ে অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে আসে। শাহজাদা সুজা মাত্র তিন হাজার টাকা বাৎসরিক রাজস্বের বিনিময়ে বিনা শুল্কে ইংরেজদেরকে বাংলায় বাণিজ্য করার অধিকার প্রদান করেন।[৯৮] যার ফলে ইংরেজরা বাংলায় অনেক সুবিধাজনক ভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করত। তবে কখনো কখনো বাংলার সুবাদারদের মনোভাব ইংরেজদের প্রতি কঠোর ছিল।

অর্থনীতিবিদ সুকুমার ভট্টাচার্য বলেন, ইংরেজদেরকে বেশ মোটা অংকের টাকা সুবাদার, ডেপুটি সুবাদার ও অন্যান্য কর্মচারীদেরকে দিতে হতো।[৯৯] ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট শাহজাহান দাক্ষিণাত্যে অবস্থানকালে তাঁর কন্যা শাহাজাদী জাহানারা একদিন ভীষণভাবে অগ্নিদগ্ধ হন। অনেক চিকিৎসার পর তার আরোগ্য লাভের আশা ত্যাগ করা হয়। সম্রাট শাহজাহান একজন ইউরোপীয় সার্জনের সহায়তা চেয়ে পাঠান। সম্রাটের আবেদনে সাড়া দিয়ে ইংরেজ কাউন্সিল ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হোপওয়েল নামক জাহাজের শল্যচিকিৎসক জিব্রাইল বাউটনকে প্রেরণ করেন। সৌভাগ্যবশত তিনি শাহাজাদীকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলেন। ফলে বাউটন মোগল রাজ দরবারের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র হয়ে

---

[৯৫] Suranjan Chatterjee & Dr. Siddhartha Guha Ray, *Histry of Modern India, 1707-1857, Calcutta: Prograssive Publisher, 1997*, p. 93-94

[৯৬] সিরাজুল ইসলাম, *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১) ১ম খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি*, পৃ.২৫।

[৯৭] সিরাজুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৫।

[৯৮] এম এ রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, (ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ২০১১) পৃ. ৩৪০।

[৯৯] মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, বাংলার ইতিহাস, *ভারতে ইংরেজ রাজত্বের সূচনাপর্ব*, ১৬৯৮-১৭১৪ খ্রিস্টাব্দ, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৯, পৃ. ৬০।

উঠেন এবং তাকে এই কাজের পুরস্কার দিতে চাইলে বাউটন ইংরেজদেরকে বিনা শুল্কে বাংলায় বাণিজ্যের সুযোগ ও বাণিজ্য কুঠি নির্মাণের অনুমতি প্রার্থনা করেন। তাতে সম্রাট শাহজাহান ইংরেজদেরকে বাংলায় বিনা শুল্কে বাণিজ্যের অধিকার সম্বলিত একটি ফরমান জারি করেন।[১০০] বাউটনের চিকিৎসার সেই কাহিনীর সত্যতা সম্পর্কে অনেক ঐতিহাসিকের মনেই সন্দেহ রয়েছে। তবে দিন তারিখের গরমিল থাকলেও সুরাটে বাউটন নামে সে সময় একজন ডাক্তার ছিলেন তা সত্য এবং রাজকন্যার অগ্নিদগ্ধের ঘটনাও সত্য বলে সকলেই স্বীকার করেন। সে সময় বাংলার সুবাদার ছিলেন শাহ সুজা (১৬৩৯-৬০ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর পরিবারের এক মহিলাও সার্জন বাউটনের চিকিৎসায় দূরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তি লাভ করেন। তাতে খুশি হয়ে সুজাও ইংরেজদেরকে বার্ষিক তিন হাজার টাকা নজরানার বিনিময়ে বাংলায় বাণিজ্যিক অধিকার প্রদান করেন।[১০১]

প্রাচ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইংরেজ কোম্পানী অফ মার্চেন্টস নামে লন্ডনের ব্যবসায়ীরা আরও একটি কোম্পানী গঠন করে প্রাচ্যে আগমন করে। কিন্তু মন্ত্রীসভার চাপে উভয় কোম্পানী মিলে দি ইউনাইটেড কোম্পানী অফ ইংল্যান্ড ট্রেড্রিং টু দি ইষ্ট ইন্ডিজ গঠিত হয়।[১০২] বর্ধমান জেলার অন্যতম জমিদার শোভা সিংহ ১৬৯৬ খ্রিসটাব্দে বিদ্রোহ করে। সেই বিদ্রোহের অজুহাত দেখিয়ে ইংরেজরা নবাবের কাছে দূর্গ নির্মাণের অনুমতি চায়। বিদ্রোহী সৈন্যরা বর্ধমান দখল করে হুগলির দিকে এগিয়ে আসতে থাকলে সেখানে অবস্থানরত অন্যান্য বিদেশি বণিকরা নবাব ইব্রাহিম খাঁকে বোঝান যে, সেখানে আত্মরক্ষার জন্য দূর্গ নির্মাণের অনুমতি না দিলে নিজেদের প্রাণ বিপন্ন হবে। নবাব কিছু না বুঝে তাদের দূর্গ নির্মাণের অনুমতি দিলে ওলন্দাজ ও ফরাসিরা তাদের কুঠির চারদিকে সুরক্ষিত প্রাচীর নির্মাণ করে। আর ১৬৯৭ খ্রিস্টাব্দে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ষোল হাজার টাকার বিনিময়ে কলিকাতা, গোবিন্দপুর ও সুতানুটির গ্রাম তিনটি ক্রয় করে দূর্গ নির্মাণ শুরু করে এবং ১৭০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে দূর্গ নির্মাণ কাজ শেষ হয়। তৎকালীন ইংল্যান্ডের রাজা তৃতীয় উইলিয়ামের নামে উক্ত দূর্গের নাম রাখা হয় 'ফোর্ট উইলিয়াম দূর্গ'।[১০৩] এই ফোর্ট উইলিয়াম দূর্গই সরকারের বিরুদ্ধে এক গোপন ষড়যন্ত্রের আস্তানায় পরিণত হয়। অবশ্য পরে নবাব সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজদেরকে উক্ত দূর্গ ভেঙ্গে ফেলতে বাধ্য করেন। ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে ইংলিশ

---

[১০০] মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, বাংলার ইতিহাস, *ভারতে ইংরেজ রাজত্বের সূচনাপর্ব*, ১৬৯৮-১৭১৪ খ্রিস্টাব্দ, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৯, পৃ. ৬০।

[১০১] নজরুল ইসলাম, *বাংলায় হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক*, কলিকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রাইভেট লিমিটেড-১৪০২, পৃ. ১০৫।

[১০২] নজরুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৫।

[১০৩] Suranjan Chatterjee & Dr. Siddhartha Guha Ray, *History of Modern India, 1707-1857, Calcutta: Prograssive Publisher, 1997*, p.94.

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী শারমেনের নেতৃত্বে সম্রাট ফররুখশিয়ারের নিকট একটি প্রতিনিধি দল পাঠায় এবং এক ডেলিগেশান প্রেরণ করে। শারমেন সম্রাট ফররুখশিয়ারের নিকট থেকে অনেক বাণিজ্যিক সুবিধা লাভ করেন।[১০৪] এই ডেলিগেশন সম্রাটকে ত্রিশ হাজার পাউন্ড পেশকাশ বা পুরস্কার প্রদান করে বাংলা বাণিজ্যে কোম্পানীর জন্য বাড়তি সুযোগ সুবিধা প্রদানের জন্য আরজি পেশ করে। সম্রাট শারমেনের আরজি মঞ্জুর করে কোম্পানীকে অনেকগুলো নতুন সুযোগ সুবিধা ও অধিকার দিয়ে ১৭১৭ সালে একটি ফরমান জারি করেন। ফরমানে প্রদত্ত হয়—[১০৫]

১. বার্ষিক মাত্র তিন হাজার টাকার বিনিময়ে কোম্পানী হুগলিতে ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারবে।

২. কলিকাতা, সুতানুটি এবং গোবিন্দপুরের ইজারা অনুমোদন করা হয় এবং সুবার দেওয়ানের অনুমতি সাপেক্ষে শহরের আশেপাশে আটত্রিশটি গ্রাম কেনার অনুমতি দেওয়া হয়।

৩. মাদ্রাজের মুদ্রার মান সুরাটের মুদ্রার মত হলে বাংলায় বিনা টাকায় চালানোর অনুমোদন দেওয়া হয়।

৪. কুঠি প্রধানের ছাড়পত্র দেখালে নবাবের কর্মচারীরা তাদের মালামাল পরীক্ষা করবে না।

৫. অন্যান্য বণিকদের মুর্শিদাবাদের টাঁকশালে মুদ্রা নির্মাণের অনুমতি দিলে সরকারের স্বার্থ বিরোধী না হলে সুবাদার ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকেও সেই সুযোগ দিবে।

সে সময় বাংলার সুবাদার মুর্শিদকুলি খাঁন কোম্পানীর কাছে জমি বিক্রির ঘোর বিরোধী ছিলেন। নিরুপায় হয়ে কোম্পানী তার এ দেশীয় কর্মচারীদের নামে আশেপাশে কয়েকটি গ্রাম কিনে নেয়।[১০৬] ফলে কোম্পানীর অবস্থান শক্ত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যবসা বাণিজ্য বাড়ার সাথে সাথে তাদের প্রতিপত্তিও বাড়ে এবং নবাবের কর্মচারীদের সাথে তারা দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়। এভাবে বাংলায় ইংরেজদের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে তারা বাংলার রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। ইংরেজরা মীর জাফরের সাথে গোপন চুক্তি করে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করে বাংলাকে নিজেদের করায়ত্ত করতে সক্ষম হয়।[১০৭] তারা বাংলাকে নিজেদের করায়ত্ত করে ভারতবর্ষে ভবিষ্যৎ সাম্রাজ্য স্থাপনের পথ উন্মুক্ত করে। অবশ্য কিছুদিনের জন্য ওলন্দাজ ও ফরাসিরা ইংরেজদের কর্তৃত্ব বিস্তারের পথে বিরাট বাঁধার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত

---

[১০৪] Percival Spear, *The Nabobs: A study of the Social life the English in Eighteenth Century*, India, Oxford University Press, May 7, 1998, p. 21.

[১০৫] সুকুমার ভট্টাচার্য : *দি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এন্ড দি ইকনোমি অব বেঙ্গল*, ১৭০৪-১৭৪০, কলকাতা, ১৯৬৯।

[১০৬] নজরুল ইসলাম, *বাংলায় হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক*, কলিকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রাইভেট লিমিটেড-১৪০২, পৃ. ১০৫।

[১০৭] S.N. Sen. *History of Modern India. Third Edition* (New Delhi : New Age International P. Ltd. Publisher. 2006) p. 40.

তারা ইংরেজদের সাথে এঁটে উঠতে পারেনি। ১৭৫৯ সালে ওলন্দাজরা বিদারার যুদ্ধে ইংরেজদের সাথে শেষ বারের মত পরাজিত হয়।[১০৮]ফরাসি শক্তি বিপর্যস্ত হবার পর বাংলায় ইংরেজদের শক্তি বিস্তারে তেমন কোন প্রতিবন্ধকতার সন্মুখিন হতে হয়নি। তাদের শুধু বাংলা নয় কালক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষে নিরঙ্কুশ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সমগ্র ভারতের শাসন ক্ষমতা দুইশত বছরের জন্য নিয়ন্ত্রণ চলে যাওয়ার পথ সুগম হয়।

প্রাচীনকাল থেকে ইউরোপে মসলার চাহিদা ছিল। রান্নাবান্নায় মাংস সংরক্ষণ এবং রোগব্যাধি নিরাময়ের জন্য বিভিন্ন ঔষধ তৈরিতেও মসলার ব্যবহার হতো। ইউরোপে মসলার ব্যবহারের প্রচলন বেশি হয় রোমানদের সময়ে। স্বর্ণ ও রৌপ্যের ওজনে বিক্রি হতো গোলমরিচ ও আদা আর রোমে এগুলোর চাহিদা ছিল প্রচুর।[১০৯]

গোলমরিচ ও আদার গুড়া মিশিয়ে মাছ পরিবেশন করা রোমানদের ফ্যাশনে পরিণত হয়েছিল।[১১০]

মসলার ব্যবহার শুধু রোমেই সীমাবদ্ধ ছিলনা। অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রেও এর ব্যবহার ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারতীয় রাজ্যগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন ইন্দো-ইউরোপীয় প্রত্যক্ষ বাণিজ্যের দ্বার উন্মোচন করেছিল। মসলার প্রধান উৎপত্তিস্থল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজ্যগুলো। সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও, মলুককাস দ্বীপপুঞ্জ মসলা উৎপাদনের জন্য বরাবর খ্যাত ছিল। মালাবার উপকূলীয় রাজ্যগুলোতে ও মসলার চাষ হতো। মালাবার অঞ্চলে উৎপাদিত মসলা অপর্যাপ্ত হওয়ার কারণে ভারতীয় বণিকরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে মসলা সংগ্রহের জন্য যাতায়াত আরম্ভ করে। এভাবে ভারতীয়দের মাধ্যমে ইউরোপের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মসলা বাণিজ্যের সূত্রপাত ঘটে।

ইউরোপীয়দের মসলার চাহিদা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে আরব ও অন্যান্য মধ্যপ্রাচ্যের বণিকদের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মসলা সমৃদ্ধ রাষ্ট্রগুলোতে যাতায়াত বৃদ্ধি পায়। আরব বণিকদের অনেককে তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় গমন করতে দেখা যায়। কেউ কেউ সেখানে বিবাহ করে ঘরবাড়ি নির্মাণ করে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সম্পদ ও সমৃদ্ধির প্রধান উৎস ছিল মসলা। প্রাচীনকাল থেকে মালাবার অঞ্চলে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে মসলা উৎপন্ন হতো। মালাবারে গোলমরিচ, কালিকট ও এলি এলাকায় আদা উৎপন্ন

---

[১০৮] S.N. Sen. *History of Modern India. Third Edition* (New Delhi : New Age International P. Ltd. Publisher. 2006) p. 40.

[১০৯] Radha Kumud Mookerji, *Indian Shipping* (Bombay: Orient Longmans, 1957), p-87

[১১০] Donald F. Latch, *Asia in the making of Europe v-1* (Chicago: The University of Chicago, 1965) p-16

হতো। ইউরোপীয় বণিকরা প্রাচ্যের সংগ্রহ করা মসলা ভূমধ্যসাগরীয় পথে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করতো। এভাবে মসলা বাণিজ্য নামে অভিহিত হয় ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বৈদেশিক বাণিজ্য।

ইউরোপীয় জাতিগুলো মসলা ব্যবহারে এতটাই অভ্যস্ত হয়ে পড়ে যে কোনভাবেই এর ব্যবহার পরিত্যাগ করতে পারছিল না। অন্যদিকে ইউরোপীয় দেশগুলো মসলা বাণিজ্য থেকে প্রাপ্ত অত্যাধিক লভ্যাংশের কথা কোনভাবে ভুলতে পারছিল না। এজন্য মসলা বাণিজ্যের মুনাফা হতে বঞ্চিত হয়ে ইউরোপীয় দেশগুলো অস্বস্তিতে পড়ে যায়। মসলার চাহিদা এভাবেই ইউরোপীয়দের মসলা বাণিজ্যে অংশগ্রহণের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে এবং তাদের প্রাচ্যে আগমনের পটভূমি তৈরি করে।

কোম্পানীর উদ্দেশ্য ছিল যে, মালয় দ্বীপমালার মসলা, বিশেষ করে গোল মরিচ সংগ্রহ করত। প্রথম (১৬০১-০৩) এবং পরবর্তীতে (১৬০৪-৬) ভারতের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত মসলা দ্বীপ-মালার দিকে তাদের অভিযান শুরু হয়। ব্রিটিশ বাণিজ্যিক জাহাজ কোচিনে নোঙর করলে কোম্পানীর বণিকেরা লক্ষ্য করে যে, ঐ বন্দরে ভারতীয় জাহাজের সর্বাধিক আনাগোনার ফলে গোল মরিচের মূল্য অত্যাধিক চড়া ছিল। ইংরেজরা জাভার বান্টামে গোল মরিচের হ্রাসকৃত মূল্য দেখে ১৬০৩ সালে সেখানে একটি বাণিজ্যকুঠি নির্মাণ করে। কিন্তু মালয় দ্বীপপুঞ্জে ইংল্যান্ডে উৎপাদিত পণ্য-সম্ভার বিশেষ করে পশমী বস্ত্রের কোন সন্তোষজনক বাজার তাদের চোখে পড়ে না। তবে তারা লক্ষ্য করে যে, ভারতীয় সূতিবস্ত্রের বিনিময়ে সেখানে মসলা পাওয়া যায়।[১১১] ব্যবসায়ের এ গতি-প্রকৃতি কোম্পানীকে ভারতে পশমী বস্ত্রের বাজার খুঁজতে বাধ্য করে। কোম্পানী ইংল্যান্ডের পশমী বস্ত্রের বিনিময়ে ভারতীয় সূতিবস্ত্র সংগ্রহ করে ঐ পণ্যের বিনিময়ে মালয় দ্বীপপুঞ্জের মসলা সংগ্রহের লক্ষ্যে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হয়ে পড়ে।[১১২]

বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশগ্রহণের আকাঙ্ক্ষা পর্তুগিজ তথা অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিকে এদেশে আসতে অনুপ্রাণিত করেছিল। প্রাচীনকাল থেকে বাংলা ব্যবসা-বাণিজ্যে সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল।[১১৩] সুকুমার সেনের মতে, খ্রিষ্টীয় প্রথম পাঁচ-ছয় শতাব্দী কাল পর্যন্ত বাংলা ব্যবসা-বাণিজ্য নির্ভর ছিল।[১১৪]

---

[১১১] K. N. Chaudhury, প্রাগুক্ত, P. 14, Brian Harrison, *South East Asia : A short History*, (London 1966), p. 94.

[১১২] J. B. Harrison, *“The Portugues” in A. L. Basham*, ed-9th, A Cultural History of India, Delhi: Oxford University Press-1994, P. 94-96

[১১৩] *বাংলাপিডিয়া*, *ব্যবসা-বাণিজ্য*, *৭ম খণ্ড*, পৃ. ২৫০।

[১১৪] সুকুমার সেন, *বঙ্গ ভূমিকা*, খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০-১২৫০ খ্রিষ্টাব্দ, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৪০, পৃ. ২৭৯।

বহু সংখ্যক নদ-নদী থাকায় বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা ছিল। প্রাচীনকাল থেকে এদেশের লোক ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য যেমন বিদেশে যাত্রা করত অন্যদিকে বিদেশীরাও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য এদেশে আসত।

প্রাচীনকাল থেকে বাংলার সাথে ইউরোপীয়দের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল।[১১৫] খ্রিষ্টাপূর্ব চতুর্থ অব্দে গঙ্গা নদীপথে বাংলার বহির্বাণিজ্যের প্রমাণ পাওয়া যায়।[১১৬] পেরিপ্লাস অব দি এরিত্রিয়ানসি গ্রন্থে হতে জানা যায়, খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বাংলা থেকে দক্ষিণ ভারত ও সিংহলে তেজপাতা, স্পাইকেনার্ড (এক প্রকার ছোট ঔষধের গাছ), মুক্তা ও সূক্ষ্ম মসলিন রপ্তানি হতো।[১১৭] টলেমির গ্রন্থে খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে বাংলার বাণিজ্যিক সম্পর্কের সন্ধান পাওয়া যায়।[১১৮] মধ্যযুগে মুসলিম শাসনামলে বাংলার বাণিজ্যিক ঐতিহ্য বজায় থাকেনি বরং তা বহুগুনে বেড়ে যায় (১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে তুর্কি সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজি কর্তৃক নদীয়া বিজয়ের মাধ্যমে বাংলায় মুসলিম শাসন শুরু হয়)। চতুর্দশ শতকে ইবনে বতুতা বাংলা থেকে জাভাগামী চীনদেশীয় জাহাজে চেপে জলপথে যাত্রা করেন।[১১৯] এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বাংলার সঙ্গে চীন, বার্মা, মালয় ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাংলার প্রত্যক্ষ বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল।

চীনা রাষ্ট্রদূত হু-হয়েন এর রির্পোটের ভিত্তিতে ১৪৩৬ খ্রিষ্টাব্দের একটি বিবরণী হতে বাংলার ব্যাপক ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে জানা যায়। ডুয়ার্ত বারবোসা ষোড়শ শতকের প্রথমভাগে বাংলা পরিভ্রমণকালে বাংলার ব্যাপক বৈদেশিক বাণিজ্য লক্ষ্য করেন।[১২০] ষোড়শ শতকের শেষদিকে বাংলা পরিভ্রমণকারী ইংরেজ পর্যটক রাল্‌ফ ফিচ সোনারগাঁও বন্দরের বাণিজ্য উল্লেখ করে বলেন, এখানকার বণিকেরা বিভিন্ন প্রকার পণ্য-সামগ্রী নিয়ে সমগ্র ভারত, সিংহল, পেগু, মালাক্কা, সুমাত্রায় নিয়ে যেত।[১২১] বাংলার বাণিজ্যপণ্য ছিল মিহি সূতি কাপড়, সাহালা কম্বল, তুলোকিন সূতি কাপড়, স্ফটিক, অ্যাগেট, মুক্তা, দামি পাথর, চিনি, ঘি, মাছরাঙ্গা পাখির পালক এবং বিভিন্ন রঙের পর্দার কাপড়। চীন থেকে এদেশে আমদানি করা হতো সোনারূপা, স্যাটিন, রেশম, নীল, সাদা চিনামাটির জিনিস, তামা,

---

[১১৫] R.C. Majumdar, H.C. Raychaudhuri & Kalikinkar Datta, *An Advanced History of India* (London : Macmillan and Company Limited, 1963), P.553.

[১১৬] আব্দুল্লাহ ফারুক, *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪), পৃ. ৯৯।

[১১৭] আব্দুল্লাহ ফারুক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯।

[১১৮] *নীহাররঞ্জন রায়*, *বাঙালীর ইতিহাস*, আদিপর্ব ২য় সংস্করণ, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৪০২ বাং, পৃ. ১৫৭।

[১১৯] এইচ. এ. আর. গিব, *ইবনে বতুতার ভ্রমণ কাহিনী*, অনু: খুররম হোসাইন, টাঙ্গাইল: ক্যাবকো বিসিক শিল্প নগরী, ২০০০, পৃ. ১৬৫।

[১২০] ওয়াকিল আহমদ, *বাংলায় বিদেশী পর্যটক*, ৩য় সংস্করণ, ঢাকা: গ্লোব লাইব্রেরি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০০, পৃ. ৩৫।

[১২১] William Foster, *Early Travels in India,* LP Publications; New Ed Edition (August 1, 1999), p.18.

লোহা, কস্তরী, সিদুর, পারা এবং ঘাসের মাদুর।[১২২] বাংলার বণিকরা মসলা, মূল্যবান ধাতু, মুক্তা, সূতিবস্ত্র, রেশমবস্ত্র, স্বর্ণ, হাতির দাঁত ইত্যাদি নিয়ে পারস্যের হুরমুজ বন্দরে জাহাজ ভিড়ালে স্থানীয় বণিকগণ সেসব পণ্যদ্রব্য তাদের কাছ থেকে ক্রয় করত।[১২৩]

ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে বাণিজ্যের দিক দিয়ে বাংলায় একটি বড় রকমের পরিবর্তন আসে। মোগল শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রথম ১০০ বছরে (১৫৭৬-১৬৭৫ খ্রিষ্টাব্দ) বাংলা অঞ্চলের সাথে বহির্বিশ্বের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়।[১২৪] ইউরোপীয়দের আগমনের প্রাক্কালে প্রাচ্যে যে সকল বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল তার মধ্যে লোহিত সাগরীয় এডেন, পারস্য উপসাগরীয় হুরমুজ, পশ্চিম বাণিজ্যকেন্দ্র উল্লেখযোগ্য।[১২৫] বাঙালিদের পাশাপাশি, পূর্ব ভারতীয় বাঙালিদের গুজরাটী, মাড়োয়ারী, ভোজপুরী, আর্মেনীয়, মির্জাপুর, বেনারসী, গোরখপুরী, লাহোরী, মুলতানী, কাশ্মীরী, প্রভৃতি জাতি এদেশীয় বাণিজ্যে অংশ নিত। বাংলার উল্লেখিত বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি ইউরোপীয় বণিকদের ভীষণভাবে আকৃষ্ট করে। বাংলায় বাণিজ্যিক পণ্যের প্রাচুর্যতা ও সহজলভ্যতার মুগ্ধ হয়ে ইউরোপীয় বণিকরা বাংলা-বাণিজ্যে অংশগ্রহণের আকাঙ্ক্ষায় এ দেশে আগমন করে।

ইংরেজ বণিকদের বাংলায় আগমন ভারতীয় উপমহাদেশ তথা বিশ্ব ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা ছিল। পর্তুগিজ ও ওলন্দাজদের পর ইংরেজরা বাংলায় আগমন করে। ইংরেজরা মূলত পর্তুগীজদের সাফল্যজনক নৌ-অভিযান ও সমুদ্র বাণিজ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রাচ্যের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে উৎসাহী হয়।

ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রথমে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দিকে মনোনিবেশ করে। ইংরেজরা প্রথমে বান্টামে একটি বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করে। কিন্তু ওলন্দাজদের বিরোধিতার মুখে তারা মসলা দ্বীপাঞ্চল থেকে বিতাড়িত হয়। ১৬০৮ খ্রিস্টাদে ক্যাপ্টেন ইউলিয়াম হকিন্স ইংরেজ রাজা প্রথম জেমসের নিকট থেকে ভারতে মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে উপনিত হয়ে সুরাট বন্দরে একটি বাণিজ্যকুঠি নির্মাণের অনুমতি লাভ করেন। ১৬১৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সুরাট, আগ্রা, আহমাদাবাদ, ব্রোচ, প্রভৃতি জায়গায় ইংরেজদের বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত হয়।[১২৬] ঐ সময় বাংলায় বাণিজ্যিক পণ্যের প্রাচুর্য্যতা ও

---

[১২২] অসীম কুমার রায়, *বঙ্গ বৃত্তান্ত*, *বিদেশী পর্যটকদের লেখায় বাংলার কথা*, পঞ্চম থেকে সপ্তদশ শতাব্দী (ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ, ২০০৮) পৃ. ১১৭।

[১২৩] এস ঘোষ, *প্রাচীন ভারতে অর্থনৈতিক ইতিহাস*, কলিকাতা: জে. এন. ঘোষ এন্ড সন্স, ১৯৯৫, পৃ. ৪৯।

[১২৪] আব্দুল্লাহ ফারুক, *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪), পৃ. ১০৫।

[১২৫] ইমতিয়াজ আহমেদ, *দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পর্তুগিজ বাণিজ্য*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি-২০০৮, পৃ. ১০৫।

[১২৬] Suranjan Chatterjee & Dr. Siddhartha Guha Ray, *History of Modern India, 1707-1857, Calcutta: Prograssive Publisher, 1997,* p. 93-94.

সহজলভ্যতার কারণে ইংরেজ বণিকরা বাংলা বাণিজ্যে অংশগ্রহণের চেষ্টা করতে থাকে। অবশেষে ১৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলার হরিহরপুরে প্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের মাধ্যমে তাদের সে প্রচেষ্টাকে সফল করে।

বাংলায় পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ইংরেজরা ছাড়াও ফরাসি, ডেনিস, অস্টেণ্ড, অস্টিয়ান এবং সুইডিস প্রমুখ ইউরোপীয় কোম্পানীর আগমন ঘটে। বাংলার সমুদ্র-বাণিজ্যে অংশগ্রহণকারী জাতিগুলোর মধ্যে ফরাসিদের ভূমিকা ছিল ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী। পর্তুগিজ, ওলন্দাজ ও ইংরেজদের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে ফরাসি বণিকগণ ভারতবর্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে আগমণ করেন। ফরাসি সম্রাট চতুর্দশ লুই এর রাজত্বকালে ফরাসি সরকারের অর্থ সচিব কোলবার্ট ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী গঠন করেন।[১২৭] উক্ত শতাব্দীর মধ্যেই তারা বাংলার সমুদ্র-বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতামূলক বাংলার সমুদ্র-বাণিজ্যে টিকে থাকার জন্য সম্রাট এই কোম্পানীকে পর্যাপ্ত অর্থ ঋণ দান করেন।

১৬৬৮ খ্রিস্টাব্দে ফ্রাঁসোয়া ক্যারো সর্বপ্রথম সুরাটে ফরাসিদের একটি বাণিজ্য কুঠি প্রতিষ্ঠা করেন।[১২৮] পরের বছর মারকারা মসলিপট্টমে অপর একটি কুঠি স্থাপন করেন। ১৬৭৩ খ্রিস্টাব্দে ফ্রাঁসোয়া মার্টিন লেসপিনে পন্ডিচেরী নামক একটি ফরাসি উপনিবেশ স্থাপন করেন। ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দে নবাব শায়েস্তা খান ফরাসিদের বাংলার চন্দননগরে একটি বাণিজ্য-কুঠি নির্মাণের অনুমতি দেন।[১২৯] ফরাসি বণিকরা ১৬৮২ খ্রিস্টাব্দে তাদের নৌকাসহ সর্বপ্রথম ঢাকায় পৌঁছে। তারা ঢাকার তেজগাঁও ও বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করে। এভাবে ফরাসি বণিকরা বাংলায় প্রবেশ করে। ১৬৯০-১৬৯২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে চন্দননগরে ফরাসিদের কুঠি একটি শক্তিশালী সুরক্ষিত কুঠিতে পরিণত হয়।[১৩০]

মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁকে সুরাটে বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের অনুমতি প্রদান করে।[১৩১] আগ্রায় মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁকে সম্মানের সাথে গ্রহণ করেন এবং সুরাটে বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের অনুমতি প্রদান

---

[১২৭] Nilmani Mukherjee, *The Port of Calcutta, A Short History* (Calcutta: The Commissioners of the port of Calcutta, 1968), p. 19.

[১২৮] Suranjan Chatterjee & Dr. Siddhartha Guha Ray, *History of Modern India, 1707-1857, Calcutta: Prograssive Publisher, 1997*,p. 95.

[১২৯] Suranjan Chatterjee & Dr. Siddhartha Guha Ray, Ibid,, p. 95.

[১৩০] ড. আবদুল করিম, *মোগল রাজধানী ঢাকা*, অনু. ড. মোহাম্মদ মুহিবুল্লাহ ছিদ্দিকী, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৩, পৃ. ৫৮।

[১৩১] Karl de Jr. Schweinitz, *The Rise and Fall of Briths India*, (London and New York, 1983), p. 78.

করেন। উইলিয়াম ফিন্স ইংল্যান্ডে কর্তৃপক্ষকে জানান যে, যেখানে বাকতা, সেরিবাফ আফ্রিকার বাজারে এবং উৎকৃষ্ট সূতিবস্ত্র ইউরোপ, জঙ্গে ও সুমাত্রার বাজারে বিক্রি হবে।[১৩২]

কিন্তু দেশীয় বণিকদের অসহযোগিতার ফলে ফিন্সের এ আশা-ভরসা তখনকার মত অপূর্ণই থেকে যায়। পর্তুগীজদের প্ররোচনায় সুরাটের দেশীয় বণিকেরা মুঘল দরবারে অভিযোগ করে যে, ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসা করতে গেলে পর্তুগীজদের সঙ্গে ভারতীয়দের বাণিজ্যিক সম্পর্কের অবনতি ঘটবে যা ভারতীয় বণিকদের এবং সুরাট বন্দদের জন্য ক্ষতিকর হবে।[১৩৩] এ অভিযোগের প্রেক্ষিতে সম্রাট তাঁর অনুমতিপত্র বাতিল করেন। এভাবে সুরাটে কোম্পানীর বাণিজ্য কুঠি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা আপাতত ব্যর্থ হয়। পরবর্তীকালে দুটি ঘটনায় ভারতীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও বণিকদের চোখে কোম্পানীর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এবং আকাঙ্ক্ষিত বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের পথ প্রশস্ত হয়।

হেনরী মিড্লটন লোহিত সাগরে ভারতীয় বণিকদের ১৬১০ সালে বাণিজ্যবহর সাফল্যজনক ভাবে অবরোধ করেন এবং ১৬১২ সালে ক্যাপ্টেন বেস্ট সুরাটের সোয়েলী খালে একটি সুসজ্জিত পর্তুগীজ স্কোয়ার্ডন সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করেন। এ ঘটনাগুলো ইংরেজদের শক্তিমত্তার সঙ্গে ভারতীয়দের পরিচিত করে তোলে। ফলে মুঘল কর্মকর্তা ও দেশীয় বণিকদের মন থেকে পর্তুগীজ ভীতি দূরীভূত হয়। ১৬১৩ সালে সুরাট কর্তৃপক্ষের সাথে গঠিত চুক্তি সম্রাটের অনুমতি লাভ করে। সে বছরই সুরাটে একটি বাণিজ্য কুঠি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কোম্পনির স্বার্থ দেখাশোনার জন্য একজন প্রতিনিধি রাখার ব্যবস্থাও পাকাপোক্ত হয়।[১৩৪]

ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৬২৫ সালে টমাস রোকে সম্রাটের কাছ থেকে ফরমান সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করেছিল যাতে ইংরেজদের সাথে বাংলার বাণিজ্যিক যোগাযোগ স্থাপন করা যায়। কিন্তু টমাস রো রাজী হয়েও পর্তুগীজদের ভয়ে সমুদ্র পথ বাদ দিয়ে স্থলপথে আগ্রা হয়ে সুরাটের সঙ্গে বঙ্গীয় বাণিজ্য পরিচালনা করতে চান। কিন্তু সুরাটের কুঠিয়ালরা ভিন্ন মত পোষণ করেন। কিন্তু সুরাট কাউন্সিল বাংলার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন, হুগলিতে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন ও হুগলীতে

---

[১৩২] Anjali Chatterjee, *Bengal in the Reign of Auranzeb*, 1658-1707, (Calcutta, 1967), p. 106-107.
[১৩৩] H.H. Dodwell, *The Cambridge History of India*, Vol. V (Cambridge, 1920), p. 39.
[১৩৪] H.H. Dodwell, Ibid, p. 39.

বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের পরিকল্পনার প্রস্তাব কোম্পানীর নিকট পেশ করেন এবং তারা কিছু জাহাজের আবেদন জানায় হুগলী নদীতে চলাচল করার জন্য।[১৩৫]

হুগলী ও পিপলী সম্পর্কে টমাস রো খুব একটা ভাল ধারণা পোষণ করেননি। তবে বাংলায় বাণিজ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন এবং এজন্য তিনি ফরমান লাভের চেষ্টায় ছিলেন। তবে আসফ খানের প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পরেও কোন ফরমান সংগ্রহ করতে পারেনি। অবশেষে টমাস রো কোর্ট-অব-ডিরেক্টরকে লিখিত পাঠান যে বাংলায় কোন বন্দর নেই, দু-একটি যা আছে তাও পর্তুগীজদের দখলে এবং ঐগুলো দিয়ে খুব বেশি প্রয়োজন মেটবে না।[১৩৬]

এভাবে টমাস রো এর মাধ্যমে বাংলায় ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যে অংশগ্রহণের চেষ্টা নেতিবাচক রূপ ধারণ করে। তবে ওলন্দাজদের ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে তৎপরতার কারণে ইংরেজরা আবার বাণিজ্যে অংশগ্রহণের তৎপর হয়। ওলন্দাজ বণিকরা মসলা দ্বীপমালায় নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করে ইংরেজ বণিকদের প্রতিষ্ঠার পথে নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমস্ ১৬১৯ সালে ওলন্দাজ ও ইংরেজদের মধ্যে একটি চুক্তি করেন।[১৩৭] এই চুক্তি বলে উভয় দেশই প্রাচ্যে বাণিজ্য করার সুবিধা পায়। কিন্তু ইংরেজরা যখন এলাচ, লবঙ্গ প্রভৃতি মূল্যবান বাণিজ্যিক পণ্য ক্রয়ের প্রতি ঝুঁকে পড়ে তখন ওলন্দাজরা ইংরেজদের ব্যবসা বন্ধ করার জন্য নানা-রকম অভিযোগ উত্থাপন করে। ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ইউরোপের বাজারে গোলমরিচের মন্দাভাবের জন্যই[১৩৮] মালয় দ্বীপমালা থেকে এলাচি, লবঙ্গ আরও অন্যান্য পণ্য পণ্য-সামগ্রী এনে ইউরোপ ও এশিয়ার অন্যত্র মুনাফা করার চেষ্টাতে লিপ্ত হয়। সুরাট হতে আগ্রা-পাটনা হয়ে বাংলার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনে কোম্পানী ব্যর্থ হয়। কিন্তু করমন্ডল উপকূলে কোম্পানীর মসুলিপত্তমের কুঠিয়ালদের মাধ্যমে প্রচেষ্টা সম্ভব হয়। মালাবার উপকূলে ইংরেজ কোম্পানী পর্তুগীজদের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিল কিন্তু করমন্ডল উপকূলে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইংরেজরা ওলন্দাজদেরও বিরোধিতার স্বীকার হয়।

---

[১৩৫] William Foster, *Early Travels in India,* 1583-1619, New Delhi Oriental: Books Reprint Carporation-1985, p. 298-299.

[১৩৬] William Foster, Ibid, p.385

[১৩৭] Harrison, প্রাগুক্ত, p. 100, Tripta Desai, *The East India Company* : a brief-survey form 1599 to 1857 (New Deilhi), p. 105.

[১৩৮] K. N. Chaudhuri, *The Trading world of Asia and the English East India Company*; 1660-1760, Cambridge-1978, P. 79.

১৬৩৪ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী সুরাট কাউন্সিলের এক পত্রের উপর ভিত্তি করে জন ব্রুস দাবী করেন যে ঐ বছরের গোড়ার দিকে কোম্পানীকে প্রদত্ত সম্রাট শাহজাহানের এক ফরমান বলে ইংরেজরা বাংলায় অভিযাত্রা প্রেরণ করেছিল।[১৩৯]

অন্যদিকে আলেকজান্ডার হ্যামিলটন দাবী করেছিলেন পিপলীতে ইংরেজ ও ওলন্দাজদের বাণিজ্য কুঠি ছিল, পরে হুগলী ও কলকাতার বাণিজ্য কুঠি প্রতিষ্ঠার ফলে সেটির গুরুত্ব কমে যায়।[১৪০] তাই বলা হয়ে থাকে ১৬৩৪ সালের শাহজাহানের ফরমান অথবা গোলকুন্ডার সুলতানের স্বর্ণপত্র সনদ কোনটিই সম্ভবতঃ ইংরেজদের বঙ্গ অভিযানে শক্তি বা উৎসাহ যোগায়নি। ইংরেজদের বাংলা অভিযানের পিছনে অন্য কারণ সক্রিয় ছিল। ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সোরা সংগ্রহের জন্য বঙ্গের প্রধান বন্দর হুগলীতে কুঠি নির্মাণ করে।

কোম্পানীর বাংলা বাণিজ্যে অংশগ্রহণে সে মুহূর্তে পর্তুগীজদের বিরোধিতা মোটেই ছিলনা। ১৬৩৬ সালে ভারতে পর্তুগীজ ভাইসরয় ও ইংরেজদের সুরাট কাউন্সিলের প্রেসিডেন্টের মধ্যে এক মৈত্রী চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল এবং পর্তুগীজ বন্দরগুলো ইংরেজ বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত ঘোষিত হয়েছিল।[১৪১]

১৬৪২-৪৯ সালে ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধের সময় কোম্পানীর চার্টারসহ ঐ ধরনের সকল চার্টার বাতিল করা হয়। ১৬৪৬ সালে পার্লামেন্ট, ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে একটি চার্টার দিতে রাজী হলেও লর্ড সভা সেটি গ্রহণ করেনা। ১৬৪৯ সালে লর্ড সভা বাতিল হলেও কোম্পানীর দূর্যোগ কাটেনা এবং কোম্পানী নতুন চার্টার সংগ্রহে ব্যর্থ হয়। কোর্টিজ সংস্থা ছাড়াও লেভেলার ও পিউরিটানরা কোম্পানীর বিরুদ্ধে দন্ডায়মান হয়। ভারতে কোম্পানীর ব্যবসা বাণিজ্য সম্পূর্ণ ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করার জন্যই বাংলায় বাণিজ্যের উন্নয়ন সাধনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গোলা বারুদ তৈরীতে সোরা ছিল অন্যতম প্রয়োজনীয় উপাদান, আর বিহারের সোরা ছিল সর্বোৎকৃষ্ট মানের।[১৪২] কোম্পানীর পক্ষ থেকে আশা করা হয় যে, ইংরেজ সার্জন জীবরিল বাউটন যিনি সম্রাট শাহাজাহান দুহিতা জাহানারাকে অগ্নিদগ্ধজনিত মারাত্মক অসুখ থেকে মুক্ত করেন, তিনি ইংরেজদেরকে বঙ্গীয় বাণিজ্যে মুঘলদের

---

[১৩৯] ১৬৩৪ সালে ২১ শে ফেব্রুয়ারিতে কোর্ট অব কমিটিকে লিখিত সুরাট কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম মেথলডের পত্রে ঐ ফরমানের উল্লেখ পাওয়া যায়। জনব্রুস ঐ পত্রের উপর ভিত্তি করে দাবী করেন যে, সম্রাট শাহজাহানের ফরমান বলেই কোম্পানী বঙ্গ অভিযাত্রার পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু উইলিয়াম ফস্টার মনে করেন যে, ফরমানটি সত্যই দেওয়া হয়েছিল তবে সেটা প্রকৃতপক্ষে ব্যবহৃত হয়নি। দেখুনঃ Johin Bruce : Annals of the East india Company, Vol. 1, (London, 1810), p. 98. william Forster (ed) : The English Factories in India 1634-36, XXXVI.

[১৪০] Alexander Hamilton, *A new accounts of the East Indies (ed), by william Foster*, (London, 1930), p. 38.

[১৪১] H.H. Dodwell, *The Cambridge History of India*, Vol. V (Cambridge, 1920), p. 42.

[১৪২] S N Sen (ed), *Indian Travels of Thevenot and Careri* (New Delhi, 1949), p. 74.

পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়ে দিতে সক্ষম হবেন। বলা হয়ে থাকে যে, জিবরীল বাউটনের সহায়তায় ব্রিজম্যান শাহ সুজার অনুমতি লাভ করেন এবং ১৬৫১ সালের প্রথম দিকে হুগলীতে কোম্পানীর বাণিজ্য কুঠি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৬৫১ ও ১৬৫৬ সালে দুটি নিশানের মাধ্যমে শাহ সুজা ইংরেজদেরকে বঙ্গে শুল্কমুক্ত অবাধ বাণিজ্য পরিচালনার সুবিধা প্রদান করেন।[১৪৩] প্রফেসর সুশীল চৌধুরীর মন্তব্য এই যে, হুগলীতে কোম্পানীর কুঠি নির্মাণে অর্থাৎ বঙ্গীয় বাণিজ্যে কোম্পানীর অংশগ্রহণে মুঘল প্রশাসনের ভূমিকা ছিল। হুগলীকে কেন্দ্র করে কাশিম বাজার, পাটনা, ঢাকা, মালদহ প্রভৃতি বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে কুঠি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও কোম্পানীর অবস্থান তখন মজবুত হয়েছিল বলে বঙ্গীয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তার প্রতিফলন ঘটেছিল। ক্রোমওয়েল ১৬৫৭ সালে কোম্পানীকে একটি নতুন চার্টার প্রদান করেন। এ চার্টারের শর্তানুসারে কোম্পানী তখন সত্যিকারের জয়েন্ট স্টক কোম্পানী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

প্রাচ্যে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আগমনের প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আরো একটি বিষয় নিয়ে আলোচনার প্রসঙ্গ উঠে আসে সেটি হল ইউরোপীয় রেঁনেসার প্রভাব। "রেনেসাঁ" ফরাসি শব্দ। এটি সাধারণ ভাবে বুঝায় নব জন্ম, পুর্নজন্ম বা পুর্ণজাগরণ। প্রাচীন গ্রিক ও রোমান সভ্যতার পতনের পর ইউরোপে সাহিত্য, কবিতা, চিত্রকলা, বিজ্ঞান-চর্চা, শিল্প ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে একসময় অন্ধকার নেমে আসে এই অন্ধকারময় অবস্থা থেকে উত্তরণের সময় বা কাল কে রেনেসাঁ বলে। ডক্টর কিরণচন্দ্র চৌধুরী বলেন, চর্তুদশ শতাব্দী হতে প্রাচীন গ্রিক ও ল্যাটিন সাহিত্য ও শিল্পের পুর্নভ্যূদয়ের প্রভাবে ইউরোপীয় সাহিত্য ও শিল্পের যে নবজীবন লাভ ঘটে তাই রেনেসাঁ।[১৪৪]

Encyclopedia of Britannica-তে রেনেসাঁ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, মধ্যযুগীয় ইউরোপের প্রচলিত রীতিনীতি থেকে দ্রুত উত্তরণের জন্য প্রাচীন গ্রিক ও রোমান শিক্ষাদীক্ষা ও মানবিক মূল্যবোধ পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে যে বুদ্ধিবৃত্তিক পুনর্জন্ম বা নবজাগরণ ঘটে তাই রেনেসাঁ। এই নব উত্থান শুধু ল্যাটিন বা গ্রিক সাহিত্যে প্রচলিত ছিলনা। এর মাধ্যমে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি হয় সমাজে, রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে, বিজ্ঞানে, ভূগোলে, ভাস্কর্য ও ললিত কলা এর মাধ্যমে মানব সভ্যতার ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব, ফরাসি দেশে ফরাসি বিপ্লব এবং জার্মানিতে রিফরমেশন ভিন্ন ভিন্ন নামে মানব সভ্যতার ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা যোগ করে ইতিহাসের পাতায় 'রেনেসাঁ' উৎপত্তি নিয়ে আলোচনা করতে

---

[১৪৩] Hedges Diary, *The Diary of William Hedges*, Esq, Afterwards Sir william Hedges, During his agency in Bengal: As well as on his voyage out and return overland, 1681-1697, p. 184-186

[১৪৪] কিরণ চন্দ্র চৌধুরী, *আধুনিক ইউরোপ*, ১৪৫৩-১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দ, তয় সাং. (কলিকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা. লি. ১৯৯৭) পৃ. ১২.

গেলে ইটালির কথা উঠে আসে। ইউরোপের অন্যান্য দেশের মধ্যে ইটালিতেই অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা, গণতন্ত্র, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, জীবনবাদী মানবতা প্রভৃতি প্রয়োজন দেখা দেয়। ব্যবসা-বাণিজ্য ও পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের মাধ্যমে ইটালির শহরগুলো তখন অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

রেনেসাঁর পথ প্রদর্শকদের অধিকাংশ ইটালির হওয়ায় এখানে রেনেসাঁ তৈরীর অগ্রিম এক উপযুক্ত পরিবেশের সৃষ্টি হয়। সাহিত্য সংস্কৃতি ও শিল্পকলা প্রভৃতি প্রতিটি বিষয় থেকেই ইটালি তখন প্রতিভাবান ব্যক্তিদের জন্মস্থানে পরিণত হয়েছিল। লিওনার্দো দ্যা-ভিঞ্চি, র‍্যাফেল, মাইকেল এ্যাঞ্জোলো প্রমুখ শিল্পীগণ ইটালির অধিবাসী।

এভাবে রেনেসাঁ আত্মশুদ্ধির ন্যায় সমগ্র ইউরোপকে ক্রমান্বয়ে প্রভাবিত করেছিল। রেনেসাঁর ফলাফল নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় এর মাধ্যমে মানুষের স্বাধীন চিন্তা শক্তি, আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি ও বিভিন্ন সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি মেলায়।

এর প্রভাবে শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি মানবকূলের আগ্রহের মাত্রা যোগ হয়। রেনেসাঁর ফলে দেশীয় ভাষায় লেখাপড়া, সাহিত্যচর্চা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুশীলনের প্রতি মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। দেশীয় ভাষায় সাহিত্য রচনা এ জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা শুরু হলে তাতে সাধারণ মানুষের সম্পৃক্ততা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। প্রাচীন যুগের অজ্ঞাত ইতিহাস রচনার দ্বার উন্মুক্ত হয়। আমেরিকা, ব্যাবিলন, মিশর ও অন্যান্য দেশের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা যায়। লরেনশিয়াস ভ্যালা (১৪০৭-১৪৫৭) নামক একজন বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রাচীন চিহ্নাদি রেনেসাঁর শুরুতেই কম্পাস, সমুদ্রের মানচিত্র, তালিকা আবিস্কৃত হয়।

এশিয়ার দেশগুলোতে ইউরোপীয়দের আগমনের পূর্বে মূল পটভূমি তৈরি করে এই রেনেসাঁর প্রভাব। প্রাচীনকাল থেকে ইউরোপীয়রা ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মসলা, সুগন্ধি কাঠ, মসলিন ও সূতিবস্ত্র, চিনি, নীলকান্ত জাতীয় প্রভৃতি মূল্যবান পণ্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল। ক্রুসেড চলাকালীন সময়ে মধ্যপ্রাচ্যের জেরুজালেম, এন্টিয়ক, আলেপ্পো প্রভৃতি মুসলিম নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্রে আগমনের সুবাদে প্রাচ্যের বিভিন্ন পণ্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল। চীন ভ্রমণকারী ভেনেসীয় পর্যটক মার্কো পোলের বিবরণী পাঠে ইউরোপীয়রা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সম্পদ, সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্য সম্পর্কে অবগত হয়ে অভিভূত হয়ে পড়ে এবং এই অঞ্চলে আসতে প্রলুব্ধ হয়।

এশিয়ার দেশসমূহ এবং ইউরোপের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনকারী পশ্চিম এশিয়া ও মধ্য এশিয়ার স্থলপথে মুসলমানদের আধিপত্য থাকায় ইউরোপীয়দের প্রাচ্যে আসার যে মনোবাসনা ছিল তা ব্যর্থ হয়। মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায় ছিল সমুদ্রপথ। কিন্তু তাদের জ্ঞানের অভাব ও উপকরণাদির অভাবে তারা বিশাল সমুদ্রপথে পাড়ি জমাতে পারে না এবং তাদের প্রাচ্যে গমনের অভিলাষ অপূর্ণ থেকে যায়। এমতাবস্থায় রেনেসাঁর প্রভাবে তারা প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণ, উপকরণাদির মাধ্যমে সমুদ্রপথে ভ্রমণের কায়দা রপ্ত করতে পারে এবং প্রাচ্যে আগমনের দ্বার উন্মুক্ত হয়।

রেনেসাঁর প্রভাবে দিক নির্ণয় যন্ত্রের আবিষ্কার, সমুদ্রের মানচিত্র অংকন, পৃথিবী গোলক বছরে এ সত্য ধারণা প্রভৃতি সমুদ্রযাত্রার প্রতি ইউরোপীয়দের আগ্রহ ভীষণভাবে বৃদ্ধি করে। সমুদ্রযাত্রা আগের চেয়ে নিরাপদ ও সহজ হয়ে উঠলে নতুন নতুন দেশ আবিষ্কার করা, ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ, ঔপনিবেশ স্থাপন ও পণ্যের বাজার সৃষ্টি প্রভৃতির লক্ষ্যে ইউরোপীয়রা সমুদ্রযাত্রার এক তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়। তারা দূরপাল্লার পথ অতিক্রমের জন্য শক্তিশালী জাহাজ নিয়ে প্রাচ্যের মসলাসমৃদ্ধ দেশগুলোতে আসার চেষ্টায় লিপ্ত হয়। পর্তুগীজদের সমুদ্র যাত্রা এবং নতুন নতুন দেশ আবিস্কারে পর্তুগালের যুবরাজ হেনরী দ্য নেভিগেটর (Prince Henry the Navigator) (১৩৯৪-১৪৬০) অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। আইবেরীয় উপদ্বীপ থেকে আফ্রিকার বিভিন্ন উপকূলীয় দেশে আশ্রয় গ্রহণকারী মুসলমানদের খুঁজে বের করা। মুসলিম শাসিত আফ্রিকার উপকূলীয় দেশগুলো দখল করা এবং প্রাচ্যের মসলার দ্বীপ বলে খ্যাত পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে আগমনের জলপথ আবিষ্কার করা হেনরীর প্রধান লক্ষ্য ছিল। মার্কোপোলোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠে প্রাচ্য দেশে পৌঁছাবার সমুদ্রপথ আবিষ্কার করার জন্য হেনরী বিশেষভাবে আগ্রহী হয়েছিলেন। ১৪১৫ খ্রিঃ হেনরীর নেতৃত্বে মুসলিম শাসিত সিউটা অধিকৃত হলে সমুদ্র অভিযান ও প্রাচ্য গমনের ব্যাপারে তিনি ভীষণভাবে উৎসাহিত হন।

হেনরীর অনুপ্রেরণায় ১৪৩৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৪৬০ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত পর্তুগালের নাবিকগণ প্রাচ্য দেশে পৌঁছাবার সমুদ্রপথ আবিষ্কারের চেষ্টায় লিপ্ত থাকে। এই প্রচেষ্টারই অংশ হিসেবে ১৪৩৩ সালে অ্যাজোরস দ্বীপপুঞ্জ (Azores), ১৪৩৪ খ্রিষ্টাব্দে বোজাডোর অন্তরীপ (Cape Bojador) এবং ১৪৩৬ সালে রাইয়ো দি ওরো (Roide Oro) আবিষ্কার করে। ১৪৩৭ সালে হেনরী দেশ আবিষ্কারের ধারাবাহিকতায় ভাগ্য নির্ণয় করে তানজিয়ার দখলের চেষ্টা করে। ১৪৪৪ খ্রিঃ হেনরীর

জাহাজ কেপ ভার্দ দ্বীপপুঞ্জে (Cape verde Islands) পৌঁছে। অবশ্য হেনরী জীবিত অবস্থায় পর্তুগিজদের পক্ষে ভারতীয় জলপথ আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি।

হেনরীর মৃত্যুর পর ভারতীয় জলপথ আবিষ্কারের প্রচেষ্টা থেমে থাকেনি। ১৪৮৭ খ্রিঃ বার্থলোমিউ দিয়াজ (Bartholomell Dias) নামক জনৈক পর্তুগিজ নাবিক পূর্বসূরিদের পথ অনুসরণ করে আফ্রিকার দক্ষিণ সীমালগ্ন সমুদ্র পথে উপনীত হন। দিয়াজ ঝটিকায় তাড়িত হয়ে আফ্রিকার দক্ষিণ ভাগ অতিক্রম করেন বলে ঐ অন্তরীপকে 'ঝড়ের অন্তরীপ' (Cape of Storm) নামে অভিহিত করেন। পর্তুগালের রাজা দ্বিতীয় জন (King jhon II) সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হয়ে ভারত বাণিজ্য পথের প্রবেশদ্বার মনে করে এই অন্তরীপকে উত্তমাশা অন্তরীপ (Cape of good hope) নামে নামকরণ করেন।

পর্তুগিজদের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে স্পেনের রাণি ইসাবেলাও (Issabela) ভারতের জলপথ আবিষ্কারে অনুপ্রাণিত হয়ে জেনোয়ার নাবিক কলম্বাস (Columbus) কে এই কাজে নিযুক্ত করেন। কলম্বাস তিনটি জাহাজ ও প্রয়োজনীয় রসদপত্র নিয়ে প্রাচ্য পৌঁছাবার নিমিত্তে যাত্রা করেন। কলম্বাস মনে করেছিলেন যে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করে চীনে পৌঁছাতে পারবেন। ইতিপূর্বে মার্কোপোলো স্থলপথে পূর্বাভিমুখে অগ্রসর হয়ে চীন দেশে এসে সমুদ্রতীরে উপনীত হয়েছিলেন। পর্তুগালে এসে স্থলভাগের শেষ এবং মহাসাগরের আরম্ভ লক্ষ করে কলম্বাস ভেবেছিলেন যে, পর্তুগাল হতে পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হতে পারলেই প্রাচ্য রাজ্যে উপনীত হতে পারবেন। প্রায় পঁয়ত্রিশ দিন সমুদ্রপথ অতিক্রম করার পর তিনি বাহামা দ্বীপপুঞ্জ এসে উপস্থিত হন। সেখানে গমন করার পর তাঁর ধারণা হয় তিনি ভারতবর্ষে পৌঁছেছেন। পরে তিনি বুঝতে পারেন যে তাঁর ভুল হচ্ছে এবং এ ঘটনা ইতিহাসে স্থান দখল করে নেয় এজন্য পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হিসেবে আজও বাহামা দ্বীপপুঞ্জ পরিচিত।

কলম্বাস এর পূর্বে আরো তিনবার প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে প্রাচ্য গমনের চেষ্টা করেন। কিন্তু আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করে যে চীন তথা প্রাচ্যে পৌঁছানো অসম্ভব এটা তিনি জীবিত অবস্থায় উপলব্ধি করতে পারেননি। এদিকে কলম্বাসের প্রাথমিক সাফল্যে পর্তুগিজরা বিচলিত হয়ে উঠে। অনতিবিলম্বে স্পেনের করতলগত হয়ে যাবে সেই আশঙ্কা পর্তুগালে প্রবলতর হতে থাকে। আফ্রিকা

অতিক্রম করে ভারতবর্ষে উপনীত হওয়ার জলপথ শীঘ্র আবিষ্কৃত না হলে ভারত বাণিজ্য যে অনতিবিলম্বে স্পেনের কাছে চলে যাবে সেই সম্ভাবনা পর্তুগালে প্রবলতর হতে থাকে।[১৪৫]

পর্তুগালের রাজা বার্থলোমিউ দিয়াজের ভারতে গমনের জলপথ আবিষ্কারের অসমাপ্ত কার্য সম্পন্ন করার দায়িত্ব দেন পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামার (Vasco da Gama) উপর। গামা নতুন জলপথ আবিষ্কারের উচ্চাশা নিয়ে ১৪৯৭ সালে ৮ জুলই তাগুস নদীর তীর থেকে যাত্রা আরম্ভ করেন। তিনি গায়না উপসাগরের তীব্র স্রোতকে পাশ কাটিয়ে উত্তমাশা অন্তরীপে পৌঁছানোর জন্য সেখান থেকে সোজাসুজি দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর বরাবরে অগ্রসর হন। বিভিন্ন প্রতিকূল আবহওয়ার মধ্যে তিনি ২২ নভেম্বর উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করেন। ২ মার্চ গামা মৌজাম্বিকে পৌঁছেন। মৌজাম্বিকের সুলতান গামাকে সহায়তার জন্য দুইজন নাবিককে সঙ্গে দেন। এদের মধ্যে একজন পর্তুগিজরা খ্রিষ্টান জেনে পালিয়ে যায়।

৭ এপ্রিল গামার অভিযাত্রীদল সোবাসসায় (বর্তমান কেনিয়া) উপনীত হয়। ইবনে মজিদ নামে একজন গুজরাটি নাবিক ভারতের কালিকটে যাওয়ার পথ সম্পর্কে জানতেন। ২৩ দিন ভারত মহাসাগরে ভাস্কো দা গামা গা ভাসিয়ে তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে ভারতের কালিকট বন্দরে উপস্থিত হন। গামার ভারতে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয়দের প্রাচ্য আগমনের স্বপ্ন পূরণ হয় এবং বিশ্ব যোগাযোগের ইতিহাসে সংযোজিত হয় এক নতুন অধ্যায়। এভাবে ইউরোপীয় রেনেসাঁর প্রভাব ইউরোপীয় বণিকদের তথা ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে প্রাচ্যে আগমনের পটভূমি তৈরী করে।

---

[১৪৫] অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়,সং, *ফিরিঙ্গি বনিক* (কলিকাতা : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স, ১২২৯), পৃ. ৫৬.

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলায় ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রাথমিক বাণিজ্যিক কর্মকান্ড

যেহেতু আগের অধ্যায়টিতে বাংলায় ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আগমনের প্রেক্ষাপট বিচার করা হয়েছে। তাই এ অধ্যায়টিতে বাংলায় ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রাথমিক বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করা হবে। এতদউদ্দেশ্যে এখানে বাংলায় ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড, ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা লাভ ও তাদের রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার পর্যায়ক্রমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৫.১ ভারতে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক কর্মকান্ড

বার্ণিয়ে, ট্যার্ভানিয়ে ও ওরম প্রমুখ বর্ণনা করেছেন যে বাংলার উর্বর ভূমি, মূল্যবান কৃষিজ দ্রব্য ও দক্ষ কারিগর শ্রেণীর দক্ষতা ইউরোপীয় জাতিদের কে উপলব্ধি করিয়েছে বাংলার গুরুত্ব।[১] আরব বণিকগণ সপ্তম শতাব্দী থেকে লোহিত সাগর ও ভারত মহাসাগরে একচেটিয়া প্রাধান্য স্থাপন করেন এবং তাদের কাছ থেকে জেনোয়া, ভেনিস ও ইতালীর অপরাপর শহরের ব্যবসায়ীগণ পণ্য দ্রব্য ক্রয় করে ইউরোপে সরবরাহ করত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে তুর্কি অটোমান সাম্রাজ্যের অভ্যূদয় হলে স্থলপথে বার্ণিজ্য সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়। ভারতবর্ষ পাশ্চাত্যে সব সময় ধনসম্পদের আকর (wealth of india) হিসেবে পরিচিত ছিল। স্থলপথে বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেলে ইউরোপীয় বণিকগণ ভৌগলিক আবিষ্কারে নিয়োজিত হয় এবং নতুন সমুদ্র পথ আবিষ্কার করে। এক্ষেত্রে পর্তুগীজ জাতি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। কিন্তু তারা ইউরোপীয় জাতিসমূহের সংস্কার বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির প্রতিনিধি রূপে নয় অর্থাৎ বাজার বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে নয় বরং ধর্মপ্রচার ছিল তাদের প্রধান লক্ষ্য। তাদের বাণিজ্যের বিস্তৃত অংশে ছিল দাস ব্যবসা। বাংলায় তাদের অবদানের তুলনায় অপদানই বেশী।[২] স্থলপথে বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেলে ইউরোপীয় বণিকগণ ভৌগলিক আবিষ্কারে নিয়োজিত হয় এবং সমুদ্রপথ আবিষ্কারের প্রয়াস চালায়। এক্ষেত্রে পর্তুগীজ নাবিক প্রিন্স হেনরি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ১৪৯৭ খ্রিঃ রাজা ইমানুয়েলের পৃষ্ঠপোষকতায় ভাস্কো-দা-গামা উত্তমাশা অন্তরীপ (Cape of good hope) (তখন ও সুয়েজ খাল খনন হয়নি) পার হয়ে আরব নাবিকদের সাহায্যে ভারতবর্ষে আসেন। ১৪৯৮ খ্রিঃ ২৭ মে তিনি ভারতবর্ষে পশ্চিম উপকুলের কালিকট বন্দরে অবতরণ করেন। ভারতবর্ষে পর্তুগীজ আধিপত্য বিলুপ্ত হলে ইউরোপের অপর তিনটি প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়িক

---

[১] Bernier, F. *Travels in Mogul Emprie*, Translated by irving brock and revised by V.A. Smith, oxford, 1914) p. 437-40.

[২] Sukumar Bhatta Charga, *The East India Company and the Economy of Bengal*, (Calculta-1969) p. 69-71

(Maritime nation) ওলন্দাজ, ফরাসি ও ইংরেজগণ ভারতবর্ষে ব্যবসা সম্প্রসারণে অংশগ্রহণ করেন।

১৬০০ খ্রিঃ ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয়। বলা বাহুল্য যে, ভারতবর্ষে বাণিজ্য ও আধিপত্য বিস্তারে উপলক্ষ্যে এই তিন রাষ্ট্রের ত্রিমুখী সংঘর্ষ হয়। ১৭৫৯খ্রিঃ বিদেরার যুদ্ধে পরাজিত হলে ভারতবর্ষে ওলন্দাজদের আধিপত্য বিলুপ্ত হয় এবং ইংরেজ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

সম্রাট শাহজাহানের আমলে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বার্ষিক ৩০০০ টাকা শুল্কের বিনিময়ে বাংলায় অবাধ ব্যবসা বাণিজ্য চালিয়ে আসছিল। আপাতদৃষ্টিতে এই সুযোগ সুবিধা ইংরেজদের অনুকূলে মনে হলেও কখনও কখনও সুবাদারদের মনোভাব ইংরেজদের প্রতি বেশ কঠোরই ছিল। অর্থনীতিবিদ সুকুমার ভট্টাচার্য লিখেছেন ইংরেজদের বেশ মোটা অংকের টাকা সুবাদারদের উপঢৌকন হিসেবে দিতে হত।[৩]

উইলসন আরও লিখেছেন— ১৬৫২ সালে সামান্য ৩০০০ টাকার অংকের জন্য ইংরেজরা এই মর্মে সরকারি আদেশ লাভ করতে হয়েছিল যে তারা বাংলায় শুল্কহীন অবাধ ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারে।[৪]

স্টুয়ার্ট সম্রাট শাহজাহান কন্যা জাহান আরার রোগ নিরাময়ের ব্যাপারে ইংরজ সার্জন জিব্রাইল বাউটন (Gabriel Boughton) এর অবদানের কথা উল্লেখ করেন। এই শাহজাদী জাহান আরা ভীষণভাবে অগ্নিদগ্ধ হন এবং আরোগ্য লাভের আশা ত্যাগ করা হয়। সম্রাট শাহজাহান একজন ইউরোপীয় সার্জনের সহায়তা কামনা করেন। সুরাটের ইংরেজ কাউন্সিল হোপওয়েল (Hopewell) জিব্রাইল বাউটন নামক জাহাজের শল্যচিকিৎসককে পাঠান। তিনি শাহজাহান কন্যা শাহাজাদী জাহান আরাকে এই দূর্ঘটনা থেকে রক্ষা করে সুস্থ করে তোলেন। আর এই কাজের জন্য বাউটনকে পুরস্কার স্বরূপ ইংরেজদেরকে বিনা শুল্কে বানিজ্য করার অনুমতি সাথে কুঠি স্থাপনের অনুমতি দেওয়ার কথা বলেন। ফলে সম্রাট শাহজাহান ইংরেজদেরকে বাণিজ্য করার জন্য অনুমতি দিয়ে একটি ফরমান জারি করেন।[৫]

---

[৩] Charles Robert Wilson, *The Early Annals of the English in Bengal (V-I) Asiatic Society*, 1963, The university of California. P. 27

[৪] Charles Robert Wilson, Ibid P. 27

[৫] Charles Stewart, The History of Bengal, Black, Parry and Co. Leadenhall street, watts, printer, broxbourne, 1813. p. 23.

এম মোহর আলী ইংরেজদেরকে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার অনুমতি সংবলিত ফরমানের সত্যতা উত্থাপন করে লিখেন যে, ১৬৫০ সালে ইংরেজগণ সম্রাট শাহজাহান থেকে একটি ফরমান লাভ করেন যা ছিলঃ

“বিভিন্ন কর্মকর্তা এবং যারা বোরহানপুর হয়ে আগ্রা ও বাংলা এবং আহমদাবাদ হয়ে আগ্রা ও সুরাটের মধ্যবর্তী মহাসড়কের দায়িত্বে নিয়োজিত তাদেরকে এই মর্মে আদেশ দেয়া যাচ্ছে যে, ইংরেজগণ সুরচি, ব্রোচ বা লাহরি বন্দরে আইনানুযায়ী শুল্ক প্রদানের পর তাদেরকে যেন অন্য কোন দাবী নিয়ে বিরক্ত করা না হয়।”[৬]

এই ফরমানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, রফতানির জন্য পশ্চিমাঞ্চলের উপকূলে মালামাল চলাচল করার জন্য যেন কোন শুল্ক প্রদান করতে না হয়। মুঘল সুবাদার শাহ শুজাকে ৩০০০ টাকা ঘুষ দিয়ে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর এজেন্টগণ বাংলায় বিনা শুল্কে ব্যবসা করার অনুমতি লাভ করে। অনুমতি পত্রটি ছিল এরকম-

“তাঁর (সুবাহদার) নিকট এই মর্মে অভিযোগ করা হয়েছে যে ইংরেজ কোম্পানীর মালামাল একটি রাজকীয় ফরমান বলে শুল্কমুক্ত করা হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও বালাসোর এবং উড়িষ্যার অন্যান্য বন্দরে মুতাসাদ্দিগণ এই নিয়ে (ইংরেজ) ব্যবসায়ীগণকে জ্বালাতন করে, তাদের বেচাকেনায় বাঁধা প্রদান করে এবং মহাসড়কে তাদের কষ্ট দেয়। তিনি (সুবাদার) অতঃপর আদেশ দিচ্ছেন যে, কোন মুঘল কর্মকর্তা বন্দরে বা মহাসড়কে তাদের কাছ থেকে কোন শুল্ক দাবী করবেন না বা অন্যকোন পন্থায় তাদের পথে বাঁধা সৃষ্টি করবেন না।”[৭]

মোহর আলী লিখেছেন :“এটি বাংলা সরকারের সঙ্গে একটি ধোঁকাবাজি। কোম্পানীর কুঠিয়ালগণ যে তাদের এই দু’মুখো নীতির ব্যাপারে সজাগ ছিলেন তা পরিষ্কার বোঝা যায় এভাবে যে তারা সতর্কতার সাথে নবাব বা তাঁর কর্মকর্তাদের সঙ্গে কোনো বাদানুবাদ পরিহার করে চলেন। তাঁরা দুভাবে একাজে সফল হন। প্রত্যেক বছর তাঁরা সুবাদার শাহ্‌ সুজা এবং তাঁর উত্তরাধিকারী মীর জুমলাকে ৩০০০ টাকা করে “উপঢৌকন” দিয়ে যান। তাঁরা নবাবকে উপযুক্ত উপহার সামগ্রী দিয়ে সন্তুষ্ট রাখেন এবং কখনও কোনো স্থানীয় কর্মকর্তা বাঁধা দিলে তাঁকে তাঁর পদমর্যাদা অনুযায়ী ঘুষ দিয়ে

---

[৬] William Foster, *English Factories in India,* (London: 1930), 1655-1660, p. 414-415

[৭] William Foster, Ibid. p. 415.

বিবাদ মিটিয়ে ফেলেন।" বস্তুত ইংরেজ কুঠিয়ালগণ এ সময় ঘুষ প্রথাকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়ে ফেলেন।[৮]

১৬৫০ সালের শেষের দিকে ভারতবর্ষে এক ব্যাপক রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি হয় এর ফলে সম্রাট শাহজাহান এর তার পুত্র শাহ-শুজা ইংরেজদেরকে ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা থেকে উৎখাত করার উদ্যোগ নেন। ১৬৫৭ সালে সম্রাট শাহজাহান দিল্লীতে ভীষণভাবে রোগাক্রান্ত হন এবং এই সময় তাঁর পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব শুরু হয়।

১৬৫৭ সালে সম্রাট হন যুবরাজ আওরঙ্গজেব। আর সেনাপতি হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন মীর জুমলা।

ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধ (১৬৪২-১৬৪৮) এবং হুকুম নামার অধীনে (Protectorate) হল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ (১৬৫২-১৬৫৪) পুরাতন ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসা ধ্বংস করে দেয়, ফলে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর লন্ডনের পরিচালকগণ এক সময় বাংলায় এবং উপসাগরের ব্যবসা সম্পূর্ণ গুটিয়ে ফেলতে আদেশ দেন।[৯]

১৬৬১ সালে এক নতুন অনুমতি পত্রের মাধ্যমে পূর্ব-ভারতের সমস্ত ব্যবসা কোম্পানীর অধীনে ন্যস্ত করা হয়। তাদেরকে লাইসেন্সবিহীন লোক পাকড়াও করা, দূর্গ নির্মাণ করা, সৈন্য বাহিনী গঠন করা এবং অখ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হয়।

বাংলার বাণিজ্যে ক্রমান্বয়ে উন্নয়ন এবং ফরমান লাভ করার জন্য কোম্পানীবাংলাকে মাদ্রাজ থেকে পৃথক করতে উৎসাহিত বোধ করে। ফলে তারা তাদের একজন পরিচালক, উইলিয়াম হেজেজকে বঙ্গোপসাগরস্থ্ তাদের সমস্ত কর্মকান্ডের প্রধান এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ দান করে এবং অন্যান্য সমস্ত কুঠিকে এর নিয়ন্ত্রণে ন্যস্ত করে। এটাই বাংলায় কোম্পানীর প্রথম সাময়িক সংস্থাপন এবং বাংলায় ইংরেজ ক্ষমতার ভিত্তিস্থাপন।[১০]

১৬৬১ সালের এক নতুন চার্টারের মাধ্যমে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী দূর্গ নির্মাণ করা, সৈন্য নিয়োগদান করা এবং অখ্রিস্টানদের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য ক্ষমতা লাভ করে।

---

[৮] Ali, Md. Mohar, *A Brief Survey of Muslim Rule in India*, Dacca: Mullick Brother, 1969, p. 96-97.

[৯] Jadunath Sarkar, History of Bengal, II (Kalkata, 1936) p. 383.

[১০] Charles Stewart, *The History of Bengal*, Black, Parry and Co. Leadenhall street, watts, printer, broxbourne, 1813. p. 309.

স্যার জোসিয়া চাইল্ডের[১১] নেতৃত্বে কোম্পানী ভারতে একটি কঠোর ও সুপরিকল্পিত পন্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত নেয়। এই কর্মপন্থা বাস্তবায়নের জন্য ১৬৮৭ সালে ফোর্ট সেন্ট জর্জের প্রেসিডেন্ট ও কাউন্সিলকে আদেশ দেয়া হয় যাতে এমন একটি সামরিক ও বেসামরিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার নীতি গ্রহণ করা হয় এবং মোটা অংকের রাজস্ব জোগাড় করা হয় যা দ্বারা “সর্বকালের জন্য ভারতে একটি বিশাল, সুদৃঢ়, সঠিক ইংরেজ রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করা যায়।[১২]

এখন থেকে কোম্পানীর বাংলায় তাদের শান্তিপূর্ণ ব্যবসা নীতি থেকে সরে দাঁড়ায়। শাহ্‌শুজা কর্তৃক প্রদত্ত ইংরেজদের বিনা শুল্কে ব্যবসা করার নিশান (অনুমতিপত্র) ১৬৭২ সালে প্রদেশের সুবাদার শায়েস্তা খান সম্রাটের অনুমতি নিয়ে নবায়ন করে দেন। ইংরেজ কর্তৃক এই নিশানের অপব্যবহার লক্ষ্য করে পরবর্তী সুবাদার ফেদাই খান (১৬৭৭-১৬৭৮) এইসব সুযোগ-সুবিধা অগ্রাহ্য করেন এবং নতুনভাবে শুল্ক দাবি করেন। ১৬৭৮ সালে ইংরেজগণ নতুন সুবাদার যুবরাজ মুহাম্মদ আজম থেকে পুনরায় বিনা শুল্কে ব্যবসা করার অনুমতি পত্র সংগ্রহ করে। তবে ইংরেজরা এতে সন্তুষ্ট হয়নি। জব চার্নক পূর্বের প্রস্তাবিত দাবি নিয়ে নবাবের সেনাপতি আব্দুস সামাদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। এর আগে তিনি তার প্রতিনিধি রিচার্ড ট্রেন্সফিল্ডকে উপদেশ দেন যেভাবেই হোক মুঘলদের সঙ্গে একটি শান্তি চুক্তি করতে হবে। কিন্তু ইংরেজরা মুঘল কুটনীতির কাছে হার মানে। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজরা যা দাবি করে তার কিছুই পায়নি। নবাবের সেনাপতি আব্দুস সামাদ ওয়াদা করেছিলেন ইংরেজদের আরও উপরে যাতায়াতের পাশ দেবেন। কিন্তু সে পাশ কখনোই হয়নি। তিনি ওয়াদা করেছিলেন ইংরেজদের দাবিদাওয়া নবাবের নিকট থেকে আদায় করে দিবেন। কিন্তু নবাব তার কিছুই করেন নি। কিন্তু তাদের ক্ষতিপূরণের দাবি, ব্যবসা শুল্ক বাতিল এবং একটি টাকশাল নির্মাণের ব্যপারে শায়েস্তা খান কিছু স্থির করতে পারেন নি।[১৩] জব চার্নক পুনরায় সুতানুটিতে ফিরে যান। পশ্চিম উপকূলে কোম্পানীর তরফ থেকে বোম্বের ইংরেজ গভর্ণরের নিকট আদেশ পাঠানো হয় তিনি যেন সুরাট ও অন্যান্য মুগল বন্দর থেকে কোম্পানীর কারখানা গুটিয়ে নিয়ে আসেন এবং ইংরেজ জাহাজ দিয়ে

---

[১১] স্যার জোসিয়া চাইল্ড সাত বছর কোম্পানির ডাইরেক্টর হিসেবে কাজ করেন এবং ১৬৮১ সালে এর গভর্ণর হন। ১৬৯৯ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত লন্ডন থেকে কোম্পানীর নীতি নির্ধারক ছিলেন। Sukumar Bhattacharya, India Office, Orginal Correspondence with Collateral Documents, V. 37, No-4528, পৃ.-১৪ থেকে উদ্ধৃত

[১২] সুকুমার ভট্টাচার্য : *দি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এন্ড দি ইকনোমি অব বেঙ্গল*, ১৭০৪-১৭৪০, কলকাতা, ১৯৬৯, পৃ-১৪।

[১৩] Charles Robert Wilson, The Early Annals of the English in Bengal (V-I) Asiatic Society, 1963, The university of California. P. 110, 111.

সমস্ত মুঘল জাহাজ আটক করে এবং এভাবে তাদের সঙ্গে বৈরিতা আরম্ভ করে।[১৪] এই আদেশ পালনের জন্য জন চাইল্ড বৈরিতা আরম্ভ করেন এবং যত বেশি মুঘল জাহাজ হাতের নাগালে পান সেগুলিকে আটক করেন। চাইল্ডকে বার বার এ সমস্ত যুদ্ধসম কার্যাবলী থেকে বিরত থাকার জন্য মুঘল কর্তৃপক্ষ নিষেধ করেন, কিন্তু যখন আলোচনার সময় ইংরেজরা আরও মুঘল জাহাজ আটক করে তখন সম্রাট তাঁর সিদি এডমিরালকে আদেশ দেন যেন সর্বশক্তি দিয়ে বোম্বে আক্রমণ করেন। মুঘল এডমিরাল ৮০০০ লোক বল নিয়ে ইংরেজদের আস্তানায় হানা দিয়ে (ফেব্রুয়ারি ১৬৮৯) তাদেরকে দুর্গে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেন এবং দ্বীপ দখল করে নেন। অনেক ইউরোপীয় পক্ষ ত্যাগ করে মুঘল এডমিরালের শিবিরে পালিয়ে যায়।[১৫]

মালাবার উপকূলে এভাবে অভিযান চলাকালে বাংলার নবাব তখন কোম্পানীর এজেন্টদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার সুযোগ পান। তিনি আদেশ দেন তারা যেন হুগলিতে ফিরে সেখানে বসবাস করে এবং সুতানুটির পাথর বা ইট দিয়ে কোনো নির্মাণ কাজ না করে। বিগত দিনে ইংরেজ কর্তৃক কৃত সমস্ত ধ্বংসাবলির ক্ষতিপূরণও তিনি চার্নকের নিকট দাবি করেন। উপায়ান্তর না দেখে জব চার্নক ঢাকায় দু’জন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন আত্মসমর্পণের জন্য। তিনি মিনতি করেন, নৌপরিবহনের সুবিধার্থে এবং মুগলদের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াবার জন্য তিনি সুতানুটি থাকতে চান। অতএব তিনি সুতানুটিতে অবস্থান করার জন্য এবং তাদের কারখানার জন্য জমিদারদের নিকট থেকে যথেষ্ট জমি ক্রয় করার নিমিত্তে অনুমতি প্রার্থনা করেন।[১৬] এই অবস্থা ক্যাপ্টেন হীথ তাঁর বাহিনী নিয়ে ইংল্যাণ্ড থেকে এসে পৌঁছেন, কিন্তু অত্যন্ত চঞ্চল প্রকৃতির লোক বিধায় তিনি নবাবের ব্যবহারে রাগান্বিত হন এবং জব চার্নকের তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও তিনি যুদ্ধ বাধাতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন।[১৭]

এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য তিনি তাৎক্ষণিকভাবে আদেশ জারি করেন, সমস্ত ইংরেজ তাদের অস্থাবর সব সম্পত্তি নিয়ে যেন জাহাজে আরোহণ করে এবং বালেশ্বরের দিকে রওয়ানা হয়। বালেশ্বরের ফৌজদার শান্তির প্রস্তাব করেন। কিন্তু তা প্রত্যাখ্যান করা হয়। অতএব গোলযোগের আশঙ্কা করে ফৌজদার দু’জন ইংরেজকে জামিন হিসাবে আটক করেন। তাছাড়াও দুইজন ইংরেজ

---

[১৪] Charles Stewart, *The History of Bengal*, Black, Parry and Co. Leadenhall street, watts, printer, broxbourne, 1813. p. 318.

[১৫] Ram Gopal, *How the British Occupied Bengal*, Bombay: Asia Publishing House, 1963, p. 26

[১৬] Charles Stewart, *The History of Bengal*, Black, Parry and Co. Leadenhall street, watts, printer, broxbourne, 1813. p. 320

[১৭] Charles Stewart, Ibid, p. 320

প্রতিনিধি ঢাকায় এবং ইংরেজ কুঠিয়ালরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে জানা সত্ত্বেও ক্যাপ্টেন হীথ একদল নৌ সেনা নিয়ে অবতরণ করেন এবং ত্রিশটি কামান নিয়ে আক্রমণ করেন এবং বালেশ্বর শহর দখল করে তা লুট করেন। ফলে ফৌজদার ইংরেজদের কারখানা জালিয়ে দেয় এবং জামিনি আটক ইংরেজ ও অন্যান্য স্থানে কর্মরত ইংরেজদের ধরে নিয়ে যায় যাতে তারা আর ছুটতে না পারে। ক্যাপ্টেন হীথ এরপর চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দেন কিন্তু চট্টগ্রামের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এতটাই শক্তিশালী যে তিনি একটি যুদ্ধ পরামর্শ সভা ডাকেন। সভার পরামর্শ অনুযায়ী আরো কিছুদিন অপেক্ষা এবং নবাবের কাছে তাদের দাবি দাওয়া তুলে ধরে একটি পত্র লেখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু ক্যাপ্টেন হীথ এই পত্রের উত্তরের অপেক্ষা না করে আরাকানের দিকে অগ্রসর হন এবং তিনি আরাকানের রাজার নিকট পত্র লিখেন। পত্রে তিনি উল্লেখ করেন যে মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাজা সাহায্য করতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু বিনিময়ে ইংরেজদের তার রাজ্যের বসবাস করার জন্য জায়গা দিতে হবে। কিন্তু আরাকানের রাজার নিকট পত্রের কোন উত্তর না পেয়ে বিরক্ত হয়ে ১৬৮৯ সালে তিনি পনেরোটি জাহাজ সংবলিত নৌবহর যোগে বাংলার ইংরেজ গভর্ণর ও পরিষদ এবং ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সমস্ত মালামাল নিয়ে তিনি সমুদ্র যাত্রা করেন এবং তিনি মাদ্রাজ পৌঁছেন। ফোর্ট সেন্ট জর্জ গভর্ণরের নিকট তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং তিনি এ কথা উল্লেখ করেন যে, উভয় পক্ষের যে বিবরণ ইংল্যান্ডে পাঠানো হয়েছে তা পুরোপুরি মিথ্যে। ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বোম্বে ও মাদ্রাজে দুর্গ নির্মাণ করে তাদের সীমানা এগুলোর পাশ্ববর্তী এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত করে, সম্রাটের বেশ কিছু জাহাজ আটক করে এবং তার শত্রু মারাঠা নেতা শম্ভুজীর সাথে মিত্রতা স্থাপন করে এবং এ সবের দ্বারা তারা সম্রাট আওরঙ্গজেবের ক্ষমতা সম্পূর্ণ অস্বীকার করার প্রয়াস পায়। তাই ইংরেজদের ভারতবর্ষ থেকে বের করে দেয়ার জন্য সম্রাট এক আদেশ জারি করেন; যেখানেই তাদের সহায় সম্পত্তি পাওয়া যাবে তা দখল করে নেয়ার জন্যও তিনি আদেশ দেন। এই আদেশের পরিণতিতে ইংরেজদের মসুলিপত্তমের কারখানা বাজেয়াপ্ত করার হয় এবং বিশাখাপত্তমের মাল গুদাম লুঠ করা হয় এবং সেখানকার সমস্ত ইংরেজদের হত্যা করা হয়, ঢাকার নবাবও একই পন্থা অবলম্বন করেন। বাংলায় ইংরেজদের সমুদয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্তও করা হয় এবং ঢাকাস্থ কোম্পানীর এজেন্টকে বন্দি করা হয়।

৫.২ বাংলায় ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা লাভ

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান চব্বিশ পরগণা জেলার মধ্যে হুগলি নদীর বাম তীরে ২২°৩৪″ উত্তর এবং ৮০°২২″ পূর্বে সুতানুটি এবং তার সন্নিকটে কলকাতা অবস্থিত। স্থানটি সমুদ্র থেকে ৮৬ মাইল দূরে এবং সমুদ্রপৃষ্ট থেকে মাত্র ১৮ থেকে ২১ ফুট উপরে। যে মাটির উপর কলকাতা প্রতিষ্ঠিত তা মাত্র কিছুকাল পূর্বে গাঙ্গেয় বদ্বীপের পলিমাটি দ্বারা গঠিত এবং পুকুর ও প্রাসাদের ভিত্তি খুঁড়তে দেখা গেছে সেখানে বাষ্প ও কাদামাটি পর্যায়ক্রমিকভাবে গঠিত। জলবায়ু গরম ও আদ্রতাপূর্ণ। গড় তাপ ৭৯°, সর্বোচ্চ তাপ ১০২° মে মাসে এবং সর্বনিম্ন ৪৮° জানুয়ারি মাসে। গরমের দিনে গড় উষ্ণতা ৮৫° এবং শীতকালে ৭২°। বাতাসের আর্দ্রতা ৭৮%, মার্চ মাসে ৬৯% থেকে আগস্ট মাসে ৮৯% শতাংশে উঠানামা করে। বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত ৬০″ ইঞ্চি। বাৎসরিক গড় বৃষ্টির দিন ১১৮টি।

জেমস লং বলেন, সেন্ট পিটার্সবার্গ প্রতিষ্ঠা করে প্রসিদ্ধ পিটার। অনুরূপভাবে কলকাতা প্রতিষ্ঠা করেন জব চার্নক, উভয় নগরী প্রতিষ্ঠা করা হয় জলাভূমিতে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে, কিন্তু উভয়ই কালক্রমে দুই বিশাল সাম্রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত হয়।[১৮] কলকাতা বা কলিকাতা শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে শংকর সেনগুপ্ত লেখেন, ক্যালকাঠা বা কলিকাতা নামটির উৎপত্তি অজ্ঞাত। এই নামের উল্লেখ্য আমরা প্রথমে দেখতে পাই মধ্যযুগের কবি মুকুন্দরামের কবি কংকনচণ্ডী কাব্যে এবং বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল কাব্যে এবং তারপর পাই আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীতে। এখানে উল্লেখ্য, প্রাথমিক যুগের কিছু চার্টে বা খসড়া মানচিত্রে যেমন ভেলেনতিজিন (Valentijin) এ এবং সর্বপ্রাচীন ইংলিশ পাইলটে (English Pilot) কলকাতা নামটি অন্তর্ভূক্ত না থাকলেও সেখানে “হুগলি ক্যালকুলা” বা ক্যালকুটা নামের একটি স্থান আছে যা ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করে।

সমসাময়িক ঐতিহাসিক সলিম বলেন, প্রাচীনকালে ক্যালকাটা নগরীটি ছিল একটি গ্রাম। এই গ্রামটি যে তালুকের অন্তর্ভূক্ত তা সেখানে অবস্থিত কালী নামক দেবীর নামে উৎসর্গীকৃত ছিল। বাংলা ভাষায় কর্তা বা কত্তা বলতে প্রভু বা মালিককেই বোঝায় তাই এই গ্রামের নাম হয়ে গেল কলিকাতা তার মানে এর মালিক কালী। কালক্রমে উচ্চারণের হেরফের কালীর আলিফ এবং ইয়া বাদ পড়ে এর নাম হয়ে গেল কলিকাতা।[১৯] জব চার্নক, যিনি ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাংলা প্রদেশের একজন প্রতিনিধি হিসেবে ১৬৫৬ সাল থেকে তার ভারতীয় কর্তাদের সেবা করে আসছিলেন অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে

---

[১৮] James Long, *Calcutta and Its Neighbourhood*. Kalkata: 1978, Indian Publication, p. 67

[১৯] সলিম, গোলাম হোসেন, রিয়াস-উস-সালাতিন, অনুবাদঃ আব্দুল সালামঃ কলিকাতা, পৃ. ৩০, ৩১

অঞ্চল সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান, সঠিক মূল্যায়ন এবং তাঁর অতি সাম্প্রতিককালের অভিজ্ঞতার দ্বারা তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে বাংলায় ইংরেজদের নতুন দুর্গ ও বসতির জন্য সুতানুটিই হবে সবচাইতে সুবিধাজনক স্থান।[২০] পুনঃপুনঃ পরীক্ষা নিরীক্ষার পর তিনি হুগলি নদীর পূর্ব পাড়ে অবস্থিত সুতানুটি এবং তৎসংলগ্ন দক্ষিণে কলকাতাকেই প্রকৃত স্থান হিসাবে বেছে নেন। পরিষ্কার দু'টি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কলকাতাই ছিল সবচাইতে উপযুক্ত স্থান।

কলকাতা বা হুগলির যে স্থানে বর্তমানে কলকাতা অবস্থিত ছিল তা কয়েকটি গ্রামের সমষ্টিমাত্র। নদীর ধারে অবস্থিত এ ধরনের শত শত গ্রামের কোনো একটি থেকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করার মত কোনো বৈশিষ্ট্যই এর মধ্যে ছিল না।[২১] একমাত্র পার্থক্য এই যে ষোড়শ শতাব্দীতে এ স্থানটিতে নদী ছিল অগভীর এবং সমুদ্রগামী জাহাজের পক্ষে চলাচলের প্রায় অযোগ্য। স্থানীয় ব্যবসা বাণিজ্য ছোট ছোট নৌকা চালাতে গেলে কোনো সমস্যাই ছিল না, কারণ পার্শ্ববর্তী সরশ্বতীতে সাতগাঁও ছিল বিশাল বাণিজ্য কেন্দ্র। কিন্তু ১৫৩০ সালের দিকে পর্তুগীজরা ঘন ঘন এই নদীতে যাতায়াত শুরু করলে এই দুই জায়গার পার্থক্য প্রকটভাবে অনুভূত হয়। বিদেশী ব্যবাসীয়গণ এই অগভীর পানির ঝুঁকি নিতেন না বরং ছোট ছোট নৌকায় তাদের মালামাল সাতগাঁও এ প্রেরণ করতেন। ইতিমধ্যে তাদের বড় বড় জাহাজগুলো গার্ডেন রীচে নোঙ্গর করা থাকত এবং এভাবে কালক্রমে শিবপুরের নিকটে নদীর পশ্চিম পাড়স্থ বেতোরে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে উঠে।[২২] এই বিদেশী বাজারটি ক্রমশ স্থানীয় ব্যবসায়ীদেরও আকর্ষণ করে এবং বিশেষত বসাকদের চারটি ও শেঠদের একটি পরিবার দ্রুত অবনতিশীল সাতগাঁও ত্যাগ করে বর্তমান ফোর্ট উইলিয়ামের নিকটে গোবিন্দপুরে বসতি গড়ে তোলে।

ঐতিহাসিকভাবে বৃটিশ ভারতের রাজধানী নদীর তীরবর্তী একগুচ্ছ গ্রামের সমষ্টিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। এই গ্রামগুচ্ছের নাম হচ্ছে কলকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর।[২৩] ১৫৯৬ সালে আইন-ই-আকবরীতে কলকাতার উল্লেখ আছে সরকার সাতগাঁও এর অধীনস্থ কর প্রদানকারী কলকাতা গ্রাম হিসাবে। এটি ছিল সাতগাঁও এর অধীনস্থ একটি জেলা। বারাকপুর ও বাকুয়া জেলাসহ কলকাতা রাজকীয় কোষাগার বাৎসরিক ২৩৪০৫ টাকা কর আদায় করত। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে কোনো

---

[২০] Charles Robert Wilson, *Old Fort William in Bengal* Bengal Past and Present, Vol, I, p. 33

[২১] Charles Stewart, *The History of Bengal*, Black, Parry and Co. Leadenhall street, watts, printer, broxbourne, 1813. p. 127

[২২] Charles Robert Wilson, Ibid, p. 127

[২৩] Charles Robert Wilson, Ibid, p. 129

এক সময়ে নদীর উপরিভাগকে জলদস্যুদের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য বেতোরে এবং নদীর অপর পাড়ে কয়েকটি দুর্গ নির্মাণ করা হয়।[২৪] জব চার্নক ১৬৯৩ সালের ১০ই জানুয়ারি মারা যান এবং কোম্পানীর ব্যবস্থাপনার ভার ফ্রান্সিস এলিসের হাতে ছেড়ে যান। এই এলিস দশ বছর পূর্বে দুর্নীতির দায়ে কোম্পানীর প্রতিনিধি হেজেজের হাতে বরখাস্ত হন, কিন্তু তাকেই কোম্পানী প্রেসিডেন্ট গিফোর্ড পুনর্বহাল করেন।[২৫] জব চার্নকের উত্তরাধিকারী ফ্রান্সিস এলিস ছিলেন বেআইনী স্বভাবের লোক। তাঁর সময়ে কোম্পানীর লোকজন বেআইনী ব্যবসায়ী লিপ্ত ছিল। মুগল সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সুযোগের তারা অসদ্ব্যবহার করে।

"আজিমুশ্বান ছিলেন অলস ও লোভী। উপযুক্ত ঘুষের বিনিময়ে তিনি যে কোনো কিছু দিতে সম্মত থাকতেন তদনুযায়ী ১৬৯৮ সালের জুলাই মাসে ষোল হাজার টাকার বিনিময়ে যুবরাজ ইংরেজদের কলকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর এই তিনটি গ্রাম তাদের মালিক থেকে ভাড়া দেয়ার মালিকানা প্রদান করার অনুমতিপত্র দান করেন।[২৬] এই অনুমতি পত্র কোষাধ্যক্ষের সত্যায়িতের জন্য কিছু বিলম্বে কার্যকর করা হয়।[২৭]

কলকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর এই তিনটি গ্রামের তৎকালীন দখলকারীদের নাম যা বিক্রয় কবলায় উল্লেখ করা হয়েছে তাঁরা হলেন : ১. মনোহর দাস, পীতা বাসুদেব, পীং রঘুরাম চন্দ্র, পীং বিদ্যাধর, পীং জগদিশ ২. রাম বাহাদুর পীং রামদেব, পীং কেশপ্রান, পীং কাশীশ্বর, পীং গৌরী, ৩. মনোহর সিং, পিতা গন্ধর্ব। ভাড়া দেয়ার অধিকার ক্রয় করার অনুমতি প্রদান করার বিনিময়ে ইংরেজরা যুবরাজ আজিম উশ শানকে প্রদান করেন ষোলহাজার টাকা, আর প্রকৃত দখলদারকে মূল্য বাবদ প্রদান করেন এক হাজার তিনশত টাকা। গ্রামগুলি ক্রয় করার জন্য ইংরেজরা যুবরাজ থেকে অনুমতি লাভ করে ১৬৯৮ সালে কিন্তু প্রকৃত ক্রয় বা বিক্রয় সম্পাদিত হয় ১৭০৩ সালে (১৫ই জমাদি উল আউয়াল ১১১৫ হিজরি বা সম্রাট আওরঙ্গজেবের সিংহাসনে আরোহণের ৪৪তম বর্ষে) যখন যুবরাজ আর বাংলা সুবাদার ছিলেন না।

বিক্রয় কবলাটি নিম্নরূপঃ

---

[২৪] Charles Robert Wilson, *The Early Annals of the English in Bengal (V-I) Asiatic Society*, 1963, The university of California. P.137

[২৫] Charles Robert Wilson, Ibid, P. 140

[২৬] Charles Robert Wilson, Ibid, P. 150

[২৭] Charles Robert Wilson, Ibid, P. 150

কাজীর সীলমোহর এবং জমিদারদের দস্তখত সহ কলকাতা গ্রাম প্রভৃতির বিক্রয় কবলা বিবরণ এই যে উভয়পক্ষ এ মর্মে স্বীকারোক্তি প্রদান করে যে, ইসলামী শরিয়াহ্ মান্য করে তারা তাদের নাম ও বংশতালিকার বিবরণ প্রদান করছে। মনোহর দেব পীতা বাসু দেব, পীং রঘুরাম চন্দ্র, পীং বিদ্যাধর, পীং জগদীস, এবং রাম বাহাদুর, পীং রামদেব, পীং কেশব প্রাণ, পীং কাশীশ্বর পীং গৌরী, এবং মোনহর সিং পীং গন্ধর্ব, পীং [?] বর্তমানে আমরা সম্মিলিতভাবে শরিয়াহ্ অনুযায়ী আমাদের আইনতঃ দখলদারিত্বে অবস্থিত আমাদের সম্পত্তি আমিরাবাদ পরগণায় অবস্থিত মৌজা কলকাতা গ্রাম ও সুতানুটি এবং পাইকর পরগনায় অবস্থিত মৌজা গোবিন্দপুর এবং সাঁতগাও সরকারের অধীনস্থ কলকাতা তৎসহ তাদের আয়, জঙ্গল, পুকুর, বাগান, জলপথ, বনভূমি এবং অসমতল জমি ইংরেজ কোম্পানীর নিকট ১৩০০ টাকার বিনিময়ে দৃশ্য ও অদৃশ্য সমস্ত অধিকার ও মুনাফাসহ বিক্রয় করলাম। এই জমি শরিয়ত মোতাবেক অদ্য বিক্রয়ের তারিখ পর্যন্ত চিহ্নিত ও সুপরিচিত ব্যবহৃত জমি যেগুলো আমাদের দখলে ছিল এবং যেগুলোর উপর অন্য কারো কোন অধিকার নাই যা দ্বারা এই বিক্রয় বাধাগ্রস্থ হতে পারে। (জমির উপর) উপরোল্লিখিত ক্রেতার দখল দেয়ার পর আমরা উপরোল্লিখিত অংকের টাকা আমাদের হাতে এবং ব্যবহারের জন্য নিলাম এবং উপরোল্লিখিত বিক্রিত জমি তার (কোম্পানী) নিকট হস্তান্তর করলাম। এই স্বীকারোক্তির পর আমরা এই জমির উপর যে কোনো মিথ্যা দাবী থেকে বিরত থাকব। এই জমির উপর ভবিষ্যতে যে কোন দাবিদারের বিরুদ্ধে আমরা জামিন থাকব। তাকে ক্ষতিপূরণ দেয়া আমাদের দায়িত্ব থাকবে। অতঃপর ভবিষ্যতে আমরা বা আমাদের কোন বংশধর এর উপর কোন দাবী করবে না। ভবিষ্যতে কেউ এর উপর কোন দাবী উত্থাপন করলে তার বিরুদ্ধে মামলা করার দায়িত্ব ইংরেজ কোম্পানীর উপর বর্তাবে না। এসব শর্তে উপরের বাক্যগুলো জামিন হিসাবে আমরা প্রদান করলাম যাতে প্রয়োজনবোধে এগুলো দলিল হিসাবে ব্যবহার করা যায়। লেখা হল অদ্য ১১১৫ হিজরীর ১৫ই জমাদি আল-আওয়াল মোতাবেক সম্রাটের সিংহাসনারোহণের ৪৪তম বর্ষ।

এখানে, আকর্ষণীয় বিষয় হলো ১. কবলায় উল্লেখ আছে ইংরেজরা তিনটি গ্রাম (দেহ) ক্রয় করেছে, কিন্তু ইংরেজদের ফ্যাক্টরি রেকর্ডে উল্লেখ করছে এগুলোকে তিনটি শহর হিসাবে। ২. ইংরেজরা এই কবলাকে বলছে জমিদারি ক্রয়ের কবলা। এখানে বিক্রেতাদের উল্লেখ করা হয়েছে জমিদার হিসাবে।

৩. ইংরেজরা এটিকে ‘ভাড়া দেয়ার অধিকার’ ক্রয় বলে উল্লেখ করছে।[২৮] গ্রামগুলিকে শহর বলে উল্লেখ করার ব্যাপারে মোরল্যাণ্ড বলেন, ষোড়শ শতাব্দীতে সাতগাঁও গুরুত্ব হারালে লোকজন বিশেষত পর্তুগীজরা হুগলির দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং পতিত জমি চাষাবাদে আনার শর্তে ইজারা[২৯]নেয়। কয়েকটি হিন্দু পরিবার নদীর আরও নীচের দিকে চলে যায় এবং দু টি বসতি গড়ে তোলে যার নামকরণ করা হয় গোবিন্দপুর ও সুতানুটি। তারা বা তাদের উত্তরাধিকারীগণ দেহ-ই-কলকাতা নামে বিদ্যমান একটি গ্রামও লাভ করে এবং এই তিনটি স্থানকেই প্রথম দিকের বৃটিশ রেকর্ডে তিনটি শহর নামে অভিহিত করা হয়েছে।[৩০]

এই তিনটি গ্রাম ক্রয় করার পর কলকাতার নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। এই নিরাপত্তার কাজ আরম্ভ হয়েছিল একটি দুর্গ নির্মাণের অনুমতি লাভের মাধ্যমে। এ কাজের জন্য পুরো কৃতিত্বের দাবিদার কোম্পানীর প্রতিনিধি আয়ার যার ঐকন্তিক প্রচেষ্টায় এসব সুযোগ পাওয়া সম্ভব হয়েছিল। প্রায় দুবছর পর যুবরাজ ইংরেজদের বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অনুমতি পত্রটিও নবায়ন করে দেন। তবে ততদিনে আয়ার আর কোম্পানীর প্রতিনিধি ছিলেন না। তাঁর পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ হয় ১৬৯৯ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি যখন তিনি পরবর্তী প্রতিনিধি জন বিয়ার্ডের (Joha Beard) নিকট দায়িত্ব বুঝে দিয়ে ইংল্যাণ্ড চলে যান[৩১]

এভাবে ইংল্যাণ্ডের রাজা তৃতীয় উইলিয়ামের নামে ফোর্ট উইলিয়াম নির্মাণ করা হয়। উত্তরদিকে আধুনিক কলকত্যার ফেয়ারলি পেলেস (Fairlie Palace) থেকে দক্ষিণে কয়লা ঘাট স্ট্রিট পর্যন্ত বিস্তৃত, পশ্চিম পার্শ্বে নদী এবং পূর্বের সীমানায় বর্তমানের ডালহৌসি স্কোয়ার এই বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এই ফোর্ট উইলিয়াম নির্মাণ করা হয়। ১৭০২ সালে এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়। ১৭০৫-০৬ সালে এই দুর্গের সৈন্য সংখ্যা ১৩০ জন ইউরোপীয় সৈন্যসংখ্যায় উন্নীত করা হয় এবং বেশ কিছু সংখ্যক কামান এতে বসানো হয়।[৩২] এভাবে ইংরেজগণ বাংলার মাটিতে একটি ভূখণ্ড লাভ করে,

---

[২৮] Charles Robert Wilson, *The Early Annals of the English in Bengal (V-I) Asiatic Society*, 1963, The university of California. P. 150.

[২৯] ইজারা অর্থ রাজস্ব খামার (Farm of revenue) খামার পরিচালনাকারীকে ইজারদার বলা হয়। এটিকে মোস্তাফিরও বলা হয়। মোরল্যাণ্ড : The Agrarian System of Molem India. Gollossary, পৃ. ২৭৩।

[৩০] Moreland, W. H., From Akbar to Aurangzab: A stady in Indian Economic History, Low Price Publications, 31 Decebmer, 1989, p. 8

[৩১] Charles Robert Wilson, Ibid P. 150.

[৩২] Charles Stewart, *The History of Bengal*, Black, Parry and Co. Leadenhall street, watts, printer, broxbourne, 1813. p. 359

তাদের বসতির চতুর্দিকে দুর্গ নির্মাণের সুযোগ পায় এবং এটিই শেষ পর্যন্ত শুধু বাংলার নয় বরং সমগ্র হিন্দুস্থানে তাদের পরবর্তী সম্রাজ্যের ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়।

৫.৩ বাংলায় ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রাজনৈতিক আধিপত্য স্থাপন

মধ্যযুগে বাংলার অফুরন্ত সম্পদের প্রাচুর্যতা এত বেশি ছিল যে একসময় সম্পদের কাহিনী প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। এখানকার উন্নত উৎপাদন শিল্প এবং উৎপন্নদ্রব্যের বিশেষ করে কাঁচা রেশম, সুতীবস্ত্র ও খাদ্যশস্যের মূল্য এশিয়ার বণিকদের সাথে সাথে বিদেশী বণিকদের ও আকৃষ্ট করেছিল। তাই আমাদের আলোচ্য সময়কালে দেখি, ইংরেজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, অসটেন্ড, দিনেমার প্রভৃতি ইউরোপীয় কোম্পানী সুবা বাংলায় ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য কুঠি স্থাপন করেছিল। এসব বিদেশী কোম্পানীর মধ্যে ওলান্দাজ ও ইংরেজরাই সতেরো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ও আঠারো শতকের প্রথমার্ধে বাংলার রপ্তানিবানিজ্যে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল। ইউরোপীয় কোম্পানীগুলো বাংলার রপ্তানি বাণিজ্যে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল। ইউরোপীয় কোম্পানীগুলো প্রধানত বাংলার মুলত পন্য নানা রকম বস্ত্র, কাঁচা রেশম ও সোরা ইউরোপ রপ্তানি করত।

১৬০০ সালে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক পত্তন হলেও তাদের প্রথম বানিজ্যিক কার্যক্রমের সূচনা হয় ক্যাপ্টেন হকিন্সের নেতৃত্বে ১৬০৮ সালে সুরাটে বানিজ্যিক তরী পৌঁছানোর পর। ভারতে ইংরেজ বাণিজ্য শুরু হওয়ার পরও প্রথম দিকে বাংলার সঙ্গে প্রত্যক্ষ নৌ-বাণিজ্যের কোন ইচ্ছা ইংরেজদের ছিল না। ১৬৩০ সালে কোম্পানী বাংলার স্থায়ী কুঠি স্থাপনের জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠে। কোম্পানীর কর্মচারীরা লক্ষ্য করে যে, বাংলা থেকে মুসলিপত্তমে চাল, ঘি, চিনি ইত্যাদি আমদানি করলে প্রচুর লাভে বিক্রি করা যাবে। তাই কোম্পানীর কর্মচারীরা বাংলার সুলভ ও সুতীবস্ত্র ও রেশমের দিকে নজর দেয় এবং ব্যক্তিগত ব্যবসার জন্যও তারা প্রলুব্ধ হয়।

১৬৩২ সালে মুঘল সম্রাট শাহজাহানের নির্দেশে সুবাদার কাসিম খাঁ হুগলী থেকে পর্তুগীজদের উৎখ্যাত করার পর ইংরেজরা বাংলায় বাণিজ্য করতে আগ্রহ বেড়ে যায়। এরপর ১৬৩৩ সালে ইংরেজরা হরিহরপুর ও বালেশ্বর কুঠি স্থাপন করে।

১৬৩৯ সালে ইংরেজ কোম্পানীর একজন কর্মচারী ফ্রান্সিস ডে (Francis Day) দাক্ষিণাত্যের চন্দ্রগিরির বাজার কাছ হতে করমন্ডল উপকূলে কিছু জমি ইজারা লাভ করেন। এখানেই ইংরেজরা একটি বাণিজ্যিক কুঠি ও সেন্ট জর্জ নামে একটি দূর্গ প্রতিষ্ঠা করেন। এখানেই কালক্রমে মাদ্রাজ শহর

গড়ে উঠে। এমনকি ১৬৪১ সালে ইংরেজ কোম্পানী বাংলা থেকে বাণিজ্য গুটিয়ে নেবার কথা ভেবেছিল। ১৬৪৪ সালে বাংলায় ইংরেজ কোম্পানীর বাণিজ্যে নিয়োজিত অর্থের পরিমান ছিল মাত্র ১৬০০০ টাকা।

কিন্তু এসময় ইংরেজদের কাছে বাংলার বাণিজ্য অপরিহার্য হয়ে উঠে। মুসলিপত্তম ও মাদ্রাজে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর প্রার্দুভাব এবং পুরো করোমন্ডল উপকূলে রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলে ঐসব এলাকায় কোম্পানীর বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থায় বাংলার পণ্যের বিশেষ করে সুতীবস্ত্রের বাণিজ্য আরো অধিক হারে শুরু করা ছাড়া গত্যন্তর ছিলনা। ক্যাপ্টেন ব্রুকহেভেনের নেতৃত্বে ১৭৫১ সালের প্রথমদিকে হুগলীতে তাদের প্রথম স্থায়ী কুঠি পত্তন করে।[৩৩]

বাংলায় ইংরেজ বাণিজ্যের প্রথম অধ্যায় সমন্ধে বেশিরভাগ ঐতিহাসিকদের মত এই যে, ইংরেজরা বার্ষিক ৩০০০ টাকা দিয়ে বিনাশুল্কে বাণিজ্যের সুবিধা ভোগ করেছে। ১৭১৭ সালের আগে কোম্পানী কখনোই কোন বাদশাহী ফরমানের ফলে বাংলায় এই রকম কোন সুবিধা আইনত ভোগ করেনি।

প্রথম থেকেই, ইংরেজ কোম্পানী স্থানীয় বনিকদের চেয়েও বেশি বাণিজ্যিক সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করত, এবং কোম্পানী অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানীর উপর অন্যায়ভাবে অনেক সুবিধা আদায় করার প্রয়াস চালাত। কোম্পানী এসব বৈষম্যমূলক সুবিধা পেয়েছে নানা ফরমান, নিশান ও পরোয়ানার মাধ্যমে। এ সময়কালে কোম্পানী সবসময় এসব সুবিধা রক্ষা করতে চেষ্টা করেছে। এতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে কোম্পানীর প্রায়ই বিবাদ-বিসংবাদ হয়েছে।

১৬৪২ সালে ইংরেজ ও পর্তুগীজদের মধ্যে সাক্ষরিত এক চু ক্তির ফলে উভয় দেশের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৬৬১ সালে ইংল্যান্ডের রাজা ২য় চার্লস পর্তুগীজ রাজকন্যা ক্যাথারিন ব্রাগাঞ্জাকে বিবাহ করে যৌতুক হিসেবে ভারতের বোম্বাই শহরটি লাভ করেন। কিন্তু কয়েক বছর পর চার্লস বোম্বাই শহরটি বার্ষিক ১০ পাউন্ডের বিনিময়ে কোম্পানীকে বন্দোবস্ত দেন। কোম্পানীর সময়েই বোম্বাই বন্দরের দ্রুত উন্নতি হয় এবং বোম্বাই ইংরেজ কোম্পানীর দ্বিতীয় বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়।

১৬৮৮ খিস্টাব্দে বোম্বাইয়ের ইংরেজ গভর্ণর স্যার জন চাইল্ড (Sir jhon child) ভারতের পশ্চিম উপকূলে মুঘল বন্দরগুলো অবরোধ করে। এ অবস্থায় মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব কোম্পানীর আগ্রাসন নীতিতে ক্ষুব্ধ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে মুঘল সুবাদারদের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। মুঘল

---

[৩৩] Sushil Chaudhuri, *Trade and Commarical Organization in Bengal*, 1650-1720 (Calcutta, 1975) p. 20-26.

ফৌজদার হুগলীতে ইংরেজ কুঠি ধ্বংস করে দেন। চট্টগ্রামে ইংরেজ সেনারা মুঘল বাহিনীর অনুধাবন করতে পারে যে, মুঘলদের সাথে তাদের জয়লাভ করার কোন সম্ভবনা নেই তাই তারা মুঘল সম্রাটের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে। কিন্তু আওরঙ্গজেব বুঝে উঠতে পারেনি, এই ইংরেজ শক্তি ভবিষ্যতে ভারতের বিপদ ডেকে আনবে। জব চার্নকের নেতৃত্বে আওরঙ্গজেবের আদেশে কোম্পানী বাংলায় পুনরায় ফিরে আসে।

ইংরেজ কোম্পানী বাংলায় বিনাশূল্কে বাণিজ্য করা প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকরা বিভিন্ন মাত্রায় এই বাহিনীর প্রকাশ করেছেন। তাদের মতে, ইংরেজদের জন্য এই বিশেষ সুবিধা আদায়ের মূলে আছে গ্যাব্রিয়েল বাউটন নামে এক ইংরেজ চিকিৎসকের মহানুভবতা। বাংলার সুবাদার যুবরাজ শাহ সুজার খুব প্রিয় পাত্র ছিলেন এই গ্যাব্রিয়েল বাউটন। তাঁর চিকিৎসায় খুশি হয়ে শাহ সুজা তাঁকে পুরস্কৃত করতে চাইলে, তিনি ব্যক্তিগত পুরস্কার নিতে অস্বীকৃতি জানান এবং এর বদলে বাংলায় ইংরেজদের বিনাশুল্কে বাণিজ্যের অনুমতি পান। এই বাহিনীর ব্যাখ্যা অনেকেই অনেক ভাবে করলেও এর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, বাউটন বিনাশুল্কে বাণিজ্য শুধু নিজের জন্যই করেছিল, সাধারণভাবে ইংরেজ কোম্পানীর ইংরেজদের জন্য নয়।[৩৪]

কোম্পানীর জন্য ১৬৫১ সালের আগষ্টে প্রথম নিশান শাহ-সুজার কাছ থেকে আদায় করেছিলেন জেমস ব্রিজম্যান। এর বছর খানেক আগে মুঘল সম্রাট শাহজাহানের কাছ থেকে ডেভিজ যে ফরমান পেয়েছিলেন তার ভিত্তিতেই এই নিশান দেয়া হয়। ঐ ফরমানের মূল উদ্দেশ্য ছিল অযোধ্যা, আগ্রা, প্রভৃতি অঞ্চল থেকে সংগৃহীত যেসব পণ্য পশ্চিম উপকূলীয় বন্দরগুলিতে রপ্তানির জন্য পাঠানো হতো সেগুলিকে রাহাদারি বা পথকর থেকে রেহায় দেয়া। দিল্লী থেকে প্রদত্ত ঐ ফরমানের যতো উদার ব্যাখ্যাই করা হোক না কেন, এটা কোন মতেই ইংরেজদের বাংলার রপ্তানি বাণিজ্যের প্রচলিত শুল্ক থেকে অব্যাহতি দেয়নি। ব্রিজম্যান ৩০০০ টাকা উপঢৌকন দিয়ে শাহ সুজার কাছ থেকে নিশান লাভ করেছিলেন। যার ফলে ইংরেজরা বলতে শুরু করলো যে বাদশাহী ফরমান তাদের বাংলায় বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অনুমতি দিয়েছে।[৩৫]

ইংরেজরা ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা নগরীতে একটি দূর্গ নির্মান করে তৎকালীন রাজা তৃতীয় উইলিয়ামের নামানুসারে এর নাম রাখেন 'ফোর্ট উইলিয়াম'।

---

[৩৪] Sushil Chaudhuri, *Trade and Commarical Organization in Bengal*, 1650-1720 (Calcutta 1975) p. 28-30

[৩৫] William Foster, *English Factories in India*, (London: 1930), 1655-1660, p.111.

বাংলায় কোম্পানীর বাণিজ্য কুঠিগুলোকে মাদ্রাজের শাসনমুক্ত করে ফোর্ট উইলিয়ামের অধীনে আনা হয়। কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ামের একটি স্বতন্ত্র কাউন্সিল ও সভাপতি নিয়োগ করা হয়। কোম্পানীর প্রধান উদ্দেশ্যে ছিল আমলাতান্ত্রিক উৎপীড়ন থেকে নিষ্কৃতি লাভের উপায় হিসেবে কেবলমাত্র ইংরেজদের জন্য বিশেষ বানিজ্যিক সুবিধা আদায়। তাই কোম্পানীর প্রধান কাজ ছিল এই ধরনের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা লাভ এবং সেগুলি যেকোনভাবে রক্ষা করা যাতে স্থানীয় পণ্যের বাজারের উপর তাদের প্রভাব বজায় রাখা।

দক্ষিণ এশিয়ার ব্রিটিশ রাজনৈতিক আধিপত্য স্থাপনে ব্রিটিশদের কোন পূর্ব পরিকল্পনা না থাকলেও বিভিন্ন পরিস্থিতি ও ঘটনাপ্রবাহের ফলে ব্রিটিশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে রাণী প্রথম এলিজাবেথ ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্য একচেটিয়া অধিকার দান করে। প্রথম কয়েক বছর এ কোম্পানী মসলা ব্যবসার দিকে নজর দেয় পরবর্তীতে সেখানে ব্যর্থ হয়ে কোম্পানী ভারত বাণিজ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে।[৩৬] ভারতের মূল ভূ-খন্ডে ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে ইংরেজরা তেমন সফল হতে পারেনি কারন তাদের সফলতার প্রধান প্রতিবন্ধক ছিল মোঘল দরবারে পূর্ব থেকেই প্রভাব বিস্তারকারী পর্তুগীজরা।

এসময় ভারতের শাসন ক্ষমতায় ছিলেন সম্রাট জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৭)। এছাড়া কোম্পানীর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পর্তুগীজরা পূর্ব থেকেই এখানে অবস্থান করছিল। তবে, নানাবিধ কারণে জাহাঙ্গীরের আমলে পর্তুগীজদের কর্মতৎপরতায় কিছুটা ভাটা পড়ে। এমতাবস্থায় ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। নিম্নে তাদের পদক্ষেপসমূহ আলোচনা করা হলঃ

১৬০৮ খ্রিষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন হকিন্স নামে একজন নাবিক ইংল্যান্ডের সমসাময়িক কালের রাজা প্রথম জেমসের (১৬০৩-১৬২৫) একটি পত্র নিয়ে মুঘল দরবারে আসেন। ইংল্যান্ডের রাজা এই পত্রে ভারতে ইংরেজ বনিকদের কিছু সুযোগ সুবিধা প্রদানের অনুরোধে জানিয়েছিলেন কিন্তু পর্তুগীজ এ জেসুইটদের বিরোধিতায় হকিন্স ইংরেজদের জন্য বিশেষ সুবিধা আদায় করতে না পারলেও স্যার টমাস রো এর প্রচেষ্টায় জাহাঙ্গীর ইংরেজদের কিছু বানিজ্যিক সুবিধা প্রদান করে ফরমান জারি করে। ফরমানের শর্ত অনুযায়ী-

---

[৩৬] সিরাজুল ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস, ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো* (ঢাকা : চয়নিকা ২০০৮), পৃ. ৯।

ক. ইংরেজরা পর্তুগীজ কর্তৃক আক্রান্ত হলে গুজরাটের শাসনকর্তা অস্ত্র দিয়ে তাদের সাহায্য করবেন।

খ. ইংরেজ বণিকদের শুল্ক কর্মকর্তারা কোনরূপ হয়রানি করতে পারবে না।

গ. ইংরেজদের পণ্য বন্দরে ভিড়ালেই শুধু শুল্ক নির্ধারণ করা যাবে।

ঘ. ইংরেজ বণিকরা যেকোন বন্দরে স্বাধীনভাবে ঘর ভাড়া নিতে পারবে।

ঙ. ইংরেজ কোম্পানীর কোন কর্মচারীকে মুঘল শাসনকর্তা বন্দী করতে পারবে না।[৩৭]

এই ফরমান বলে কোম্পানী সর্বপ্রথম **১৬১৩** সালে ভারতের পশ্চিম উপকূল বন্দর সুরাটে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। এভাবে স্যার টমাস রো ভারতে ভবিষ্যত ইংরেজ বাণিজ্যের প্রাথমিক ভিত গড়ে তোলেন। যদিও সুরাটে কুঠি স্থাপন করতে বহু বাধা মোকাবিলা করতে হয়।[৩৮] মূলত **১৬১৩** সালে সুরাটে বাণিজ্যকুঠি প্রতিষ্ঠা করে নিজেদের অবস্থান পাকা পোক্ত এবং একচেটিয়া মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে কোম্পানী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

পরবর্তীতে কোম্পানী **১৬৩৩** সালে উড়িষ্যার হরিহরপুরের বালাসোরে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে শুরু হওয়া কোম্পানীর বাংলা বাণিজ্য প্রথমে দ্বিধাদ্বন্দের মাধ্যমে অতিবাহিত হলেও **১৬৫০** সালে বাংলায় একটি বাণিজ্য কুঠি নির্মানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

হান্টার এর মতে

The arrival of the English at Hagli in 1650 promised an accession of trade to the new imperial part and an increased custom revenue to the Mughal Governor.[৩৯]

১৬৫১ সালে ইংরেজরা বাংলায় বাণিজ্য করার উদ্দেশ্য হুগলীতে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করে। অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম এটিকে বাংলার ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার **১**ম গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক হিসেবে অভিহিত করেছেন।[৪০]

ঐ বছর বাংলার সুবেদার শাহ সুজা (**১৬৩৯-৬০**) ইংরেজদেরকে বিনা শুল্কে বাংলায় অবাধ বাণিজ্য করার অধিকার দেন। শর্ত ছিল কোম্পানী সরকারকে বাৎসরিক তিন হাজার টাকা রাজস্ব দিবে।[৪১]

---

[৩৭] এ. কে. এম শাহনেওয়াজ, *ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ* (মোগল পর্ব) (ঢাকা : প্রতীক, ২০০৭), পৃ. ১২-১৩।

[৩৮] রুস্তম আলী, *উপমহাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও দেশ বিভাগের প্রেক্ষাপট* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪) পৃ. ১৭০।

[৩৯] Hunter, *A History of Britith India*, Vol-2, (London : Longmans Green and Co., 1912) p. 96.

[৪০] সিরাজুল ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস : ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো* (ঢাকা : চয়নিকা ২০০৮), পৃ. ১০।

১৬৪৯-১৬৮৯ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়কালে কোম্পানী বাণিজ্যে প্রভূত উন্নতি করে। তাদের উন্নতি ও লভ্যাংশ বৃদ্ধির ফলে কোম্পানীর উচ্চকাঙ্খা ও বাড়তে থাকে। ১৬৫৭ সালে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী একটি নতুন সনদ লাভ করেন, যার দ্বারা কোম্পানী যুদ্ধ ঘোষণা, শান্তি স্থাপন ও বিচারকার্য সমাধা সহ নানা প্রকার ক্ষমতা ও সুবিধা প্রাপ্ত হয়।[৪২]

অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ পেয়ে কোম্পানী তাদের বাণিজ্য দ্রুত সম্প্রসারন করতে থাকে। এ সময় কাশিম বাজার (১৬৫৮), পাটনা (১৬৫৮), ঢাকা (১৬৬৮), রাজমহল ও মালদহ প্রভৃতি স্থানে কোম্পানী নতুন কুঠি স্থাপন করে। ১৬৮০ সাল নাগাদ কোম্পানীর বাণিজ্য দেশের সর্বত্র বিস্তার লাভ করে। বাণিজ্য বৃদ্ধির সাথে সাথে সরকারের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ ও বৃদ্ধি পায়। কোম্পানীর অভিযোগ ছিল সরকারী কর্মচারীরা কোম্পানীর কর্মচারীদের অযথা হয়রানি করে উৎকোচ দিতে বাধ্য করে। সরকারের অভিযোগ ছিল, কোম্পানী শর্ত মোতাবেক বাণিজ্য না করে অসুদপায় অবলম্বন করছে। ১৬৮২ সালে বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যবস্থাপনার জন্য উইলিয়াম হেজেজকে প্রথম গর্ভনর নিযুক্ত করা হয়। হেজেজই প্রথম ব্যবসার স্বার্থে বাংলায় ব্রিটিশ সামরিক উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। ১৬৮৬ সালে হেজেজের স্থলে গর্ভনর হিসেবে নিযুক্ত হন জব চার্নক।[৪৩]

তিনি সুবা বাংলায় কোম্পানীর রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চট্রগ্রামে একটি সামরিক ঘাটি প্রতিষ্ঠা করে ১৬৮৬ সালের ডিসেম্বর মাসে হুগলী আক্রমন করে। আর এ যুদ্ধাবস্থা ১৬৮৬ সাল থেকে ১৬৮৯ সাল পর্যন্ত জলে ও স্থলে বিরাজমান ছিল।[৪৪]

এভাবেই চারবছর এ্যাংলো মুঘল যুদ্ধের পর সরকারের অর্থনীতির উপর নেতিবাচক প্রভাব এবং আর্থিক সংকটের দরুণ সম্রাট আওরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭০৭) বিবাদ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন। এ্যাংলো-মুঘল যুদ্ধের পর সম্রাট আওরঙ্গজেব কোম্পানীর মিনতি গ্রহণ করে ১৬৯০ খ্রিঃ এক নতুন ফরমানে একটি শান্তিচুক্তি করে। কোম্পানীকে সেই চুক্তি অনুযায়ী এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা করা হলেও কোম্পানী সারাদেশে বাৎসরিক তিন হাজার টাকার বিনিময়ে বিনা শুল্কে বাণিজ্য

---

[৪১] Brijen k. Gupta, Sirajuddaulah & The East India Company : 1756-1757 (Laiden : E. J. Brill, 1966). P. 3.

[৪২] ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখি বর্মন, *ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন*, (ঢাকা : আজিজিয়া বুক ডিপো., ২০০৫) পৃ. ২১।

[৪৩] সিরাজুল ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস : ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো* (ঢাকা : চয়নিকা ২০০৮), পৃ. ২।

[৪৪] এম এ রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, (ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ২০১১) পৃ. ৩৪১।

করার অধিকার পায়। এটিকে ঐতিহাসিকগণ ইংরেজদের কূটনৈতিক বিজয় বলে অভিহিত করেছেন।[৪৫]

এছাড়াও মুঘল সম্রাটের নিকট থেকে কোম্পানী সুতানুটিতে তাদের প্রধান কুঠি স্থাপনের পর থেকে কোম্পানী আশেপাশের এলাকায় আধিপত্য স্থাপন করে। ফলে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি দেখা দিলে ইংরেজ বনিকরা আত্মরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুবেদার ইবরাহীম খাঁনের (১৬৮৯-৯৭) নিকট আবেদন করলে তিনি তাদের আরজি মঞ্জুর করেন। এ সুযোগে ১৬৯৬ সালে কোম্পানী সুতানুটি বসতিতে তৎকালীন বৃটিশ রাজার নামে ফোর্ট উইলিয়াম দূর্গ নির্মান করেন। এমনিভাবে স্থাপিত হয় এদেশে কোম্পানীর আধিপত্য স্থাপনের আরেকটি শক্ত খুঁটি। ফোর্ট উইলিয়াম দূর্গ নির্মানের দুই বছর পর কোম্পানী সুবেদার আজিম-ইস-শানকে (১৬৯৭-১৭০৪) ষোল হাজার টাকা নজরানা প্রদান করে তিনটি মৌজার(সুতানুটি, কলকাতা, গোবিন্দপুর) উপর জমিদারী স্বত্বদানের আরজি জানায়।[৪৬]

সুবেদার ১৬৯৮ সালে যে আরজি মঞ্জুর করে সরকারকে বার্ষিক ১১৯৪ টাকা ১৪ আনা ৪ পয়সা জমাদানের শর্তে কোম্পানীকে উক্ত তিনটি মৌজার জমিদারী সনদ প্রদান করে। বাংলায় কোম্পানীর সার্বভৌমত্বের বীজ উপ্ত হয় ১৬৯৮ সালে, যখন কোম্পানী কলকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর নামক তিনটি গ্রামের উপর জমিদারীর স্বত্ব লাভ করে এবং তথায় দুর্গ স্থাপন করতে অনুমতি পায়। ফামিংগার ঠিকই বলেছেন যে, ঐ তিনটি গ্রামের উপর স্বত্বই ধীরে ধীরে প্রসারিত হয়ে অবশেষে গোটাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় কোম্পানীর সার্বভৌমত্ব।[৪৭]

কোম্পানীর জমিদারীসত্ব লাভ ঐতিহাসিকভাবে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এখন থেকে কোম্পানী শুধু বিদেশী বণিক নয়, দেশের শাসক শ্রেণীর সদস্য।[৪৮]

কোম্পানীর আধিপত্য বিস্তারের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হল ১৭১৭ সালে সম্রাট ফররুখ শিয়ারের (১৭১৩-১৭১৯) নিকট প্রাপ্ত ফরমান। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুরপর থেকে সিংহাসন ও অন্যান্য উচ্চপদ নিয়ে বিবাদ ও গৃহযুদ্ধ ছিল নিত্যনৈমেত্তিক ব্যাপার। এ সুযোগে কোম্পানী সরকারকে নানারকম পেশকাশ প্রদান করে অনেক সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নেয়। ১৭১৫ সালে কোম্পানী শারমেনের

---

[৪৫] Brijen k. Gupta, *Sirajuddaulah & The East India Company* : 1756-1757 (Laiden : E. J. Brill, 1966). P.5.

[৪৬] Brijen k. Gupta, Ibid, P.6.

[৪৭] W. K. Firminger, Historical Introduction to the Bengla Portion of the fifth Report (Indian Studies edition), (Calcutta : 1962), p. 78.

[৪৮] সিরাজুল ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস : ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো*, (ঢাকা : চয়নিকা ২০০৮), পৃ. ১২।

নেতৃত্বে সম্রাট ফররুখ শিয়ারের কাছে প্রতিনিধি প্রেরণ করে ৩০ হাজার পাউন্ড পেশকাশ বা পুরস্কার প্রদান করে বাংলা বাণিজ্য কোম্পানীর জন্য কিছু বাড়তি সুযোগ-সুবিধা প্রদান আবেদন করে। মারমেনের আবেদন মঞ্জুর করে কোম্পানীকে অনেক নতুন সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার দিয়ে ১৭১৭ সালে সম্রাট ফররুখ শিয়ার একটি ফরমান জারি করেন।[৪৯]

ক. বাৎসরিক তিন হাজার টাকা রাজস্বের বিনিময়ে কোম্পানী সারাদেশে বিনাশুল্কে অবাধ বাণিজ্য করবে।

খ. কোম্পানীর মালামাল চুরি হলে ও সরকার তা ফিরিয়ে দেবে অথবা সমমূল্যের ক্ষতিপূরণ দিবে।

গ. মূল সনদ স্থানীয় কর্মচারীদের না দেখাবার অধিকার।

ঘ. ফ্যাক্টরী প্রধান প্রদত্ত দস্তক প্রদশনপূর্বক মালামাল চেক না করার জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান।

ঙ. মুর্শিদাবাদ টাকশালে কোম্পানীর নিজস্ব মুদ্রা তৈরীর অধিকার।

চ. সুবেদার কলকাতার পাশ্ববর্তী আরও ৩৮টি গ্রামের জমিদারী সনদ কোম্পানীকে দিবেন।

ছ. কোম্পানীর অধীনস্ত কর্মচারীদের বিচার করার অধিকার কোম্পানীর থাকবে।

১৭১৭ সালের ফরমান কোম্পানীকে উপমহাদেশে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দেয়। ফররুখ শিয়রের ফরমান দ্বারা দেশের সার্বভৌমত্বকে আংশিকভাবে বিকিয়ে দেয়া হয় বলা যেতে পারে।[৫০]

মূলত: সামান্য অর্থের বিনিময়ে এই ফরমান একদিকে যেমন দেশের সার্বভৌমত্বকে আংশিক ভাবে বিকিয়ে দেয়া হয় অন্যদিকে ব্রিটিশ আধিপত্যবাদকে আরও মজবুত করতে সহযোগিতা করে। ইংরেজদের বাণিজ্যের দ্রুত উন্নতি হয় এবং তারা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। বাণিজ্যের ঐশ্বর্য্যের বলে ইংরেজ বণিকগণ রাজনৈতিক শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ লাভ করে। বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে আগমন করলেও বিভিন্ন ঘটনার ফলে তারা উপমহাদেশের রাজনীতিতে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ে। উপমহাদেশের তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর অযোগ্যতা, দূর্বলতা, বিভেদ ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ইংরেজ বেনিয়াদের আধিপত্য বিস্তারের পথকে সুগম করে তোলে। এক পর্যায়ে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বেনিয়া থেকে রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। পরবর্তীকালে এ কোম্পানী ভারতে রাষ্ট্রক্ষমতা

---

[৪৯] সুকুমার ভট্টাচার্য : *দি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এন্ড দি ইকনোমি অব বেঙ্গল*, ১৭০৪-১৭৪০, কলকাতা, ১৯৬৯.

[৫০] সিরাজুল ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস : ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো* (ঢাকা : চয়নিকা ২০০৮), পৃ. ১৩।

দখল করে এবং ১৮৫৮ সালে বিলুপ্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশ শাসন করে। ঐতিহাসিক তারাচাঁদ এর মতে- “যে পদ্ধতিতে ইংরেজরা ইন্ডিয়ার উপকূলে এসে তাদের রাজনৈতিক সৌভাগ্য প্রস্ফুটিত হওয়া পর্যন্ত ১৫০ বছর অত্যন্ত ধৈর্য্যের সাথে তাদের বাণিজ্য পরিচালনা করেছিল পরবর্তীতে তাদের উপমহাদেশ দখল মানব ইতিহাসে একটি চমকপ্রদ বিষয়”।[৫১] এভাবে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কলাকৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে কোম্পানী দুর্বল সম্রাটদের নিকট থেকে বাণিজ্যিক সুবিধা সম্বলিত ফরমান লাভ করে। ব্রিজেন কে গুপ্ত বলেন-

A Century of English trade in Bengal left the relations between the provincial administrators and the East India Company strained. So long as trade was modest the relations had been cordial. The company’s agents made generous present to the Mughal officials and in return reside patronage.[৫২]

এসব ফরমানের অপব্যবহারের মাধ্যমে কোম্পানীর বাণিজ্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।[৫৩]

কোম্পানী সম্রাট ফররুখ শিয়রের কাছ থেকে ১৭১৭ সালে ফরমান লাভ করলেও বাংলার সুবেদার - মুর্শিদকুলি খান (১৭১৭-১৭২৭) সুজাউদ্দিন খান (১৭২৭-১৭৩৯) ও আলীবর্দী খান (১৭৪০-১৭৫৬) সেই ফরমান কার্যকর করতে অস্বীকৃতি জানান। কিন্তু, প্রত্যেক সুবেদার অতি কৌশলে কোম্পানীর সাথে সরাসরি দ্বন্দ্ব এড়িয়ে চলেন। অন্যদিকে মুর্শিদকুলি খানের পর থেকে শুরু হয় প্রাসাদ ষড়যন্ত্র। সেই ষড়যন্ত্রের সুযোগে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে কোম্পানী।

কোম্পানীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন আমলাতান্ত্রিক উৎপীড়ন থেকে নিষ্কৃতলাভের উপায় হিসেবে কেবলমাত্র ইংরেজদের জন্য বিশেষ বাণিজ্যিক সুবিধা আদায়। তাই তাদের প্রধান অভিসন্ধি ছিল এই ধরনের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা লাভ এবং সেগুলো যেকোনভাবে রক্ষা করা যাতে স্থানীয় পণ্যের বাজারের উপর তাদের একাধিপত্য বজায় থাকে।

---

[৫১] Tara Chand, *History of the Freedom Movemet in India*, Vol. 1 (New Delhi : Director of Publications Divdision, Govt. of India, Patiala House, 1990) p. 227.

[৫২] Brijen k. Gupta, Sirajuddaulah & The East India Company : 1756-1757 (Laiden : E. J. Brill, 1966). p.8.

[৫৩] Anil Saxena (ed.), *Encyclopaedia of Indian History*, Vol. 25 (New Delhi : Anmol Publication Ltd. 2006), p. 2.

কিন্তু স্থানীয় শাসকবর্গ কোম্পানীর বিশেষ সুবিধাভোগের পথে নানাভাবে বাঁধা দিয়েছে। তবে তারা বিদেশী বণিকদের কামধেনু'র মতো দোহন করেছে বলে যে মত প্রচলিত আছে তা পুরোপুরি মেনে নেয়া যায় না। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে, নবাবের কর্মচারীরা শাসনের নামে শোষণ করতো না। কোম্পানীর বিশেষ সুবিধা ভোগের প্রশ্নটির নানা জটিল দিক আছে।

যতদিন ইংরেজদের শুল্কের পরিমান সামান্য ছিল ততদিন মুঘল কর্মচারীরা শুল্করেহাই এর ব্যাপারটি নিয়ে বেশি মাথা ঘামায়নি এবং এ নিয়ে কখনো কোন অসুবিধা দেখা দিলে ইংরেজরা উপহার উৎকোচ দিয়ে তা দূর করার ব্যবস্থা করেছে। তবে কোম্পানীর সঙ্গে বাংলার শাসকগোষ্ঠীর বিবাদ-বিসংবাদের সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে কোম্পানীর বিশেষ সুযোগ- সুবিধার ব্যাপারগুলি অস্পষ্টতা, যার সুযোগে উভয় পক্ষ নিজেদের স্বার্থ অনুযায়ী সুবিধাগুলো ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতো।

ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য রাজনৈতিক অভিলাষে রূপান্তর

১৭৫৬ সালে আলীবর্দী খানের মৃত্যুর পর সিরাজ-উদ-দৌলা বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন।[৫৪]

সিংহাসনে আরোহণের পর থেকে তাঁর বিরুদ্ধে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র শুরু হয়। তিনি ১৭৫৬ সালের ১৬ জুন কলকাতা দখল করলেও পরবর্তীতে নানা কারণে ১৭৫৭ সালের ২ জানুয়ারী কোম্পানী পুনরায় কলকাতা পুনরুদ্ধার করে এবং সিরাজউদদ্দৌলাকে আলী নগরের সন্ধি নামক শান্তি চুক্তি করতে বাধ্য করে।

ব্রিজেন কে. গুপ্ত তার গ্রন্থে উল্লেখ করেন-

> The re-establishment of the company's settlements in Bengal after the English defed as calcutta was possible in one of two ways. The first was to approach to nawab to forgive the company; The other was to avenge the defect by force.[৫৫]

১৭৫৭ সালের ৯ ফেব্রুয়ারী সম্পাদিত আলীনগরের সন্ধিতে বলা হয়-

ক. ১৭১৭ সারে বাদশাহী ফরমান বাস্তবায়ন এবং ফরমানে উল্লেখিত কলকাতার পার্শ্ববর্তী ৩৮টি মৌজা কোম্পানীকে হস্তান্তর করা।

---

[৫৪] Brijen k. Gupta, *Sirajuddaulah & The East India Company* : 1756-1757 (Laiden : E. J. Brill, 1966). p.50.

[৫৫] Brijen k. Gupta, Ibid, p.85.

খ. দস্তকমুক্ত মালামাল নবাবী চৌকিতে তল্লাশী না করা।

গ. কোম্পানীর ব্যবসা শুল্কমুক্ত করা।

ঘ. কলকাতায় দুর্গ ও টাকশাল তৈরীতে বাধা না দেয়া।

ঙ. কোম্পানীকে ক্ষতিপূরণ দেয়া।

চুক্তির শর্তসমূহ বিশ্লেষণে দেখা যায় এ চুক্তি কোম্পানীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক ১৭১৭ সালের ফরমানের পূর্ণ বাস্তবায়ন হয় ১৭৫৭ সালের আলীনগর সন্ধিতে। সিরাজ-উদ-দৌলা ছিলেন একজন স্বাধীনচেতা নবাব। কিন্তু আলীনগরের সন্ধির মাধ্যমে তার অসহায়ত্ব প্রকাশ পায়। ফলে, কোম্পানী নবাবের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ১৭৫৭ সালে ২২ মার্চ ফরাসীদের দুর্গ চন্দননগর দখল করে তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।[৫৬]

এভাবে কোম্পানীর বিজয়কে স্থায়ী রূপ দিতে এবং সিরাজ-উদ-দৌলাকে উৎখাতের লক্ষ্যে ১৭৫৭ সালের ৪ জুন কোম্পানীর পক্ষ থেকে উইলিয়াম ওয়াটস ও ষড়যন্ত্রকারীদের পক্ষে মীর জাফরের মধ্যে জগৎশেঠের বাড়িতে একটি গোপন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির শর্তসমূহ ছিল–

ক. উভয়পক্ষ আলীনগরের সন্ধি পালন করবে।

খ.সমুদয় সম্পত্তিসহ সকল ফরাসিদের ইংরেজদের নিকট সমর্পণ করা হবে।

গ. কোম্পানীর সকল শত্রু নবাবের শত্রু হিসেবে গণ্য হবে।

ঘ. নবাবের প্রয়োজন হলে কোম্পানী সামরিক সাহায্য দিবে, তবে খরচ বহন করবে নবাব।

ঙ. কলকাতা আক্রমন করার কারণে কোম্পানীকে ক্ষতিপূরণবাবদ ১ কোটি টাকা দিতে হবে।

চ. কলকাতার আশেপাশের জমিদারী সমূহ এবং কলকাতার দক্ষিণ সমুদ্র পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলের উপর কোম্পানীকে জমিদারিস্বত্ব প্রদান করা হবে।

ছ. হুগলীর মাটিতে ভবিষ্যত কোন নবাবী দুর্গ স্থাপন করা হবেনা। বিনিময়ে মীর জাফরের নবাবী রক্ষার ব্যাপারে কোম্পানী সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে।

---

[৫৬] M.A. Rahim, *The Muslim Society and Politics in Bengal A.D 1754-1947* (Dhaka : University of Dhaka, 2011) p. 12.

মীর জাফর ও কোম্পানীর চুক্তি কোম্পানীর ভিত মজবুত করে। এরপর সিরাজ-উদ-দ্দৌলা আলী নগরের সন্ধি মেনে চলছে না এ অভিযোগ এনে কোম্পানী তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ২৩ জুন বৃহস্পতিবার সকাল ৮ টায় মুর্শিদাবাদ থেকে ২৩ মাইল দক্ষিণে ভাগীরথি নদীর তীরে পলাশীর প্রান্তরে যুদ্ধ শুরু হয়। বিকাল ৪টায় যুদ্ধ সমাপ্ত হয়। প্রথমদিকে সিরাজ-উদ-দ্দৌলা জয়ী হলেও মীর জাফরের ষড়যন্ত্রে অবশেষে তিনি পরাজিত হন। পরাজিত হয়ে সিরাজ রাজমহলে যাওয়ার পথে মীর কাসিম কর্তৃক ধৃত হন এবং মীর জাফরের পুত্র মীরণের নিদের্শে তাকে হত্যা করা হয়। পলাশীর যুদ্ধ কোম্পানী ১৭১৭ সালের ফরমান এবং আলীনগরের সন্ধির মাধ্যমে যে অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল তা পূর্ণভাবে লাভ করে। পলাশীর যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার স্বাধীন শাসনের সমাপ্তি ঘটে এবং এই প্রদেশে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী শক্তিশালী রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তিরূপে আর্বিভূত হয়। পলাশীর যুদ্ধের ফলে কোম্পানী বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে যে কোম্পানী ছিল ভারতীয় শাসকগোষ্ঠীর কৃপাপ্রার্থী আজ তারাই রাষ্ট্রক্ষমতার নিয়ন্ত্রন লাভ করে। ইংরেজরা King makers বা নৃপতি স্রষ্টার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।[৫৭]

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও পলাশীর যুদ্ধের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এ যুদ্ধের পর থেকে কোম্পানীকে মূলধন হিসেবে আর বৃটেন থেকে স্বর্ণরৌপ্য আমদানি করতে হয়নি। বাংলা অঞ্চল থেকে সংগৃহীত রাজস্ব দিয়ে কোম্পানী সমগ্র এশিয়ায় ব্যবসা পরিচালনা করে।

ব্রিজেন কে গুপ্ত বলেন–

Indeed, at the battle of plassey Bengal had surrendered its desting to the East India Company. The Economic and political Consequences the defeat of Sirajuddaula have become legendary in Indian history. Economically the defeat marked the begining of the impoverisment of the Indian economy and the establishment of an economic imperialis ruthless

---

[৫৭] M.A. Rahim, *The Muslim Society and Politics in Bengal A.D 1754-1947* (Dhaka : University of Dhaka, 2011) p. 14.

in its from. Politacally the extension of the protectorate over Mirjafor paved the way for the creation of the British empire in India.[58]

এ যুদ্ধের ফলে কোম্পানীর উপর দেশীয় সরকারের যে নিয়ন্ত্রন ছিল তার অবসান ঘটে। বার্ষিক তিন হাজার টাকা পেশকাশের বিনিময়ে কোম্পানী বিনাশুল্কে বৈদেশিক বাণিজ্যের সুযোগ লাভ করে। পলাশীর কোম্পানীর লোকদের দাপট এমনভাবে বেড়ে যায় যে, কোম্পানীর দস্তক ব্যবহার করে তারা বিনাশুল্কে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে অবাধ যোগদান করে। ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।[৫৯]

পলাশীর যুদ্ধের পর কোম্পানীর ভূ-খন্ড আরো সম্প্রসারিত হয়। পলাশীর যুদ্ধের ফলে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার স্বাধীনতার অবসান হয়। ১৭৫৭ সালের জুন মাসে কোম্পানী মীরজাফরকে মুর্শির্দাবাদের মসনদে প্রতিষ্ঠিত করেন। গোপন চুক্তির শর্তানুযায়ী তিনি কোম্পানীকে প্রচুর টাকা ও বিশেষ বাণিজ্যিক সুবিধাদি প্রদান করেন। এছাড়া তিনি কোম্পানীকে চব্বিশ পরগণার জমিদারিত্ব দিতে বাধ্য হন।[৬০]

এভাবে প্রচুর অর্থসম্পদের মালিক হয়ে কোম্পানী ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সূচনা করে। বাংলার সম্পদ, অর্থ ওজনবল দিয়েই ইংরেজরা দক্ষিণাত্যে তৃতীয় কর্ণাটের যুদ্ধে ফরাসীদের পরাভূত করে। এভাবে পলাশী যুদ্ধের পর বাংলার কোম্পানীর রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলা থেকে ভারতে এবং ভারত থেকে সমগ্র ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বৃটিশরা আধিপত্য বিস্তার করে। আর মীর জাফর ছিলেন ইংরেজদের হাতের পুতুল।[৬১] ডঃ অনীল সাক্সেনা বলেন-

After the battle of plassey clive emerged the supreme controller of the political desting of Bengal.[৬২]

---

[৫৮] Brijen k. Gupta, *Sirajuddaulah & The East India Company* : 1756-1757 (Laiden : E. J. Brill, 1966). P. 127.

[৫৯] Brijen k. Gupta, Ibid,. P. 133.

[৬০] Ramkrishna Mukherjee, *The Rise and Fall of the East India Company* (Bombay : Popular Prokashon, 1958), p. 268.

[৬১] A.R. Mallik, *British Policy and the Muslims in Bengal*, 2nd ed. (Dhaka : Bangla Academy, 1977), p. 31.

[৬২] Anil Saxena, *Encyclopaedia of Indian History*, Vol. 25 (New Delhi : Anmol Publication,, 2006), p. 02.

মীর জাফরের সাথে গোপন চুক্তি এবং নবাবের বিপর্যয় এটাই প্রমান করে যে কোম্পানী বাংলায় একটি অপরাজেয় শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং বাংলার রাজনৈতিকভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের কারণে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নীতিতে পাশ্চাত্য নীতির অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে।

ঐতিহাসি তারাচাঁদ এর মতে-

The Adventure which had commenced in the sixteenth Century under the stress Mercantilist forces for the achievement of wealth and power, had at last culminated in sucess unparallelled in history. This extra ordinary phenomenon had three phases, in its first phase. The east india company's activities were confined to trade in the second phase the company entered into armed conflict with its European rirals, establised its trade monopoly and acquired political influence in India. In the third phase which began the battle of plassey.[৬৩]

বাংলায় কোম্পানীর ক্ষমতালাভের ক্ষেত্রে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হল ১৭৬০ সালে মীর কাশিমের ক্ষমতা লাভ। ১৭৫৭-১৭৬০ পর্যন্ত মাত্র তিন বছরে ষড়যন্ত্র করে ক্ষমতায় আসা নবাব মীর জাফর কোম্পানীর যাবতীয় চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ এই অজুহাতে ফোর্ট উইলিয়ামের গর্ভণর ভান্সিটার্ট মীর জাফরকে পদচ্যুত করতে বদ্ধ পরিকর হন। ১৭৬০ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর কোম্পানী ও মীর জাফরের জামাতা মীর কাশিমের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

চুক্তির প্রধান শর্তগুলো ছিল:

ক. মীর কাশিম ও কোম্পানীর মধ্যে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।

খ. নবাবের শত্রু কোম্পানীর শত্রু বলে বিবেচিত হবে।

গ. কোম্পানীর সৈন্য নবাবকে সবর্দা সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকবে। কোম্পানীর যাবতীয় খরচ ও সেনাবাহিনী পোষণ বাবদ নবাব বর্ধমান, মেদীনিপুর ও চট্টগ্রামের কর্তৃত্ব দখল কোম্পানীকে দিয়ে দিবে।

---

[৬৩] Tara Chand, *History of Freedom Movement in India*, Vol. II (New Delhi : Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, 1983), p. 35.

ঘ. একের এলাকায় অন্যের প্রজা বাস করতে পারবেনা। কোন পলাতককে কারো এলাকায় আশ্রয় দেয়া হবে না।

ঙ. শাহাজাদা বাংলা আক্রমন করলে উভয়ে তা প্রতিরোধ করবে।

চুক্তি স্বাক্ষরের পর ১৭৬০ সালের ১৮ অক্টোবর গর্ভণর ভ্যান্সিটার্ট মীর জাফরকে তার ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করে মীর কাশিমকে ডেপুটি নবাব হিসেবে নিয়োগ দিতে বললে মীর জাফর তাতে অস্বীকৃতি জানায়, ফলশ্রুতিতে কর্ণেল কাইলাউট ও মীর কাশিম মুর্শিদাবাদের মীর জাফরস প্রাসাদ অবরোধ করে সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য করে। উপরযুক্ত চুক্তি এবং মীর কাশিমের ক্ষমতায় আরোহণ (২০ সেপ্টেম্বর ১৭৬০) থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, নবাব হচ্ছে কোম্পানীর হাতের পুতুল। কোম্পানী চাইলে নবাব থাকবে, না চাইলে থাকবে না। এ চুক্তি বলে কোম্পানী বর্ধমান, মোদিনীপুর ও চট্টগ্রামের মত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ জেলার উপর নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে এবং কোম্পানী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভাবে শক্তিশালী হতে থাকে। কোম্পানীর সাথে মীর কাশিমের গোপন চুক্তি এদেশে মোঘল শাসনের অবসান ঘটিয়ে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াকে তরান্বিত করে।

মীর কাশিম ছিলেন দেশাত্ববোধসম্পন্ন, স্বাধীনচেতা ও সুদক্ষ শাসক। ফলে, অচিরেই ইংরেজদের সাথে নবাবের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। কোম্পানীর কর্মচারীদের শুল্কবিহীন ব্যক্তিগত ব্যবসাকে কেন্দ্র করে নবাব ও কোম্পানীর মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে যা যুদ্ধের রূপ নেয়। ১৭৬৩ সালের জুন মাসে যুদ্ধ শুরু হয়ে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। মীর কাশিম মুঙ্গের পাটনাসহ কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। অন্যদিকে কোম্পানী ১৭৬৩ সালের জুলাই মাসে মীর জাফরকে পুনরায় মুর্শিদাবাদের নবাব বলে ঘোষণা করে ফলশ্রুতিতে জনগণ ও নবাবের সৈন্যরা সহজেই বিভ্রান্ত হয় যা মীর কাশিমের পরাজয়কে তরান্বিত করে। ১৭৫৭-১৭৬৪ খ্রি: পর্যন্ত ইংরেজদের সাথে সর্বমোট ৮টি যুদ্ধ হয়। প্রথম ৭টি যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর মীর কাশিম ১৭৬৪ সালে ত্রিশক্তি আতাঁত করেন।

মীর কাশিম ছিলেন দূরদর্শী রাজনীতিবিদ ও কর্মদক্ষ প্রশাসক। তিনি বুঝতে পারেন যে, কোম্পানীর নাগপাশ থেকে রেহাই পেতে হলে প্রথমে প্রয়োজন সমস্ত চুক্তিবদ্ধ ঋণ পরিশোধ করা। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি কৃষি ও ব্যবসা বাণিজ্যে নিয়ম-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন ও কোম্পানীকে দেয় সমস্ত ঋণ পরিশোধ করেন। মীর কাসিম কোম্পানীকে প্রভুর ভূমিকা থেকে নামিয়ে পূর্বের মতো সাধারণ ব্যবসায়ীদের পর্যায়ে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালান।

ইংরেজদের ফরমানের অবমাননা, মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তর, মীর কাশিমের সামরিক বাহিনীর পুর্ণবিন্যাস, ইংরেজদের মিত্র ভাবাপন্ন, কর্মচারী ও জমিদারদের দমন, অস্ত্র-কারখানা নির্মাণ এবং সর্বোপরি অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের শুল্ক প্রথা রহিতকরণ প্রভৃতি কারণে ১৭৬৪ সালের অক্টোবরে মীর কাশিম, অযোধ্যের নবাব সুজাউদ্দৌলা ও দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের সম্মিলিত বাহিণী ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে বক্সারে মুখোমুখি হয়। এই যুদ্ধে ইংরেজরা কেবলমাত্র বাংলার নবাবকে নয়, অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা এবং দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমকে ও চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে। এছাড়া ভারতবর্ষে কোম্পানী শাসন সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ভারতে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের পথ প্রশস্ত হয়।

বক্সারের যুদ্ধ হল পলাশী যুদ্ধের চূড়ান্ত পরিনতি। পলাশী যুদ্ধের ফলে কোম্পানী অনেক সুযোগ-সুবিধা লাভ করে ও ভারতে অকল্পনীয়ভাবে প্রভাব বিস্তার করে। তবে, এই সুয়োগ-সুবিধা ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ছিল আকস্মিক, অনায়ালব্ধ এবং তার স্থায়ীত্ব সম্পর্কে সন্দেহ ছিল।

সিরাজুল ইসলামের মতে-

পলাশীর যুদ্ধ রাজনৈতিক ও সামাজিক গঠনে তাৎক্ষণিক কোন পরিবর্তন আনতে পারেনি।

বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভের ফলে ইংরেজ শক্তি অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিতে পরিণত হয়। পলাশী যুদ্ধে সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয় ঘটেনি বরং এতে বাংলার ভাগ্য নির্ধারিত হয়। কিন্তু, বক্সারের যুদ্ধে মুঘল সম্রাট, অযোধ্যার নবাব এবং বাংলার নবাবের একযোগে পতন ঘটে। ফলে, পলাশী যুদ্ধ বাংলার ভাগ্য নির্ধারণ করলেও বক্সারের যুদ্ধের ফলে গোটা ভারতে তাদের রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পলাশীর যুদ্ধে সামরিক শক্তি দিয়ে নয় বরং বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে তারা জয়ী হয়েছিল আর বক্সারের যুদ্ধ ছিল সামরিক বিজয়।[৬৪]

পলাশী যুদ্ধের মাধ্যমে ইংরেজ শক্তির আধিপত্যের সূচনা হলেও যদি বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজদের জয় না হত তাহলে ভারতবর্ষে ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তাই ঐতিহাসিকগণ বক্সারের যুদ্ধকে চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ধারণকারী যুদ্ধ হিসেবে অভিহিত করেছেন।[৬৫]

---

[৬৪] Ram Gopal, *How the Brithish Occupied Bengal* (Bombay : Asia Publishing House, 1963), p. 215.

[৬৫] Vincent Smith, *The Oxford History of India* (Oxford : Clarendon Press, 1919), p. 471.

এভাবে বলা যায় বক্সারের যুদ্ধের মাধমে ইংরেজদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সামরিক মান মর্যাদা ও প্রভাব প্রতিপত্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। এ যুদ্ধের মাধ্যমে তাদের আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। এ যুদ্ধের পর বৃটিশ শক্তিকে আর নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য যুদ্ধ করতে হয়নি। পরবর্তী যুদ্ধগুলো ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যে বিস্তারের যুদ্ধ।

সর্বোপরি বলা যায় বক্সারের যুদ্ধের পর ইংরেজদের ক্ষমতা হয়ে ওঠে অপ্রতিরোধ্য এবং তারা রাজকীয় স্বীকৃতি লাভের কাছাকাছি এসে পৌছে।[৬৬]

ড: অনীল সাক্সেনা এর মতে- The battle of Buxar was for greater significance than the battle of plassey. The later battle had been won through trachery rather than a keen contest against a youthful and weak nawab but the battle of Buxer was won by the English after a hard fight against a confederacy of three Indain powers by virtue of their superior military powers.[৬৭]

এ যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলায় ইংরেজদের প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠার সমস্ত বাঁধা দূর হয় যা ১৭৬৫ সালে দেওয়ানী লাভের মধ্যে দিয়ে আমরা দেখতে পাই।

বক্সারের যুদ্ধের পর বাংলা তথা সমগ্র উত্তর ভারতের রাজনীতিতে কোম্পানী একটি অদ্বিতীয় শক্তি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে। ১৭৬৫ সালের পর বাংলার আপেক্ষিক অবস্থা ছিল স্বাধীনতা প্রয়াসী নবাব মীর কাসিম চূড়ান্তভাবে পর্যুদস্ত, মীর জাফরের পুত্র নাজমুদ্দৌলা কোম্পানীর কৃপায় গদীতে সমাসীন, অযোধ্যার নবাব কোম্পানীর কৃপা প্রার্থী, সাম্রাজ্যহীন সম্রাট শাহ আলম সহায় সম্পদহীন অবস্থায় সুজাউদ্দৌলার হাতে প্রায় বন্দি অর্থ্যাৎ আঞ্চলিক ও রাজনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে কোম্পানীই এখন এ অঞ্চলের ভাগ্য বিধাতা আর দেশীয় রাজশক্তিগুলো অবসময়ের আবর্তে নিমজ্জিত। এ পরিস্থিতিতে রবার্ট ক্লাইভ বাংলা বিহার উড়িষ্যার দিওয়ানী প্রার্থনা করে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা এবং দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করে যা এলাহাবাদ চুক্তি নামে পরিচিত।

---

[৬৬] বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৪,খণ্ড ৮, পৃ. ২৩৭।

[৬৭] Anil Saxena, *Encyclopaedia of Indian History*, Vol. 25 (New Delhi : Anmol Publication,, 2006), p.11.

Michale Edward বলেন,

The English East India Company was totalage a Commercial institution and its main object was to promote commerce and make profit.”

ইংরেজ জাতি বাণিজ্যিক কারণেই ভারত মহাসাগরে পর্দাপণ করে এবং বাণিজ্যিক স্বার্থ সংরক্ষনের প্রয়োজনেই এক সময় ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ করে। পলাশীর যুদ্ধের মাধ্যমে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলার শাসন ক্ষমতায় অনুপ্রবেশ করে, মীর কাশিমকে ক্ষমতায় বসানোর মাধ্যমে। তাদের ক্ষমতায়নের বিস্তৃতি ঘটে ১৭৬৫ সালের দিওয়ানী লাভের মাধ্যমে।

A.R. Mallick বলেন-

‘The battles of pallssey and Buxar put and end to the Independence of Bangal.

The grant of Diwani in 1765 gave legal sanction to what had already taken place.”[৬৮]

মুঘল শাসন ব্যবস্থায় প্রত্যেক সুবা প্রদেশে নিযামত ও দিওয়ানী নামে দুটি আলাদা শাসন বিভাগ চালু ছিল। সুবেদার বা নাজিমের অধীনে ছিল নিযামত বা সাধারণ সম্পাদক, বেসামরিক শাসন, প্রতিরক্ষা এবং বিচার আর দিওয়ানী ছিল দিওয়ানের অধীনে, তিনি রাজস্ব সংগ্রহ এবং আর্থিক কর্মকান্ডের দায়িত্বে ছিলেন। সুবেদার এবং দিওয়ান উভয় ব্যক্তিই সরাসরি দিল্লীর বাদশাহ কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তারা এক অপরকে সাহায্য করতেন কিন্তু একে অপরের উপর হস্তক্ষেপ করতে পারতেন না। উভয়ই স্ব স্ব কর্মকান্ডের জন্য সম্রাট এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দায়ী থাকতেন। ১৭১৭ সাল পর্যন্ত এ অবস্থা বিদ্যমান থাকলেও উক্ত সনে মুর্শিদকুলী খান সম্রাট ও কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার সুযোগে সুবেদারীর সাথে দিওয়ানির দায়িত্ব ও ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং ইংরেজদের সঙ্গে নতুন নতুন চুক্তি করে নবাব তার নিযামত ক্ষমতা কোম্পানীর হাতে তুলে দেন। তখন থেকে কোম্পানী হয়ে ওঠে দেশের একমাত্র হর্তাকর্তা।

---

[৬৮] Azizur Rahman Mallick, *British policy and the Muslims in Bangal*, 1757-1856 Dacca: Bangla Academy, 1977, p. 31

পলাশীর মাধ্যমে রাজনৈতিক পরিবর্তনকে স্বীকার করে অসহায় সম্রাট কয়েকবার কোম্পানীকে বাৎসরিক কিছু উপঢৌকনের বিনিময়ে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দিওয়ানি গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু কোম্পানী নানা কারণে সে সময় তা প্রত্যাখান করে। ১৭৬৪ সালে তারা রাজনৈতিক ও সামরিক বলে বলীয়ান হয়ে ওঠে। বক্সারের যুদ্ধের পর বাংলায় কোম্পানীর কর্মচারীতের মধ্যে দুর্নীতি ও অব্যবস্থা চরম আকার ধারণ করে। কোম্পানীর প্রশাসনে শৃঙ্খলা আনায়ন এবং বাংলা ও অযোধ্যার নবাবদ্বয় এবং মুঘল সম্রাটের সাথে রাজনৈতিক বন্দোবস্ত স্থাপনের জন্য কোম্পানী কর্তৃপক্ষ রবার্ট ক্লাইভকে লর্ড উপাধি দিয়ে দ্বিতীয়বারের মত গর্ভণর করে ভারতে প্রেরণ করে। তিনি এসে অনুধাবন করেন কোম্পানীই এখন এ অঞ্চলের ভাগ্য বিধাতা। সম্রাট শাহ আলম কোম্পানীর আশ্রিত ও অনুগ্রহভাজন নাজমুদ্দৌলা কোম্পানীর কৃপায় গদিতে আসীন আর অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা কোম্পানীর কৃপা প্রার্থী। এমতাবস্থায় কোম্পানী দিওয়ানি গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। লর্ড ক্লাইভ এলাহাবাদে অবস্থানরত সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে প্রচুর উপহার প্রদান করে এবং কোম্পানীকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দিওয়ানি প্রদানের আবেদন করে। সম্রাট ক্লাইভের আবেদন দু'হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করেন এবং ১৭৬৫ সালে ১২ আগষ্ট এক চুক্তিতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দিওয়ানির সনদ কোম্পানীকে প্রদান করেন। ফরমান আকারে প্রকাশিত এলাহাবাদের সন্ধি নামে পরিচিত এই চুক্তিতে স্থির হয় যে-

১. কোম্পানী বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করবে এবং বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার জনগণ থেকে কোম্পানী কর আদায় করবে।

২. কোম্পানী সম্রাটকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা প্রদান করবে। বাংলার নবাবকে নিযামতের ব্যয় হিসেবে বছরে ৫৩ লক্ষ টাকা দিবে।

৩. কারা ও এলাহাবাদ জেলা দুটি সম্রাট শাহ আলমের অধীনে থাকবে যা অযোধ্যার নবাব ছেড়ে দিতে বাধ্য থাকবে।

৪. সম্রাট শাহ আলম বেনারস প্রদেশের শাসক হিসেবে বলবন্তসিংহকে পুন: অধিষ্ঠিত করবে যতক্ষণ পর্যন্ত বলবন্তসিংহ কোম্পানীকে রাজস্ব দিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বলবন্তসিংহ শাসক হিসেবে থাকবে।

৫. নবাব সুজাউদ্দৌলাকে তার রাজ্য অযোধ্যা ফিরিয়ে দেয়া হবে কিন্তু এলাহাবাদ ও কারা জেলা দুটি তার থেকে নিয়ে নেয়া হবে।

৬. অযোধ্যার নবাব যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ কোম্পানীকে ৫০ লক্ষ টাকা প্রদান করবে। কোম্পানীর সাথে নবাবের মিত্রতার সম্পর্ক স্থাপিত হবে। এভাবে দিওয়ানি লাভের মাধ্যমে কোম্পানী বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হন এবং তাদের ক্ষমতালাভ আইন দ্বারা স্বীকৃত হয়।

ফিলিপ জে.স্টার্ন এর মতে-

The nawabs invasion was regarded by Edmund barke as marking a memorable era in the history of the world, His defeat at the battle of plassey in 1757 came quickly to be considered a revolution and the dewani grant that followed from it in 1765 the moment when as thomas pawnull put in 1773. The Marcent had become sovereign.[৬৯]

দিওয়ানি লাভ কোম্পানীর জন্য ছিল এক বিরাট রাজনৈতিক বিজয়। দিওয়ানি কোম্পানীকে দেয় অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধা ও রাজনৈতিক আধিপত্য। এর ফলে কোম্পানী নিজের দেউলিয়া অবস্থা থেকে রক্ষা পায়।[৭০]

দিওয়ানি লাভের পূর্বে ইংল্যান্ড থেকে যে বিপুল পরিমান পুঁজি (স্বর্ণ রৌপের আকারে) ভারতে আনতে হত দিওয়ানি লাভের পর আর তা আনতে হয় নি। এছাড়াও তাদের ব্যবসার সমস্ত পুঁজি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার উদ্বৃত রাজস্ব থেকেই সংগৃহীত হত। দিওয়ানি লাভের গুরুত্ব জানিয়ে রবার্ট ক্লাইভ কোর্ট অব ডাইরেক্টরসকে জানান, এর ফলে কোম্পানী ও নবাবের ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের চির অবসান ঘটল। নবাব এখন কোম্পানীর পেনশনভোগী মাত্র; বাদশাও তাই। সমস্ত ক্ষমতা কোম্পানীর হাতে। দিওয়ানি লাভের পর কোম্পানীর যে আয় হবে তা দিয়ে কোম্পানীর সমস্ত খরচ মিটিয়ে ব্যবসার সমস্ত পুঁজি সংগ্রহ করা সম্ভব।[৭১]

---

[৬৯] Philip J. Stern, *The company state* (New York : Oxford University Press, 2011), p. 207.

[৭০] এম.এ. রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ২০১১) পৃ. ৩৪৫।

[71] W K Firminger, *Affairs of the East India Company: Being the Fifth Report from the Select Committe of the House of Commons,* London: BR Publishing Corporation (9 June 2005) p. 162-163.

দিওয়ানি লাভের ফলে এ অঞ্চলের রাজস্বে একদিকে যেমন কোম্পানী শক্তিশালী সেনাবাহিনী গড়ে তোলে তেমনি ভারতে রাজ্যেবিস্তারের পথ সুগম হয়। এই দিওয়ানিই কালক্রমে ইংরেজদেরকে সারা ভারতে তথা দক্ষিণ এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তারের সুযোগ এনে দেয়।

এভাবে কোম্পানী বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভের মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রাথমিক পর্বের সমাপ্তি ঘটান। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সমন্বয়ে গঠিত সুবা বাংলায় সর্বপ্রথম ইংরেজদের ক্ষমতার আওতাভুক্ত হয়।[৭২] ঐতিহাসিক তৃপ্ত দেশাই এর মতে-

> The most important stepundertaken in Bengal of diwani contained some laneful effect too, the company collected the revenue, while the administer the province and maintain law and order.[৭৩]

সর্বোপরি বলা যায়, ধর্ম প্রচার ও বাণিজ্য এই দুটি উদ্দেশ্যে নিয়ে আগত ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূল বরাবর কয়েকটি ঘাঁটি স্থাপন করে প্রথমে ব্যবসা বাণিজ্য এবং এদেশ থেকে কাঁচামাল সংগ্রহের কাজ শুরু করে। পরে মুঘল সাম্রাজের দুর্বলতার সুযোগে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে সচেষ্ট হয়। ফরাসি,ওলান্দাজ, দিনেমার প্রভৃতি বাণিজ্য সংস্থা কে একে একে বিতাড়িত করে বৃটিশরা শক্তিমান হয়ে ওঠে। আর এভাবেই উইলিয়াম বেজেজ ও জব চার্নক ভারতে ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন দেখেন তা অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে পূর্ণতা লাভ করে। কোম্পানী দেওয়ানি লাভের মাধ্যমে নিরঙ্কুশ রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে এবং কোম্পানী তাদের কর্মকান্ডের আইনগত বৈধতা লাভ করে।

রাম গোপালের মতে-

> The companies were the masters of the revenues and he was head of the Government. It was a silent revolation.[৭৪]

দেওয়ানি লাভের ফলে নবাব কোম্পানীর পুতুল এবং পেনশনের পাত্রে পরিণত হয়। দেওয়ানি লাভের পর কোম্পানীকে এদেশীয় শাসক শ্রেণীর সাথে আর কোন চুক্তি স্বাক্ষর করতে হয়নি। দেওয়ানি

---

[৭২] মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, *বাংলার ইতিহাস : ভারতে ইংরেজ রাজত্বের সুচনাপর্ব* (১৬৯৮-১৭১৪) (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯) পৃ. ৫৯।

[৭৩] Tripta Desai, *The East Indian Company.* A Brief Survey form 1599-1857 (New Delhi : Kanak Publications, 1984), p. 187.

[৭৪] Ram Gopal, *How the British Occupied Bengal, Bombay,* Asia Publishing House, 1963, p. 347.

লাভের ফলেই কোম্পানী এদেশের রাজস্ব প্রশাসন এবং রাজস্ব প্রশাসনের আড়ালে রাজনৈতিক উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। ঐতিহাসিক এস. এ. রহিম বলেন-

> The great Diwani gave the authority to revenue collection and administration of Bangal to the company which had already assumed the military control of the province.[৭৫]

দেওয়ানি লাভের ফলে কোম্পানী অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা, বাণিজ্যেক সুযোগ-সুবিধা ও রাজনৈতিক আধিপত্যের অধিকারী হয়। কোম্পানী তার দেউলিয়া অবস্থা থেকে রক্ষা পাায়। দেওয়ানি লাভের পূর্বে ইংল্যান্ড থেকে যে বিপুল পরিমান পুঁজি ভারতে আনতে হত, তা দেওয়ানি লাভের পর বন্ধ হয়ে যায় এবং ব্যবসায় সমস্ত পুঁজি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার উদ্বৃত্ত রাজস্ব থেকেই সংগৃহীত হত। দেওয়ানি লাভের ফলে কোম্পানীর আর্থিক স্বচ্ছলতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্বে একদিকে যেমন কোম্পানী শক্তিশালী সেনাবাহিনী গড়ে তোলে, অন্যদিকে ভারতে রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

কোম্পানী দিওয়ানি লাভ করে বাংলায় দ্বৈত শাসন প্রবর্তন করে। এতে কোম্পানীর কর্মচারী ও গোমস্তাদের লুণ্ঠন নীতি, বর্ধিত রাজস্ব চাপ এবং অনাবৃষ্টির ফলে শস্যহানি ঘটায় বাংলায় অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ে। প্রতিক্রিয়াস্বরূপ, বাংলা ১১৭৬ সনে (ইংরেজি ১৭৭০ খ্রি:) বাংলায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে বাংলার এক-তৃতীয়াশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আইন শৃঙ্খলায়, কৃষি ও শিল্প উৎপাদনে মারাত্মক অবনতি ঘটে। দেওয়ানি লাভের মধ্যে দিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রাথমিক পর্বের সমাপ্তি ঘটে।

১৬০০ সালে ইংল্যান্ডের রাণী এলিজাবেথ (১৫৫৮-১৬০৩) কর্তৃক প্রদত্ত সনদের মাধ্যমে ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্যিক কার্যাবলি পরিচালনার জন্য কর্মচারি নিয়োগ ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা লাভ করে। কিন্তু পরবর্তীতে ব্যবসা বাণিজ্য প্রসার লাভ করলে ১৬৬১ ও ১৬৭৬ সালের সনদ অনুযায়ী কোম্পানীকে বিভিন্ন দেশ বিজয়, দুর্গ নির্মাণ এবং স্বীয় নামে মুদ্রা প্রচলন ও সৈন্যবাহিনী গঠনের ক্ষমতা দেয়া হয়।[৭৬]

---

[৭৫] এম.এ. রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ২০১১) পৃ.১৭.

[৭৬] Ramkrishna Mukherjee, *The Rise and Fall of the East India Company* (Bombay : Popular Prokashon, 1958), p.75.

ইংল্যান্ডের House of propritor বা মালিকদের সভা এবং court of directors বা পরিচালকদের সভা নামে দুটি সমিতি কোম্পানীর কার্যক্রম পরিচালনা করত। ডিরেক্টর সভায় মোট ২৪ জন সদস্য ছিলেন যারা শেয়ার হোল্ডারদের ভোটে বাৎসরিক নির্বাচিত হতেন এবং তারাই প্রকৃতপক্ষে কোম্পানীর যাবতীয় কার্যাবলি পরিচালনা করতেন।[৭৭]

১৭৫৭ সালে তথাকথিত পলাশীর এবং ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধ জয়ের মধ্যে দিয়ে রবার্ট ক্লাইভের অধিনায়কত্বে ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলার তথা ভারতবর্ষের রাজনীতির মঞ্চে প্রথম আর্বিভূত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। পরবর্তীকালে কোম্পানী ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে জয়ের মধ্যে দিয়ে রবার্ট ক্লাইভের অধিনায়কত্বে ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলার তথা ভারত বর্ষের রাজনীতির মঞ্চে প্রথম আর্বিভূত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। পরবর্তীকালে কোম্পানী ১৭৬৫ সালে মোঘল সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দিওয়ানি তথা রাজধানী দিল্লী থেকে বহুদূরে অবস্থিত তিনটি মোঘল সুবার যাবতীয় রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা পাওয়ার মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে ভূমি দখল করার যে প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল তার পরিসমাপ্তি ঘটে। যদিও তখনও পর্যন্ত সাধারণ প্রশাসনযন্ত্র ও বিচারব্যবস্থা পরিচালনার ভার ও ক্ষমতা ছিল নবাবের হাতে। কোম্পানী দায়িত্বহীন ক্ষমতা এবং নবাবের ক্ষমতাহীন দায়িত্ব গ্রহণের এইরূপ শাসন ব্যবস্থা দ্বৈত শাসন (Duel Government) নামে পরিচিত। এই দ্বৈত শাসনের ফলে কয়েখ বছরের মধ্যে বাংলার কৃষি, শিল্প এবং ব্যবসা বাণিজ্য ধ্বংস হয়ে যায় এবং ভয়াবহ দূর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ‘ছিয়াত্তরের মন্বন্তর’ নামে পরিচিত এই দুর্ভিক্ষে বাংলার প্রায় ১ কোটি মানুষ মারা যায়। শাসনব্যবস্থায় এলুপ চরম বিশঙ্খল অবস্থার মধ্যে বৃটিশ সরকার ওয়ারেন হেস্টিংসকে (১১৭২-৮৫) ভারতের গভর্ণর জেনারেল করে প্রেরণ করেন। তিনি এসেই দ্বৈত শাসনব্যভস্থার অবসান ঘটান এবং শাসনব্যবস্থার সংস্কার করেন।[৭৮]

কোম্পানীর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে হেস্টিংস ক্লাইভের মুখোশ নীতির পক্ষপাতি ছিলেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন যে তরবারির বলে কোম্পানী বাংলায় রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে এবং তরবারির বলেই তা নিয়ন্ত্রনে রাখতে হবে। এ সত্যের মাঝামাঝি আর কোন সত্য নেই।[৭৯]

---

[৭৭] মুহাম্মদ ইনাম উল-হক, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৯) পৃ. ১৫৯।

[৭৮] Anil Saxena, *Encyclopaedia of Indian History,* Vol. 25 (New Delhi : Anmol Publication,, 2006), p. 217.

[৭৯] H. H. Dodwell, ed., *The Cambridge History of India, Vol-v, British India, 1497-1858),* Delhi: s. Chand & Co.,nd), p. 597.

হেস্টিংস তার সংস্কার নীতি বাস্তবায়নে একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, দেশের সার্বভৌমত্ব এখন সর্বতোভাবে কোম্পানীর হাতে, মুঘল সম্রাটের হাতে নয়। এলাহাবাদ চুক্তি অনুযায়ী দরিদ্রপীড়িত সম্রাট শাহ আলমের প্রাপ্ত বাৎসরিক বরাদ্দ হেস্টিংস বন্ধ করে দেন। বাদশাহর নিকট থেকে কোন উপাধি বা খেতাব গ্রহণ করতেও তিনি অস্বীকার করেন। সম্রাট শাহ আলম চুক্তিমাফিক বাৎসরিক করদানের জন্য চাপ দিতে থাকলে হেস্টিংস সম্রাটকে জানিয়ে দেন যে, বাংলার আয় থেকে এক পয়সাও বাংলার বাইরে প্রেরন করতে তিনি অপারগ।

সন্ধি মোতাবেক সম্রাট কর দানে অস্বীকৃতি জানানো রীতিমতো স্বাধীনতা ঘোষণার সামিল। এরপর কোম্পানীর উপর সম্রাটের লেশমাত্র কোন কর্তৃত্ব বিরাজমান বলা যায় না। দিল্লীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা ছাড়াও ওয়ারেন হেস্টিংস আরও অনেক সংস্কার আনায়ন করেন, যা সার্বভৌমত্বকেই প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ করে। তিনি নায়েবে দিউয়ানের পদ বিলুপ্ত করে শাসনকার্য সর্বত্র ইউরোপীয় অফিসার নিয়োগ করেন। রাজস্ব শাসনের সমস্ত কার্যালয় মুর্শিদাবাদ থেকে সরিয়ে কলকাতায় স্থাপন করেন। দিওয়ানি ও নিযামত আদালত কলকাতায় স্থানান্তরিত করেন। এসব আদালতের বিচারকগণ ও হেস্টিংস কর্তৃক নিযুক্ত হন। হেস্টিংসের কথায় “নবাব এখন সম্পূর্ণভাবে কোম্পানীর আজ্ঞাবহ”।[৮০]

হেস্টিংস বলেন- ব্রিটিশের ক্ষমতাকে রহস্যাবৃত রাখার জন্য যত কলাকৌশলই প্রয়োগ করা হইক না কেন, বিনয় ও ভদ্রতার ভান যতই করা হউক না কেন, এটা সবার জানা যে, সত্যিকার ক্ষমতা এখন কোম্পানীর হাতে আর যে ক্ষমতা নবাবকে ফিরিয়ে দেয়া অবাস্তব প্রস্তাব। এটা দিবালোকের মত সত্য যে, কোম্পানীই সব ক্ষমতার উৎস, নবাব ক্ষমতার দিক দিয়ে তার ছায়া মাত্র, এমনকি নবাবের নগণ্য চাকরবাকর পর্যন্ত সুপারিশ ও অনুমোদন ছাড়া নিযুক্ত হয়না।[৮১]

---

[৮০] H. H. Dodwell, ed., *The Cambridge History of India, Vol-v, British India, 1497-1858),* Delhi: s. Chand & Co.,nd), p.597.

[৮১] বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৪, ১২তম খন্ড, পৃ. ২২৩।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক বিনিয়োগ ও প্রকৃতি

পূর্বোক্ত অধ্যায়টিতে বাংলায় ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রাথমিক কর্মকাণ্ড আলোচনা করার পর এ অধ্যায়টিতে বাংলায় ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক বিনিয়োগ, বিনিয়োগের প্রকৃতি এবং বিনিয়োগ সংক্রান্ত সার্বিক বিষয়াদি পর্যালোচনা করা হয়েছে। বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিভিন্ন পদ্ধতি, (কুঠি বা ফেক্টরী পদ্ধতি, দাদনী ব্যবস্থা, এজেন্সি ব্যবস্থা, ঠিকাদারী ব্যবস্থা ও চুক্তি ব্যবস্থা) বেসরকারী বা ব্যক্তিগত ব্যবসা ও এর ঝুঁকিসমূহ, আর্থিক নিষ্ক্রমন সংক্রান্ত বিষয়াদি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সব শেষে এই অধ্যায়টিতে বাংলায় ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বিনিয়োগ ও প্রকৃতির সমালোচনা করা হয়েছে।

৬.১ বিনিয়োগ কি

বিনিয়োগ শব্দটি ব্যাপক ও বিস্তৃত কার্যাবলি নির্দেশ করে থাকে। বিনিয়োগ বলতে সাধারণত যেকোন প্রকল্পে অর্থ খাটানোকে বোঝায়। বিনিয়োগ বলতে কখনো কখনো ঋণপত্র, সাধারণ শেয়ার, অগ্রাধিকার শেয়ার, মিউচুয়্যাল ফান্ড (যুগ্ম তহবিল), ইত্যাদিতে অর্থ খাটানোকে বুঝানো হয়। আবার কখনো কখনো দৃশ্যমান স্থায়ী সম্পদ যেমনঃ রিয়েল এস্টেট, বিল্ডিং ইত্যাদিতে অর্থ খাটানোকে বিনিয়োগ বলা হয়।

S.Kevin এর মতে 'Investment is an activity that is engaged in by people who have savings"[১]

অধ্যাপক C.P. Jones এর মতে—Investment can be defined as the commitment future investments to one or more assets that will be held over some future time period."[2]

অর্থাৎ বিনিয়োগ হলো এক বা একাধিক সম্পদের একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত বিনিয়োজিত প্রতিশ্রুত তহবিল। ভবিষ্যতে সম্ভাব্য মুনাফা লাভের আশায় তহবিল বিনিয়োগ করা হয়। বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনায় তহবিল বিনিয়োগ বলতে মূলত আর্থিক সম্পদে বিনিয়োগকে বোঝায়।

---

[১] S. Kevin, *Fundamentals of International Financial Management*, PHI Learning Private Limited, New Delhi, 110001, 2009. p. 22.

[২] Charles, P. Jones, Invesments Principles and Conscepts, Wiley India Pvt. Ltd. 11th edition, 18 December, 2009, p. 32

সাধারণ অর্থে বিনিয়োগ কথাটির অর্থ ব্যবসা বা আর্থিক লেনদেন লাভের আশায় টাকা খাটানো। ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাংলায় বা ভারতবর্ষের পণ্য ক্রয় 'ইনভেস্টমেন্ট' নামে অভিহিত। এই অর্থে কোম্পানীর সরকারি ব্যবসা বিনিয়োগ নয়; এর আসল অর্থ হল 'রপ্তানি পণ্যক্রয়'। ক্যাপ্টেইন গ্রান্ট কোম্পানীর পণ্যক্রয়ের এমন নামকরণের একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে, কোম্পানী রপ্তানি পণ্য উৎপাদনের আগেই চুক্তির মাধ্যমে তাতে অধিকার প্রতিষ্ঠা করত। এজন্য ভারতবর্ষে তাদের পণ্যক্রয় 'ইনভেস্টমেন্ট' নামে পরিচিত।

'The company were invested with a prior right to the goods for which they contracted and lence their parchage in India acquired the name of investment[৩].

ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী পূর্বাঞ্চলে একচেটিয়া বাণিজ্য করার জন্য ১৬০০ সালে সনদ পায়। এই সময়ে আরও অন্যান্য কোম্পানী যেমনঃ ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী, ওলন্দাজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ও ড্যানিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয়। ইংরেজরা কলকাতায়, ফরাসিরা চন্দননগরে, ওলন্দাজরা শ্রীরামপুরে এবং ড্যানিশরা চুঁচড়ায় কুঠি স্থাপন করে। মূলধন ও বাণিজ্যের পরিমাণের ক্ষেত্রে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান। এ কোম্পানী বাংলা থেকে প্রধানত সুতিবস্ত্র, রেশমবস্ত্র ও কাঁচা রেশম ও সোরা ইংল্যান্ডে নিয়ে যেতো। ক্রয়কৃত এসব দ্রব্য বিনিয়োগ নামে পরিচিত। বাংলার দূরবর্তী বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপাদিত এবং বিক্রয় কেন্দ্র থেকে আনা বিভিন্ন বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য বাংলা ভাষা না জানা ও কলকাতায় বসবাসরত কোম্পানীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সংগ্রহ করা সম্ভব ছিলনা। তাই পণ্য ক্রয়ের জন্য কোম্পানীকে অনেক নীতি অনেক সময় গ্রহণ করতে হয়েছে। এই নীতিগুলোকে বিনিয়োগ নীতি বলে।

৬.২ বিনিয়োগ পদ্ধতির বিবরণ

ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বিভিন্ন পদক্ষেপের মধ্যে বিনিয়োগ ব্যবস্থা ছিল একটি। বাণিজ্যের মাধ্যমেই এ উপমহাদেশে কোম্পানীর কার্যক্রম শুরু হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে বাংলার আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য ছিল ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্নদেশ থেকে আগত বিদেশী বণিকদের হাতে। তবে, এ শতাব্দীর শেষ দিকে ইংরেজ কোম্পানী ব্যবসা বাণিজ্যে একচ্ছত্র অধিকার লাভ

---

[৩] গ্রান্ড জেমস, *হিস্টোরিক্যাল এন্ড কম্পারেটিভ এ্যানালিসিস অব দ্যা ফিনানেসস অব বেঙ্গল*, ১৭৮৬, ফিফথ রিপোর্ট, ২য় খণ্ড, অক্সফোর্ড ক্লারেডন প্রেস, ১৯১৭, পৃ. ১১৪-১৫, কে. কে. দত্ত, *স্টাডিজ ইন দ্যা হিস্ট্রি অব বেঙ্গল*, ১৭৪০-১৭৭০, ১ম খন্ড, ম্যাকমিলান ইন্ডিয়া প্রেস, মাদ্রাজ, পৃ. ১১৪-১১৫।

করে। ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে, এশিয়া বিশেষ করে ভারতে উৎপন্ন দ্রব্যের ব্যাপক বাজার তৈরী করে। এ সময় কোম্পানীর বাণিজ্য ছিল প্রধানতঃ দুই ধরণের। একটি হল আন্তর্জাতিক অপরটি হল আন্তঃএশীয়। এছাড়া প্রাদেশিক ও উপকূলীয় বাণিজ্যেও কোম্পানী অগ্রগতি লাভ করে। প্রাদেশিক বাণিজ্য উত্তর ভারতের সাথে আর উপকূলীয় বাণিজ্য চট্টগ্রাম ও হুগলীর সঙ্গে চালু ছিল। এডেন ও গোয়াতেও কোম্পানীর বাণিজ্যিক তৎপরতা ছিল। কোম্পানী প্রধানত সুতি বস্ত্র, রেশম সুতা, কাঁচা রেশম, লবণ ও বিভিন্ন মশলা ইউরোপে বিশেষ করে ইংল্যান্ডে নিয়ে যেত। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপাদিত এবং আড়ং-এ আসা পণ্যদ্রব্য প্রদেশের বিদ্যমান ভাষা না জানার কারণে কোম্পানীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পক্ষে সংগ্রহ করা অসম্ভব ছিল। তাই, এসব পণ্য সংগ্রহ করতে কোম্পানীকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করতে হয়। এসব নীতিগুলোই সামগ্রিকভাবে বাণিজ্যনীতি নামে পরিচিত। তাদের বিনিয়োগ ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল স্থানীয়ভাবে পুঁজি সংগ্রহ করা।[৪] K.N Chaudhury বলেন-

> The business history of the East India Company in the early seventeenth century shows certain peculiarities which are not on the whole shared by English trade to European countries. The company's export and import trades its organizations and institutional characteristics, its methods of finance all these features display certain innovations signs that business techniques and organization were being modified to suit new trading conditions[৫].

প্রথমদিকে মূলধন হিসেবে স্বর্ণরৌপ্য নিয়ে আসলেও পলাশী উত্তরকালে তাদের বৃটেন থেকে স্বর্ণরৌপ্য আমদানি করতে হয়নি; বরং এদেশ থেকেই অর্জিত মূলধনের উপর ভিত্তি করে ব্যবসা পরিচালনা করেছে। এছাড়া বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তারা বরাবরই আমদানির চেয়ে রপ্তানি করেছে বেশী। কোম্পানী বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শুল্কে বৈদেশিক বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করলেও তারা এর অপব্যবহার করে অভ্যন্তরীণ ও ব্যক্তিগত বাণিজ্য আরম্ভ করে। যার ফলে দেশীয় বণিকরা উৎখাত হবার উপক্রম হয়।

কোম্পানী ভারতবর্ষে বাণিজ্য পরিচালানর ক্ষেত্রে যেসব নীতি গ্রহণ করেছিল তা হল-

১। কুঠি বা ফেক্টরী (Factory) পদ্ধতি

২। দাদনী পদ্ধতি

---

[৪] সিরাজুল ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস : ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো* (ঢাকা চয়নিকা-২০০৮) পৃ. ৩০।
[৫] K.N Chaudhury, *The English East India Company* (London : Tylor and Francis Group, 1915) p.19.

৩। এজেন্সি পদ্ধতি

৪। ঠিকাদারী (Contract System) পদ্ধতি

৫। ব্যক্তিগত বাণিজ্য।

৬। নগদ টাকায় পণ্য ক্রয়।

আমরা নিম্নে এসব বিনিয়োগ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব।

কুঠি বা ফেক্টরী (Factory) পদ্ধতিঃ

ভারত-বাংলা অঞ্চলে বাণিজ্য পরিচালনার জন্য ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ওলন্দাজদের অনুকরণে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নির্মিত অসংখ্য বাণিজ্য কুঠির রক্ষণাবেক্ষণ করত ফ্যাক্টরী প্রধান বা কুঠিয়াল। সুরক্ষিত এসব কুঠিগুলোতে সারাবছর স্বল্পদামে পণ্য ক্রয় করে মওজুদ রাখা হত। কুঠিয়াল পণ্যের মান যাচাই, সরবরাহকারীদের সাথে চুক্তি, সরবরাহ নিশ্চিতকরণ প্রভৃতি দায়িত্ব পালন করত। এসব কুঠিসমূহ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত চালু ছিল। পরবর্তিতে ফ্যাক্টরীর সুবিধা ব্যবহার করে কোম্পানীর কর্মচারীরা ব্যক্তিগত ব্যবসায় মনযোগী হওয়ায় কুঠিগুলো অনেক ক্ষেত্রে প্রাইভেট এজেন্সীতে পরিণত হয়। এ পদ্ধতিতে ব্যবসা সম্প্রসারিত হলেও কোম্পানীর জন্য তা লাভ জনক ছিল না। ফলে, কোম্পানী এ নীতির পরিবর্তন করে। ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীগুলি এশিয়ায় তাদের প্রথম ফেক্টরী বা বাণিজ্য কুঠিগুলি স্থাপন করে সপ্তদশ শতকে। ১৬০৮ থেকে ১৬১৫ এই অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যাঙের ছাতার মতো অসংখ্য কুঠি গজিয়ে উঠে। কিন্তু এসব কুঠিগুলোর গঠন ও কর্মধারা ছিল পরবর্তীকালের কুঠিরের চেয়ে অনেক ভিন্ন।[৬] পরবর্তীযুগের কুঠিগুলি স্বায়ত্বশাসিত, সুরক্ষিত, সমর প্রস্তুত বসতি হিসেবে বিকাশ লাভ করে। কিন্তু প্রাথমিক যুগে কুঠিগুলি প্রতিষ্ঠিত হয় ভিন্ন ছাঁচে। দেশের আইনের অধীনে সাধারণ বসতি হিসেবেই এগুলির প্রথম আবির্ভাব। এগুলির গঠন-কাঠামোয় পরিবর্তন দেখা দেয় ধীরে ধীরে এবং ঐ পরিবর্তনগুলি এসেছে বাণিজ্যিক পরিবর্তন ধারার সাথে সাথে। এ পরিবর্তন ধারার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করাই হবে আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

---

[৬] A.K. Raychaudhuri, *Jan Company in Coromandel 1605 1690*, A Study in the Interrelations of European Commerce and Traditional Economies, Springer Netherlands, 1962, p. 20.

বাণিজ্যের সুবিধার জন্যে ফেক্টরী বা কুঠি স্থাপন করা বাণিজ্যের অগ্রগতির জন্যই সহায়ক। প্রথম প্রথম কুঠি স্থাপন না করেই বাণিজ্য পরিচালিত হতো। কোম্পানীর জাহাজ এশিয়ার বিভিন্ন বন্দরে ভীড়তো মৌসুম ধরে। স্বল্পকালের মধ্যে কেনাবেচা শেষ করে জাহাজ বন্দর ছেড়ে চলে যেতো। ফিরতি যাত্রা পর্যন্ত বন্দরের সঙ্গে ছিন্ন হয়ে যেতো সব সম্পর্ক। তবে ধীরে ধীরে ওসব বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত যোগাযোগ নিয়মিত সম্পর্কে উত্তরণ ঘটে। তখন বাণিজ্যিক সুবিধার্থে বন্দরে একজন স্থায়ী প্রতিনিধি মোতায়েন করার প্রয়োজন অনুভূত হয়। সারা বছর ধরে বিগত যাত্রার মাল বিক্রয় ও আগামী যাত্রার মাল ক্রয় উক্ত প্রতিনিধির কাজ। এর ফলে সমুদ্র যাত্রার সময় অনেক বেঁচে যেতো। তাড়াহুড়ো করে ক্রয় বিক্রয়ের অসুবিধাসমূহ এতে দূরীভূত হয়। ফলে প্রতিনিধি আমদানীকৃত পণ্যের বেশী মূল্য ও রপ্তানী পণ্যের কম দাম নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট সময় পায়। বাণিজ্যের এই ক্রান্তিলগ্নে প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগের বাণিজ্যিক কুঠি ব্যবস্থা ধারা শুরু হয়।

কুঠি ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. ফেক্টরী বা কুঠির কর্তা (কুঠিয়াল) সারা বছর জিনিস ক্রয়-বিক্রয় করে। জাহাজের কর্মচারীরা এখন দায়ী শুধু পণ্যের পরিবহনের জন্য।

২. বিশেষ কোন ধরনের গ্রহণযোগ্যতা কুঠিয়াল ঠিক করে। রপ্তানী পণ্য উৎপাদনের জন্য সে ডিজাইন, মান, পরিমাণ সরবরাহ তারিখ, মূল্য প্রভৃতি নির্ধারণ করে।

৩. ফেক্টরীর চাহিদা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট আগাম দেয়া হয় এবং অনুমোদিত মান ও কারুকার্য বহির্ভূতপণ্য বর্জন করার শর্ত আরোপ করা হয়।

৪. উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ফেক্টরী হস্তক্ষেপ করে এবং রপ্তানীযোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে দাদনী ব্যবস্থার আশ্রয় নেয়।

৫. নির্দিষ্ট মানের নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য নির্ধারিত তারিখে সরবরাহ করার (Putting out system) মাধ্যমে ফেক্টরী উৎপাদন সংগঠনের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। ফেক্টরী আঙ্গিনার ভেতরে জিনিস প্রক্রিয়াজাত করার মাধ্যমে সে নিয়ন্ত্রণকে আরো পাকাপোক্ত করা হয়।

বাণিজ্যের পরিমাণ স্বল্প হলে এবং ক্রেতার বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করার ইচ্ছে না থাকলে ফেক্টরীর প্রথম ধাপের সংগঠন ধারাই যথেষ্ট। সরবরাহ নিশ্চিত করা ও ইউরোপীয় চাহিদা মোতাবেক পণ্য উৎপাদনের জন্য দ্বিতীয় ধারাটি বিশেষ অনুকূল। কিন্তু উভয় ধারার কোনটাই ক্রেতার বাজারকে

নিয়ন্ত্রণ করার জন্য উপযোগী নয়। যেহেতু ফেক্টরী সংস্থাপন ব্যয় অনেক সেহেতু ফেক্টরী ব্যবস্থা অচিরেই তৃতীয় ধারায় উন্নীত হবার প্রবণতা লক্ষণীয়। তৃতীয় ধাপটি ক্রেতার বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আদর্শ, কেননা পুঁজি বিনিয়োগ নিরাপদ রাখার জন্য নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা দরকার। কিন্তু চাহিদার বৃদ্ধি ঘটলে ফেক্টরী অপারেশন পরবর্তী, অর্থাৎ চতুর্থ ধাপে অগ্রসর হতে বাধ্য। চতুর্থ ধাপের বৈশিষ্ট্য আছে নিয়ন্ত্রিত ঋণদানের মাধ্যমে ব্যবস্থা পরিচালনা করা। এ ব্যবস্থা ইউরোপের পণ্যচুক্তি ব্যবস্থা (Putting out system) এর কাছাকাছি। ইউরোপীয় পুঁজিবাদের প্রাথমিক স্তরের বৈশিষ্ট্য ছিল পণ্য চুক্তি ব্যবস্থা, অর্থাৎ নির্দিষ্ট মানের নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য ধার্য তারিখে সরবরাহ করা।

পঞ্চম ধাপের পণ্য চুক্তি ব্যবস্থা এর সংগঠন ধারা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। একটি পদ্ধতি হতে পারে উৎপাদন ও এর খুঁটিনাটি বিষয় নির্দিষ্ট কাছে ছেড়ে। ফেক্টরী ও উৎপাদকের মাঝামাঝি থেকে পাইকাড় সম্পাদন করবে সব চুক্তি। বিকল্প ব্যবস্থা হতে পারে মধ্যব্যক্তি ব্যতিরেকে ফেক্টরীর নিজস্ব প্রতিনিধি কর্মচারীর মাধ্যমে পণ্য চুক্তি ব্যবস্থা পরিচালনা করা। প্রথম পদ্ধতির দুর্বলতা এই যে বিভিন্ন প্রতিযোগীরা অজান্তে বা বাধ্য হয়ে একই এলাকায় ব্যক্তিকে মধ্যদালাল হিসেবে নিয়োগ করতে পারে। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে সে সমস্যা সমাধান করা যায় বটে, তবে এ ব্যবস্থায় অধিক সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগের প্রয়োজন। এতে খরচের ঝুঁকি বেশী। বস্ত্রের মত শিল্পজাত পণ্যের বেলায় ফেক্টরী ব্যবস্থার শেষ দুই ধাপ বিশেষ উপযোগী। তবে কৃষি পণ্যের বেলায় ফেক্টরী ব্যবস্থা তৃতীয় ধাপের মধ্যেই রাখা যায়।

ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলায় পণ্য ক্রয়ের জন্য অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানীর মত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ফ্যাক্টরি বা কুঠি স্থাপন করেছিল। কোম্পানীর প্রধান প্রধান ফ্যাক্টরিগুলি হল পাটনা কাশিম বাজার, রংপুর, রামপুরবোয়ালিয়া (রাজশাহী), লক্ষ্মীপুর (নোয়াখালী), কুমারখালি (নদীয়া) শান্তিপুর বুরম (নদীয়া), সোমামুখী (বাঁকুয়া), রাধানগর, খিরপাই, হরিপাল, গোলাগর, জঙ্গীপুর, সুরদা (রাজশাহী), জগদিয়া, ঢাকা, কলিন্দা, বালেশ্বর, বলরামগাড়ি, মালদা, বরানগর ধনিয়াখালি, বুদাল (ময়মনসিংহ) ও হরিয়ান (রাজশাহী)। এছাড়া দেশের বহুস্থানে অধীনস্থ ফ্যাক্টরি (Subordinate Factories) এবং আড়ং (Aurungs) ছিল। এগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল বোলপুরের কাছে গুরুল, সিউড়ীর কাছে ইলামবাজার ও মুর্শিদাবাদে গানুটিয়া আড়ং ইউরোপীয় বাজারে চাহিদা ও গতিপ্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে কোম্পানী বাংলা থেকে তাদের প্রয়োজনীয় পণ্য সংগ্রহ করত। শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা থেকে তাদের সংগ্রহীত প্রদান পণ্যগুলি হল বিভিন্ন প্রকারের

সুতীবস্ত্র, রেশমবস্ত্র ও কাঁচা রেশম। শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইংল্যান্ডে রেশমবস্ত্র উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যান্ডের জাতীয় অর্থনীতির স্বার্থে কোম্পানী রেশমবস্ত্র রপ্তানি বন্ধ করে বেশি করে কাঁচা রেশম রপ্তানি করতে থাকে। কোম্পানীর সংগৃহীত বিহারের সোরা ও আফিম বাংলার মধ্য দিয়ে ইউরোপ ও এশিয়ার দেশগুলিতে রপ্তানি করা হত। ইংল্যান্ডের বাজারে এসব পণ্যের চাহিদা ও দাম অনুযায়ী বাংলা থেকে রপ্তানিযোগ্য পণ্যের দাম ও পরিমাণ ঠিক করা হত।[৭] কোম্পানীর ডিরেক্টর সভা চাইতেন লণ্ডন বাজারে বাংলায় পণ্যের দাম অনুযায়ী কোম্পানীর পণ্য ক্রয়মূল্য নির্ধারিত হোক।

ডিরেক্টর সভা ভারতবর্ষে কোম্পানীর বাণিজ্য পরিচালনায় সমস্ত ব্যাপারে নির্দেশ ও পরামর্শ পাঠাতেন। শুধু তাই নয় পণ্য কেনাবেচার ছোটখাট ব্যাপারেও ডিরেক্টর সভার পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ আসত। তাদের পরামর্শ ও নির্দেশ মত কাজ না করলে অনেক সময় গভর্ণরসহ গোটা কাউন্সিলকে বরখাস্ত করতেও তারা দ্বিধা করতেন না।[৮] প্রতি বছর জানুয়ারী মাসে ডিরেক্টর সভা ভারতবর্ষে ক্রয়যোগ্য পণ্যের তালিকা প্রস্তুত করতেন। এই তালিকায় বিভিন্ন রপ্তানি পণ্যের নাম, পরিমাণ ও গুণগতমান উল্লেখ করা থাকত। তবে লন্ডনের বাজারে মাঝে মাঝে রপ্তানি পণ্যের দামে উঠানামার জন্য সংশোধিত তালিকাও পাঠানো হত। ফলে এদেশে কোম্পানীর কর্মচারীদের পণ্যক্রয়ে অসুবিধা দেখা দিত। পণ্য ক্রয়ের নির্দেশমূলক তালিকার সঙ্গে বিভিন্ন ক্রয়যোগ্য পণ্যের লন্ডনের বাজার দামের তালিকাও থাকত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ডিরেক্টর সভা সুদূর ইংল্যান্ড থেকে ভারতবর্ষের কোম্পানী পণ্য ক্রয় ব্যবস্থার উপর নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করত। নীতি নির্ধারণ থেকে শুরু করে পণ্য ক্রয়ের খুঁটিনাটি দিকগুলোতেও তাদের দুরবর্তী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (Remote control system) কার্যকরী করার চেষ্টা হত।

বিনিয়োগ নীতি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ :

ক. ডিরেক্টর সভায় পাঠানো পণ্য তালিকা অনুযায়ী ভারতবর্ষে কোম্পানীর কর্মচারীদের পণ্য কিনতে হত।

খ. লন্ডন বাজারের উঠানামা অনুযায়ী ডিরেক্টর সভার শেষ নির্দেশের জন্য এদের অপেক্ষা করতে হত। এবং সেই নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে হবে।

গ. লন্ডন বাজারে দাম অনুযায়ী এদেশের পণ্যদাম নির্ধারণ করার নির্দেশ থাকত।

---

[৭] K.N Chaudhury, *The English East India Company* (London : Tylor and Francis Group, 1915) p. 301.
[৮] K.N Chaudhury, Ibid, p. 302.

ঘ. এদেশে কোনো পণ্য সরবরাহ চুক্তি করার পরেও কোম্পানীর ডিরেক্টর সভার নির্দেশে অনেক সময় চুক্তি বাতিল করতে হত।

দাদনী ব্যবস্থাঃ

কোম্পানীর বাণিজ্য নীতির অন্যতম পদ্ধতি ছিল দাদনী ব্যবস্থা। এটি ১৭৫৩ সাল পর্যন্ত চালু ছিল।[৯] এ ব্যবস্থায় কোম্পানী কলকাতার ব্যবসায়ীদের সাথে চুক্তি করত। এসব কর্মচারীরা দাদনী ব্যবসায়ী নামে পরিচিতি। কোম্পানী এদের সাথে যে চুক্তি করত তাতে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য সরবরাহের শর্ত থাকত। দ্রব্য ক্রয়ের জন্য কোম্পানী এদেরকে অগ্রিম অর্থ প্রদান করত। তারা আবার অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ীদের এবং তৃতীয় পর্যায়ে এরাই আবার উৎপাদকদের দাদন দিত। Sukumar Vattacharya এর মতে

The East India Company advanced as dadani some of the comodities imported by them, particularly the woolen products known as broadcloth[১০].

এ ব্যবস্থায় ১৭৫১ সাল নাগাদ কোম্পানীর বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৩৪ লক্ষ। এই দাদনী ব্যবস্থার সব থেকে লাভবান ছিল কোম্পানী অন্যদিকে সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত ছিল উৎপাদক শ্রেণী। পণ্যের বাজারমূল্য বেশি হলেও তারা উৎপাদিত পণ্য অন্য কোন বণিক গোষ্ঠীর নিকট বিক্রয় করতে পারত না। দীর্ঘ এক শতাব্দীর অধিক সময় চালু থাকা দাদনী ব্যবস্থার স্থলে ১৭৫৩ সালে প্রবর্তন করা হয় এজেন্সি ব্যবস্থা। ১৭৫৩ সালে দাদনী ব্যবস্থার স্থলে এজেন্সি ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার পিছনে কিছু কারণ ছিল—

১. সাধারণভাবে কোম্পানীর দাদনী বণিকদের আর্থিক অবস্থার অবনতি

২. সময়মত পণ্যসরবরাহে ব্যর্থতা, গাফিলতি ও অক্ষমতা

৩. দাদনী বণিকদের অনড় মনোভাব ঔদ্ধত্য এবং ১৭৫৩ সনে কোম্পানীর পছন্দমত শর্তে চুক্তি করতে রাজী না হওয়া

---

[৯] এম ওয়াজেদ আলী, *বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস* (ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশনা, ২০০০) পৃ. ১১।

[১০] সুকুমার ভট্টাচার্য : *দি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এন্ড দি ইকনোমি অব বেঙ্গল*, ১৭০৪-১৭৪০, কলকাতা, ১৯৬৯, পৃ.১২৯।

৪. বাংলা মারাঠা আক্রমণ, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অশান্তি কোম্পানীর আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা

৫. সম্ভবত দাদনী বণিকদের সরিয়ে কলকাতা কাউন্সিলের সদস্যরা নিজেদের ব্যক্তিগত আর্থিক স্বার্থ পূরণ করার কথা ভেবেছিলেন।[১১]

দাদনী ব্যবসার প্রতি তাঁতীদের অনীহার কারণে মূলতঃ এই ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়। কেননা, কোম্পানী তাঁতীদের বাজার দর হতে ২০-৩০ টাকা কম দিত। এজেন্সি ব্যবস্থায় প্রত্যেক আড়ং দেখাশুনার জন্য দায়িত্ব থাকতেন একন বেতনভোগী ইংরেজ রেসিডেন্ট। তার অধীনে থাকত বেতনভোগী গোমস্তা। এ ব্যবসাও তঁাতীদের দাদন দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। এই এজেন্সী ব্যবস্থাও ত্রুটির উর্ধ্বে ছিল না। কোম্পানীর কর্মকর্তা উইলিয়াম বোল্টস এর বর্ণনামতে দরিদ্র হতভাগ্য তাঁতীদের স্বতন্ত্র সম্মতির কোন তোয়াক্কা না করে গোমস্তা তাঁতীদের দাদন দিত। এরপর কোর্ট অব ডাইরেক্টর এজেন্সি ব্যবস্থার পাশাপাশি চুক্তি (Contract) ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। এ ব্যবস্থায় দাদনী ব্যবসায়ীদের পরিবর্তে কলকাতার ব্যবসায়ী ও ফ্যাক্টরী প্রধানদের সাথে করা হয়। এম ওয়াজেদ আলীর মতে, এ সময় কোম্পানীর বিনিয়োগ আংশিক দাদনী ও আংশিক এজেন্সি ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ঢাকা, লক্ষীপুর, শান্তি ও পাটনা আড়ং এজেন্সি ব্যবস্থার অধীনে এবং বাকী আড়ং সমূহ দাদনী ব্যবস্থার অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এছাড়া গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনামলে (১৭৭৩-১৭৮৫) অল্পমূল্যের ঠিকাদারী বেশিমূল্যে প্রদান করা হত বলে সিরাজুল ইসলাম উল্লেখ করেছেন।

এজেন্সি ব্যবস্থা

এজেন্সি ব্যবস্থার কাঠামো নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক আড়ং দেখাশোনা করার জন্য একজন বেতনভোগী ইংরেজ রেসিডেন্ট থাকতো এবং তার অধীনে থাকতো বেতনভোগী গোমস্তা। কর্মচারী মোহরি, সেরেস্তাদার, যাচনদান, মুকিম, তাগিদদার, বরকন্দাজ, পিয়ন এরা সবাই গোমস্তার অধীনে থাকতো। এজেন্সি ব্যবস্থাতেও তাঁতীদের দাদন দেয়ার প্রচলন ছিল। তাদের সাথে কোম্পানী চুক্তি করতো। তঁাতীদের চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বস্ত্র সরবরাহ করতে হতো। দাদন দেয়াও দ্রব্য সংগ্রহ করা এগুলো ছিল গোমস্তাদের দায়িত্ব। এ ব্যাপারে অন্যান্য কর্মচারীরা গোমস্তাকে সাহায্য করত।

---

[১১] এন. কে সিংহ, *দি ইকনোমিক হিস্ট্রি অব বেঙ্গল*, কলকাতা, ১৯৫৬-৭০, ১ম খন্ড, পৃ.৭।

এজেন্সি ব্যবস্থার কিছু ত্রুটি ছিল। কোম্পানী এককালের কর্মকর্তা উইলিয়াম বোল্টস কোম্পানীর কর্মচারীরা কিভাবে তাঁতীদের কাছ থেকে পণ্য সংগ্রহ করতো তার একটি বিবরণ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন যে—

গোমস্তা তাঁতীদের দাদন দিতো। দরিদ্র হতভাগ্য তাঁতীদের স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতির কোন তোয়াক্কা তারা করতো না। তাঁতীরা দাদন নিতে না চাইলে তাদের কোমরে টাকা গুঁজে দিয়ে বেত্রাঘাত করা হতো। গুদামজাত করার পর যাচনদার দ্বারা মালামাল যাচাই করা হতো। অনেক ক্ষেত্রে, যাচনদার ‘ক’ শ্রেণীর পণ্য ‘খ’ শ্রেণীর পণ্যে পরিণত করতো। ফলে তাঁতীরা কম মূল্য পেত।

পলাশীর যুদ্ধের পর এজেন্সি ব্যবস্থা তাঁতীদের জন্য আরো ক্ষতিকর হয়। কোম্পানীর কর্মচারীরা তাঁতীদের আগের মত বাজার দর থেকে শতকরা ২০ থেকে ৩০ টাকা কম দিতে থাকে। ফলে চুক্তিবদ্ধ হয়েও তাঁতীরা অন্যান্য কোম্পানীর সঙ্গে ব্যবসা আরম্ভ করে। শাসক কোম্পানী আইন পাস করে তাঁতীদের নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা করে। এ প্রক্রিয়ার ফলে তাঁতীদের স্বাধীনতা হারায়। এজেন্সি ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে কোম্পানী কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ ব্যক্তিগত ব্যবসায় লিপ্ত হয়। পলাশী যুদ্ধের পর তাদের ব্যবসার বিস্তৃতি ঘটে। তারা কোম্পানী দস্তকের অপব্যবহার করে বিনাশুল্কে ব্যবসা করে। অন্যদিকে বাঙ্গালি ব্যবসায়ীদের শুল্ক দিতে হতো। ইংরেজদের সাথে প্রতিযোগিতায় তারা পেরে উঠেনা। ফলে তারা অভ্যন্তরীণ ব্যবসা থেকে উৎখাত হয়।

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অত্যাচার ও ব্যক্তিগত ব্যবসা অব্যহত থাকা সত্ত্বেও কোম্পানীর বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৩৪ লক্ষ টাকা। ১৭৯৩ সালে এর পরিমাণ ১ কোটি ৯ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি পায়।

কলকাতা থেকে ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের জন্য কলকাতা কাউন্সিল বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কমিটি গঠন করে। প্রথমে কাউন্সিলে একজন সদস্যকে সভাপতি করে আড়ং কমিটি গঠন করা হয়। ফরে আড়ং কমিটির স্থলে বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ কমিটি গঠিত হয়। ১৭৭৪ সালে ১১ সদস্য বিশিষ্ট বোর্ড অফ ট্রেড নামক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ কমিটি গঠন করা হয়। এদের মধ্যে ৭ জন কলকাতায় থাকতেন আর ৪ জন প্রধান বিক্রয় কেন্দ্রে অবস্থান করতেন। এ কমিটি শক্তিশালী কমিটি হিসেবে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করে। এজেন্সি ব্যবস্থার ত্রুটিসমূহ কোর্ট অব ডাইরেক্টরের জানা ছিল। তাই দাদনী ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়া যায় কি না সে সম্পর্কে তারা কোম্পানীর কর্মকর্তাদের মতামতের প্রাধান্য দেয়া হয়েছিল। এজেন্সি ব্যবস্থার বদৌলতে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করায় কর্মকর্তারা এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। তথাপি কোর্ট অব ডাইরেক্টর এজেন্সি ব্যবস্থার পাশাপাশি চুক্তি (দাদনী) ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। এ চুক্তি

দাদনী ব্যবসায়ীদের সাথে না করে কলকাতার ব্যবসায়ী ও ফ্যাক্টরী প্রধানদের সাথে করা হয়। ১৭৮৭-৮৮ সালের বিনিয়োগ থেকে জানা যায় যে, এ সময়ে কোম্পানীর বিনিয়োগ আংশিক দাদনী ও আংশিক এজেন্সি ব্যবস্থার অধীনে রাখা হয় এবং অন্যান্য আড়ং সমূহ দাদনী ব্যবস্থার অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

১৭৫৩-১৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দ কোম্পানীর পণ্যসংগ্রহ নীতির ২য় পর্ব।[১২]ডিরেক্টর সভা এজেন্সি ব্যবস্থায় সরাসরি পণ্য ক্রয়-পদ্ধতি সমর্থন করলেন। তবে কর্মচারীদের কাজ কর্মের উপর লক্ষ্য রাখার জন্য কলকাতা কাউন্সিলে নির্দেশ পাঠানো হল। এই পর্ব কোম্পানীর কর্মচারীদের অবৈধ ও বৈধ ব্যক্তিগত ব্যবসার সুবর্ণযুগ। তারা শুধু বিনাশুল্কে নিজেদের ব্যবসা করেনি, 'দস্তকের' অপব্যবহার এ যুগে সবচেয়ে বেশি হয়। পণ্য সংগ্রহের সমস্ত দায়দায়িত্ব এ সময় কোম্পানীর কর্মচারীদের হাতে ন্যস্ত ছিল বলে তারা নানাভাবে ধন সঞ্চয়ে উদ্যোগী হয়। তারা কোম্পানীকে যেমন ঠকাত তেমনি এদেশিয় উৎপাদকদের ঠকিয়ে অর্থোপার্জন করত। এদেশীয় উৎপাদকরা কোম্পানীর আড়ঙ্গে রপ্তানি পণ্য সূতীবস্ত্র, রেশম, রেলসবস্ত্র ইত্যাদি নিয়ে এল এল ঐ পণ্যগুলি কোম্পানীর নির্দিষ্ট মানের নয় বলে কর্মচারীরা বাতিল করত। পরবর্তীতে ঐ পণ্যগুলি তারা নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যবসার জন্যে কিনে নিত। উৎপাদকরা আড়ঙে নানাধরনেল বস্ত্র নিয়ে এলে এজেন্টদের সোমস্তারা এগুলিকে এ, বি, সি, ডি, ই- পাঁচ ভাগে ভাগ করে প্রতিটি শ্রেণীর বস্তু এক অক্ষর নামিয়ে কিন্তু আবার এক অক্ষর উপরে উঠিয়ে কোম্পানীর কাছে বিক্রি করত। এছাড়া উৎপাদকের কাছ থেকে দালালি ও দস্তুরি নেওয়ার প্রথা ছিল। কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা ও এদেশীয় গোমস্তাদের মত নিজস্ব প্রাপ্য দস্তুরি নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতেন না।

১৭৫৭ সালের মার্চ মাসে কোম্পানীর ডিরেক্টর সভা বাংলা বাণিজ্যে অবণতির কারণ জানতে চান। কলকাতা কাউন্সিল যে কারণগুলি জানিয়েছিল সেগুলি হল:

ক. বিদেশে (সম্ভব পশ্চিম এশিয়াতে) কতকগুলি ভাল ভাল বাজারের অবক্ষয়;

খ. বাংলার নবাবদের জবরদস্তিভাবে টাকা আদায়

গ. ভারতে বিভিন্ন বন্দরে উচ্চ শুল্ক হার

---

[১২] অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোম্পানি যে রপ্তানি পণ্য সংগ্রহ নীতি অনুসরণ করেছিল তাকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। ১. ১৭০০-১৭৫৩ পর্যন্ত কন্ট্রাক্ট সিস্টেম, ২. ১৭৫৩-১৭৭৫ পর্যন্ত এজেন্সি সিস্টেম ৩. ১৭৭৫-১৭৮৮ পর্যন্ত আবার কন্ট্রাক্ট সিস্টেম ৪. ১৭৭৮-১৭৯৯ পর্যন্ত এজেন্সি পর্যন্ত এজেন্সি সিস্টেম।

ঘ. বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার বাজারে নতুন নতুন ক্রেতার আর্বিভাব এবং

ঙ. ওলন্দাজ ও ফরাসীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

১৭৫৩ থেকে ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানীর বাংলা বাণিজ্য কোনো বড় রকমের ঘাটতি দেখা যায় না। ঐ চার বছর গড়ে পঁচিশ থেকে ত্রিশ লাখ টাকার রপ্তানি পণ্য এজেন্সি ব্যবস্থায় কেনা হয়েছিল। শুধু পলাশী যুদ্ধের বছরে কোম্পানীর সামান্য ব্যবসা হয়েছিল— রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ মাত্র ৫,৫৩,৭৫২ টাকা। পলাশীর পর থেকে কোম্পানীর পণ্যসংগ্রহ নীতিতে গুরুতর পরিবর্তন আসে। পলাশী পর্যন্ত বাংলাদেশে রপ্তানি পণ্য কেনার জন্য কোম্পানীকে দেশ থেকে সোনা রূপো আনতে হত। পলাশীর পর থেকে কোম্পানীর হাতে এত টাকা আসতে থাকে যে পণ্য কেনার জন্যে দেশ থেকে আর সোনা রূপো মূলধন হিসেবে আনার প্রয়োজন হল না।

১৭৫৭-র জুন মাসের চুক্তি অনুযায়ী মীরজাফর কোম্পানীকে প্রায় এক কোটি টাকা দিয়েছিলেন। ১৭৬৩-র জুলাই মাসের চুক্তিতে তিনি কোম্পানীকে আরো তিরিশ লক্ষ টাকা দিলেন। ১৭৬০-এ মীরকাশিম বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম রাজস্ব কোম্পানীর হাতে ছেড়ে দেন। এ তিনটি জেলার বার্ষিক আয় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। মীরজাফর আগেই চব্বিশ পরগণা কোম্পানীকে দিয়েছিলেন। ১৭৬৫-তে দেওয়ানি লাভের পর থেকে কোম্পানীর হাতে আরো রাজস্ব এল। শুধু যুদ্ধের বছরগুলি ছাড়া কোম্পানীকে রপ্তানি পণ্য কেনার জন্যে ধার করতে হত না বা দেশ থেকে মূলধন আনার প্রয়োজন দেখা দিতনা।

এ পর্বে নিজের পণ্য কেনা ছাড়াও কলকাতা কাউন্সিল উদ্বৃত্ত রাজস্বের একাংশ (বছরে গড়ে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা) বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি ও কোম্পানীর চীনদেশের বাণিজ্যের জন্যে পাঠাত। বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি এ টাকার একাংশ রপ্তানি পণ্য ক্রয়ে কাজে লাগাত। তাছাড়া কোম্পানীর কর্মচারীদের বাংলায় উপার্জিত টাকা কোম্পানীর উপরে 'বিগ অব এক্সচেঞ্জের' মাধ্যমে দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা হয়। ফলে এ পর্বে নানা কারণে বাংলাদেশে রূপোর অভাব ও মুদ্রাসংকট দেখা দেয়। এ সংকট থেকে বাঁচার জন্যে সোনার মোহর বৈধ মুদ্রা হিসেবে বাজারে ছাড়া হয়। ১৭৬৯ খ্রিষ্টাব্দে থেকে বাংলায় দ্রব্যমূল্য ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিভিন্ন যুদ্ধ বিগ্রহেও (হায়দার, আলী, মীরকাশেম, ফরাসী ও ওলন্দাজদের সঙ্গে) কোম্পানীর বেশ কিছু টাকা খরচ হয়, সেজন্যে এ পর্বের শেষ দিকে কোম্পানীকে ঋণপত্র বিক্রি করে রপ্তানি পণ্যের একাংশ কিনতে হয়। ১৭৭৩-এ

কোম্পানীর ঋণের পরিমাণ হল ১,৩৯,২৭,০৩২ টাকা।[১৩] পণ্যমূল্য বৃদ্ধির জন্যে অবশ্য এদেশীয় উৎপাদকরা আর্থিক দিক দিয়ে লাভবান হয়নি। সুতো ও খাদ্যশস্যের দাম বেড়েছিল অনেক খানি অথচ কোম্পানীর ক্রয়যোগ্য রপ্তানি পণ্যের দাম বাড়লোনা। সত্তরের দশকে সুতার দাম বাড়ল ২৫ শতাংশ অথচ সেই হারে কোম্পানীর ক্রয়যোগ্য কাপড়রের দাম বাড়েনি। শান্তিপুরের তাঁতিদের অভিযোগ কোম্পানীর গোমস্তারা তাদের কাপড়ের বাজার দাম অপেক্ষা কম দাম দেয়। এ দামে অনেক সময় তাদের কাপড়ের সুতার দামটুকু উঠত মাত্র। আবার অনেক সময় সুতার দাম ও উঠত না।

দ্বিতীয় পর্বে, কোম্পানীর বাণিজ্য অনেকখানি বেড়ে যায়। ১৭৫৩ সনে মোট রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ ৩০,০৩,৫৯২ টাকা। ১৭৭৫ সালে এর পরিমাণ বেড়ে হল ৮৩,৯৫,৫৩৩ টাকা। অঢেল টাকার যোগান এবং কোম্পানীর রাজনৈতিক আধিপত্য কোম্পানীর রপ্তানি বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির কারণ বলে ধরা যেতে পারে। ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানীর 'আড়ঙ' কমিটি কোম্পানীর পণ্যক্রয় ব্যবস্থা তদারকি করত। কিছুকাল পরে কোম্পানীর রপ্তানি পণ্যক্রয় তাদরকির জন্য কন্ট্রোলার অবদি ইনভেস্টমেন্ট নিযুক্ত হয়েছিলেন।

উইলিয়াম বোল্টস তাঁর সুপরিচিত "কনসিডারেশনস অব ইন্ডিয়ান এ্যাফেয়ার্স" গ্রন্থে পলাশী পরবর্তীকালে কোম্পানীর এজেন্ট ও গোমস্তাদের পণ্যক্রয় পদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে, শুধু অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য নয় কোম্পানীর ইউরোপীয় রপ্তানি বাণিজ্যের পণ্যসংগ্রহ পদ্ধতি মূলত অত্যাচারের মাধ্যমে পরিচালিত হত। এর কুফল এদেশের প্রতিটি 'তাঁতি উৎপাদক' ভোগ করত। এদেশে উৎপন্ন প্রতিটি পণ্যে একচেটিয়া অধিকার করত ইংরেজরা। এদেশীয় বেনিয়ান ও কালা গোমস্তাদের সহায়তায় প্রতিটি উৎপাদক কত পরিমাণ পণ্য সরবরাহ করবে এবং কত মূল্য পাবে তা ঠিক করত ইংরেজরা। গোমস্তা কাছারিতে এসে দালাল, পাইকার ও তাঁতিদের ডেকে পাটিয়ে কিছু টাকা অগ্রিম দেয়; তারপর নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট দামে বিশেষ পরিমাণ পণ্য সরবরাহে জন্যে তাঁতিকে চুক্তিতে সই করতে বাধ্য করে। তার মতামতের কোনো প্রয়োজন হয় না। গোমস্তা কোম্পানীর পক্ষে যা খুশি সই করিয়ে নিতে পারে। যদি কোনো কারণে তাঁতি অনিচ্ছা প্রকাশ করে তাহলে তার বস্ত্রাঞ্চলে টাকা গুঁজে দিয়ে বেত্রাঘাতে তাড়ানো হয়। গোমস্তাদের খাতায় তাঁতিদের নাম লিপিবদ্ধ থাকে। তারা ইচ্ছামত অন্যদের জন্যে কাজ করতে পারে না। ক্রিতদাসের মত তাদের—

---

[১৩] এন. কে সিংহ, *দি ইকনোমিক হিস্ট্রি অব বেঙ্গল*, কলকাতা, ১৯৫৬-৭০, ১ম খন্ড, পৃ.১৫।

এক গোমস্তা থেকে অন্য গোমস্তার অধীনে চালান করা হয়। এই বিভাগের দুর্নীতি ও অপশাসনে কল্পনার অতীত। তবে সবকিছুর মূল উদ্দেশ্য হল গরীব তাঁতিকে ফাঁকি দেওয়া। কোম্পানীর গোমস্তা ও যাচনদাররা (পন্যের গুন ও মূল্য নির্ধারক) পণ্যের যে দাম ধার্য করে তা খোলাবাজারে দামের চেয়ে অন্তত: ১৫ শতাংশ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ কম। তঁতিরা যদি তাদের মুচলেকা অনুযায়ী কোম্পানীর পণ্য সরবরাহ করতে না পারে তাহলে সেক্ষেত্রে তাদের পণ্য আটক ও বিক্রি করে কোম্পানীর পাওনা শোধ করা হয়। কাঁচা রেশম সুতা প্রস্তুতকারক ক্ষেত্রেও অনুরূপ অন্যায় পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।[14]

বিনিয়োগ ব্যবস্থা/পণ্যক্রয় ব্যবস্থা:

ঠিকাদারী (Contract System)

শতাব্দীর প্রথমভাগে কোম্পানী বাংলায় চুক্তি ব্যবস্থার (Contract System) মাধ্যমে পণ্য সংগ্রহ করত। এদেশীয় বণিকদের সঙ্গে পণ্য সরবরাহের চুক্তি হত। চুক্তিবদ্ধ বণিকরা নির্দিষ্ট দামে ও গুণগতমানে নির্দিষ্ট পণ্য সরবরাহ করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হত। বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে ঐ পণ্য সংগ্রহ করে বণিকরা কলকাতা বা কোম্পানীর মফ:স্বল ফ্যাক্টরিতে চুক্তিতে উল্লিখিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যোগান দিত। চুক্তির সময় কোম্পানী বণিকদের পণ্যমূল্যের পঞ্চাশ থেকে পচাত্তর শতাংশ অগ্রিম দিত। এই অগ্রিম দেওয়ার ব্যবস্থা থেকে চুক্তিবদ্ধ বণিকরা দাদনী বণিক নামে পরিচিত হয়। দাদনী বণিকরা দালালদের সঙ্গে এবং দালালরা আবার পাইকারদের সঙ্গে পণ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করত। এভাবে পণ্য সংগ্রহে কোম্পানীর কতগুলি সুবিধা হত।

প্রথমত, এদেশের বণিকদের অভিজ্ঞতা ও ব্যবসায়ী সংগঠন কোম্পানীর পণ্য সংগ্রহে ব্যবহার করা যেত। এভাবে কোম্পানী প্রায় বিনা আয়াসে তার রপ্তানি পণ্য সংগ্রহ করতে পারত।

দ্বিতীয়ত, এদেশীয় বণিকরা কোম্পানী ও এদেশীয় সরকারের মধ্যে মধ্যস্থ হিসেবে কাজ করত। তার ফলে সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে শুল্ক নিয়ে বিরোধ বা এদেশীয় বণিকদের প্রতিযোগিতার হাত থেকে কোম্পানী রেহাই পেত।

---

[14] William Bolts, *Considerations on India Affairs*: Particularly Respecting the Present State of Bengal and Its Dependencies, Volume 1, London, 1772, p. 191-194.

তৃতীয়ত, অস্টেন্ড কোম্পানীর প্রধান আলেকজান্ডার হিউমের মতে দাদনী ব্যবসায়ীদের বেশি পরিমাণ দাদন দিয়ে চুক্তি করলে সময়মত রপ্তানি পণ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা থাকত। দাদন না দিলে বিশাল পরিমাণ পণ্যের যথাসময়ে সরবরাহে অনিশ্চয়তা দেখা দিত।

কলকাতা ছাড়াও কোম্পানীর প্রধান প্রধান ফ্যাক্টরিতে এদেশীয় বণিকদের সঙ্গে পণ্য সরবরাহের চুক্তি হত। বাজারে প্রচলিত দামের উপর ভিত্তি করে দরদামের মাধ্যমে অর্থাৎ দরকষাকষি করে (bargaining) উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের নিয়ম ছিল। এরকম পাকাপাকি ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও পণ্য সরবরাহ করার পর এদেশীয় বণিকরা চুক্তিমত দামের সবটাই পেত না। কোন না কোন কারণে তাদের প্রাপ্ত দামের একাংশ বাদ যেত। সাধারণত যে কারণটি সর্বাধিক গুরুত্ব পেত সেটি হল সরবরাহ করা পণ্য চুক্তির সময়ের নমুনা (Sample) মানের অনুরূপ নয়। কোম্পানীর রপ্তানি পণ্যের গুদামবাবুও তার দাম নির্ধারক সহকারীদের এ ব্যাপারে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। পণ্যমূল্য নির্ধারণের সময় এরা একদিকে যেমন কোম্পানীকে ঠকাত তেমনি এদেশীয় বণিকদের ঠকিয়েও দু'পয়সা রোজগার করত। এদেশীয় বণিকরা কোম্পানীর কাছে অবৈধ, অন্যায় ও স্বেচ্ছাচারিতার পথে তাদের সরবরাহ করা পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা হচ্ছে বলে প্রায়শ: অভিযোগ করত। ঐ বছর দালালের পদটি তুলে দেওয়া হয়। ১৭৫৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানী অস্টেন্ড কোম্পানীর প্রধান আলেকজান্ডার হিউম তাঁর 'স্মৃতিকথায়' লিখেছেন বণিকদের অগ্রিম দেওয়ার উদ্দেশ্য হল নির্দিষ্ট সময়ে যথেষ্ট পরিমাণ পণ্যের সরবরাহ অব্যাহত রাখা। ঐতিহ্যগতভাবে বাংলায় বাণিজ্য পণ্য সংগ্রহ পদ্ধতিতে এ ব্যবস্থা অনেকদিন ধরে চলে আসছিল। বিদেশীরা বাংলা বাণিজ্যে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণের পর থেকে প্রতিযোগিতামূলক বাজারের জন্যে এ ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী হয়।

চল্লিশের দশকে কলকাতায় প্রধান প্রধান দাদনী ব্যবসায়ী হলেন গোপীনাথ শেঠ, রামকৃষ্ণ শেঠ, লক্ষীকান্ত শেঠ, শোভারাম বসাক, অকুর দত্ত, উমিচাঁদ, হুজুরিমল, এবং কোত্মা সম্প্রদায়ের বণিকরা।[১৫] দাদনী বণিকদের মাধ্যমে পণ্য সংগ্রহ ছাড়াও রপ্তানি পণ্যের একাংশ কোম্পানী নগদ টাকায় কিনত। সাধারণত নগদ টাকায় কেনা পণ্যের পরিমাণ মোট রপ্তানি পণ্যের এক তৃতীয়াংশ।

শতাব্দীর প্রথম বছর কোম্পানীর মোট রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ হল ১৮,৯৬,৯৬৮ টাকা। ১৭০৩ থেকে ১৭০৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানীর অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক গোলযোগের জন্য রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ খুব কমে গিয়েছিল। এ সময়ে বার্ষিক রপ্তানি বাণিজ্যের মোট পরিমাণ হল পাঁচ থেকে আট

---

[১৫] এন. কে সিংহ, *দি ইকনোমিক হিস্ট্রি অব বেঙ্গল*, কলকাতা, ১৯৫৬-৭০, ১ম খন্ড, পৃ. ০৬।

লক্ষ্য টাকা। ১৭১০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে কোম্পানীর রপ্তানি বাণিজ্য ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং ১৭২০ তে এসে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ২৬,৬২,৩৩৬ টাকা। ১৭২০ থেকে ১৭৩০ এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বাণিজ্য হয়েছিল ১৭২৭-এ। ঐ বছর কোম্পানীর মোট রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ হল ৪১,০৫,৯৯২ টাকা। ১৭৩০ থেকে ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানীর বাণিজ্যের পরিমাণ চব্বিশ থেকে আটত্রিশ লক্ষ টাকা। বাংলাদেশে মারাঠা আক্রমণকালে (১৭৪২-১৭৫১) কোম্পানীর রপ্তানি বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হয়েছিল। কোম্পানীর রপ্তানি বাণিজ্যের পরিসংখ্যান থেকে কিন্তু এই প্রচলিত ধারণার সমর্থন মেলেনা।

বরং ঐ সময়ে কোম্পানী বাংলা থেকে প্রতিবছর গড়ে পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ লক্ষ টাকার বাণিজ্য করেছিল। ১৭৫৩ খ্রিষ্টাব্দে কোম্পানীর মোট বাণিজ্যের পরিমাণ হল ৩০,০৩,৫৯২ টাকা।

কোম্পানীর পণ্যসংগ্রহ নীতির উপর অবশ্য মারাঠা আক্রমণের অন্যরকম প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বাংলার রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অশান্তির পরিপ্রেক্ষিতে ডিরেক্টর সভা কলকাতা কাউন্সিলের কাছে অগ্রিম বা দাদনী ব্যবস্থার মাধ্যমে পণ্যসংগ্রহ নীতির পরিবর্তন ঘটানোর সুপারিশ করেছিলেন। অগ্রিম দাদ্‌ন ব্যবস্থা একেবারে তুলে দিয়ে অথবা দাদনের পরিমাণ কমিয়ে নগদ টাকায় পণ্য কেনার ব্যবস্থা করার নির্দেশ করা হয়। এ প্রস্তাব যখন দাদনী বণিকদের নিকট রাখা হল তারা একযোগে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল। তারা দাদনী ব্যবস্থা রাখার পক্ষে দুটি জোরালো যুক্তি রাখে।

(১) দাদনী ব্যবস্থা উঠিয়ে দিলে বণিকদের প্রতিযোগিতামূলক বাজারে চড়া দামে পণ্য কিনতে হবে;

(২) আর নবাব সরকার যদি জানতে পারেন বণিকরা নিজেদের মূলধনে পণ্য কিনছে তাহলে তাদের কাছ থেকে জবরদস্তিভাবে বেশি টাকা আদায় করবেন।

কোম্পানীর কলকাতা কাউন্সিল তাদের যুক্তি গ্রাহ্য করলেন না কারণ এদেশি দাদনী বণিকরা সময়মত তাদের চুক্তিমত পণ্যসরবরাহে ক্রমশ : ব্যর্থ হচ্ছিল। ১৭৫২ সনে কোম্পানী বাংলার বণিকদের সঙ্গে পনেরো লক্ষ টাকার পণ্য সরবরাহের চুক্তি করেছিল। এজন্য তাদের মোট পণ্যমূল্যের ৮৫ শতাংশ অগ্রিম দেওয়া হয়েছিল। অথচ যখন ইউরোপে জাহাজ পাঠানোর সময় এল দেখা গেল দাদনী বণিকরা মাত্র আট লক্ষ টাকার পণ্যসরবরাহ করতে সক্ষম হয়েছে। এ হিসেব কোম্পানীর রপ্তানি পণ্যের গুদামবাবু চার্লস স্যানিংহ্যাম এবং উইলিয়াম ফ্রাঙ্কল্যান্ডের।[১৬] অথচ আগের দিন কোম্পানীর দাদনী

---

[১৬] K.N Chaudhury, *The English East India Company* (London : Tylor and Francis Group, 1915) p.11.

বণিকরা পঁচিশ লক্ষ টাকার রপ্তানি পণ্য স্বচ্ছন্দে যথাসময়ে সংগ্রহ করে দিত। ১৭৫৩ খ্রিষ্টাব্দে থেকে কোম্পানী নিজেদের কর্মচারী ও গোমস্তাদের মাধ্যমে সরাসরি উৎপাদকের কাছ থেকে পণ্য কেনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। ইংরেজদের আগেই ওলন্দাজরা অবশ্য এ ব্যবস্থা চালু করেছিল। নতুন পণ্যসংগ্রহ ব্যবস্থা এজেন্সি সিস্টেম নামে পরিচিত। কন্ট্রাক্ট সিস্টেম বা চুক্তি ব্যবস্থা ত্যাগ করার কারণগুলি হল :

১. সাধারণভাবে কোম্পানীর দাদনী বণিকদের আর্থিক অবস্থার অবনতি।

২. সময়মত পণ্য সরবরাহে ব্যর্থতা, গাফিলতিও অক্ষমতা।

৩. দাদনী বণিকদের অনঢ় মনোভাব ঔদ্ধত্য এবং ১৭৫৩ সনে কোম্পানীর পছন্দমত শর্ত চুক্তি করতে রাজী না হওয়া।

৪. বাংলাদেশে মারাঠা আক্রমণ, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অশান্তি কোম্পানীর আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা।

৫. সম্ভবত দাদনী বণিকদের সরিয়ে ফলদাতা কাউন্সিলের সদস্যরা নিজেদের বক্তিগত আর্থিক স্বার্থপূরণ করার কথা ভেবেছিলেন।[১৭]

চুক্তি ব্যবস্থা (২য়) (Contract System 2nd)ঃ

১৭৭৭ সনের ২৯ মার্চ, ডিরেক্টর সভার নির্দেশে কোম্পানীর বাণিজ্য পরিচালনার জন্য ‘বোর্ড অব ট্রেড’ গঠিত হয়। এই বোর্ডের হাতে কোম্পানীর রপ্তানি পণ্য কেনা ও আমদানি পণ্য বিক্রির সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়। কোম্পানীর এগারজন সিনিয়র কর্মচারী নিয়ে গঠিত এই বোর্ডের হাতে বাণিজ্যিক প্রশাসন সংক্রান্ত সমস্ত রকম সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ছিল। শুধু রপ্তানি পণ্যের পরিমাণ ঠিক করা দায়িত্ব দেওয়া হয় সুপ্রিম কাউন্সিলের হাতে। বোর্ড অব ট্রেড বাংলায় কোম্পানীর রপ্তানি পণ্য সংগ্রহের জন্যে আবার ‘কন্ট্রাক্ট সিস্টেম’ চালু করে। অর্থাৎ কোম্পানীর এজেন্ট ও দেশীয় বণিকদের সঙ্গে চুক্তি করে কোম্পানীর পণ্য সংগ্রহের নীতি গ্রহণ করা হয়। তবে প্রথম পর্বে চুক্তি ব্যবস্থার সঙ্গে তৃতীয় পর্বের (১৭৭৫-১৭৮৮) চুক্তি ব্যবস্থার একটি পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

---

[১৭] এন. কে সিংহ, *দি ইকনোমিক হিস্ট্রি অব বেঙ্গল*, কলকাতা, ১৯৫৬-৭০, ১ম খন্ড, পৃ.০৭।

প্রথম পর্বে, প্রধানত এদেশীয় দাদনী বণিকরা কোম্পানীর রপ্তানি পণ্য সরবরাহ করত। তৃতীয় পর্বের, চুক্তি ব্যবস্থায় কোম্পানীর কর্মচারীরা কোম্পানীর পণ্যসরবরাহে অগ্রাধিকার পেয়েছিল।

এজেন্সি ব্যবস্থার শেষদিকে কোম্পানীর সংগৃহীত পণ্যের গুনগত মানের অবনতি এবং অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি ডিরেক্টর সভাকে পণ্যক্রয় নীতি পরিবর্তনে বাধ্য করে। বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য বন্ধ করার জন্যে তাঁরা সচেষ্ট হন। তাঁদের ধারণা কোম্পানীর কর্মচারীরা ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকার জন্যে বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও পণ্যোৎপাদন ব্যবস্থার কোনো উন্নতি হচ্ছে না। ১৭৭৫ থেকে ১৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দে পর্যন্ত কোম্পানী কন্ট্রাক্ট বা চুক্তি ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের রপ্তানি পণ্য সংগ্রহ করেছিল। ১৭৭৫-এ কোম্পানীর মোট রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ হল ৮৩,৯৫,৫৩৩ টাকা আর ১৭৮৮ এর পরিমাণ দাঁড়ালো ৮২,৮০,৭১৭ টাকা। পলাশী উত্তর যুগে, কোম্পানীর পণ্যসংগ্রহ পদ্ধতির একটি বৈশিষ্ট্য হল বাংলার পণ্যের মাধ্যমে বিলেতের কর্তৃপক্ষ বাংলার রাজস্ব ভোগ করতে শুরু করলেন। অর্থাৎ ডিরেক্টর সভা মুঘল সম্রাটদের উত্তরাধিকারী হলেন।

সত্তরের দশকে, পণ্যসংগ্রহ নীতিতে অন্যরকম পরিবর্তন দেখা যায়। কোম্পানী এতদিন বাংলা থেকে সুতীবস্ত্র, রেশম ও রেশমবস্ত্র রপ্তানি পরত। কিন্তু এখন থেকে কোম্পানী মোটা সুতীবস্ত্র ও রেশমবস্ত্র রপ্তানি কমিয়ে দেওয়া শুরু করে। কোম্পানী ইংল্যান্ডের কাটা সুতো ও জড়ানো রেশম পাঠাতে শুরু করে, যেগুলো রেশম শিল্পের উপযোগী।

এই চুক্তি ব্যবস্থার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অভিসম্বাদী আধিপত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব। বাংলার ফরাসী ও ওলন্দাজ বণিকরা এই পণ্য সংগ্রহরে ব্যাপারে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সহযোগিতার উপর অনেকখানি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় বোর্ড অব ট্রেডের অধীনে কোম্পানীর বাংলা থেকে পণ্যসংগ্রহ পদ্ধতিতে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি।

তবে এ পর্বে কন্ট্রাক্ট সিস্টেম চালু থাকায় দুর্নীতি খুব বেড়েছিল। কোম্পানীর কর্মচারীরা পূর্বের মত করে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও অপ্রত্যক্ষভাবে প্রচুর মুনাফা করতে থাকে। এই চুক্তি ব্যবস্থাতেও কোম্পানীর ক্রয়কৃত পণ্যের দাম বেশি পড়ত এবং পণ্য নীচু মানের হত। কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে আশাতিরিক্ত লাভ হত।

উৎস: সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, বাংলার আর্থিক ইতিহাস (অষ্টাদশ শতাব্দী)

এজেন্সি ব্যবস্থা (২য়) (Agence System 2nd):

কর্ণওয়ালিশ ১৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দে কন্ট্রাক্ট সিস্টেমের অবসান ঘটিয়ে আবার এজেন্সি ব্যবস্থা চালু করেন। কোম্পানীর বাণিজ্য বিভাগ পুর্নগঠনের জন্য তিনি কতগুলো ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। যেমন :

ক. বোর্ড অব ট্রেডের সদস্য সংখ্যা কমিয়ে পাঁচ করা হল।

খ. বোর্ডর কার্যাবলীর উপর সপারিষদ গর্ভনর জেনারেলের তদারকির ব্যবস্থা করা হল।

গ. সরকারি কর্মচারীদের বেতন ও কমিশন বাড়িয়ে তিনি রাজস্ব ও বিচার বিভাগীয় কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের অধিকার রহিত করলেন।

ঘ. শুধু কর্মাশিয়াল রেসিডেন্টদের (Commercial Resident) ব্যক্তিগত বাণিজ্যের অধিকার রাখা হল ঠিকই তবে তাদের ক্ষেত্রেও কঠোর বিধিনিষেধ এমনভাবে আরোপ করা হল যাতে কোম্পানীর বাণিজ্যের বিন্দুমাত্র ক্ষতি না হয়।

১৭৮৯ সাল থেকে এজেন্সি ব্যবস্থায় কোম্পানীর রপ্তানি পণ্য কেনা পুরোপুরি চালু ছিল। এ ব্যবস্থায় পণ্য সংগ্রহের ফলে কতকগুলো আর্থিক সুবিধা হল। উৎপাদকরা আগের চেয়ে ভালো পারিশ্রমিক বা মূল্য পেল। কোম্পানীর সংগৃহীত পণ্যের গুণগত মানে উন্নতি লক্ষ্য করা গেল আর পূর্ববর্তী কন্ট্রাক্ট বা চুক্তি ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনায় এ ব্যবস্থায় কমিশন দিয়েও কোম্পানী অপেক্ষাকৃত কম দামে পণ্য কিনতে পারলো। ১৭৯০ সনের অক্টোবর মাসে বোর্ডের মন্তব্য — "বর্তমান ব্যবস্থায় সুবিধা সকলেই স্বীকার করেছেন। কোম্পানীর এদেশীয় কর্মচারীদের দুর্নীতি বন্ধ হয়েছে; ন্যায্য লেনদেন, শৃঙ্খলাও নিয়মরীতি স্বীকৃতি পাওয়ায় দেশের সুখ ও কোম্পানীর সুবিধা বাড়ছে।"

১৭৮৮ খ্রি: কোম্পানী রপ্তানি বাণিজ্যের মোট পরিমাণ হল ৮২,৮০,৭১৭ টাকা। ১৭৯৩ সনে বাণিজ্য ক্রমশ : বেড়ে গিয়ে দাঁড়ালো ১,০৯,৫৯,১৩০ টাকায়। ১৭৯৩ থেকে ১৭৯৮ পর্যন্ত কোম্পানীর গড়ে প্রতি বছর এক কোটি তেত্রিশ লক্ষ টাকার রপ্তানি বাণিজ্য করেছিল। ১৭৯৭-৯৮ সনে কোম্পানীর ঋণের পরিমাণ হল ৭,৬৭,৩০১৭৮ টাকা। এ ঋণের একাংশ কোম্পানীর এ যুগের রপ্তানি পণ্যের জন্যে ব্যয় হয়েছিল।

এজেন্সি ব্যবস্থা (২য়) এর বৈশিষ্ট্য সমূহ:

ক. এদেশীয় মধ্যস্বত্বভোগী দালাল ও পাইকারদের ক্রমশ অবলুপ্তি। শেষ পর্যায়ে কোম্পানীর পণ্যসংগ্রহে এদের আর বিশেষ কোনো ভূমিকা রইল না।

খ. এদেশীয় বণিকরা কোম্পানীর দাদনী ব্যবসায়ী হিসেব কাজ করার জন্যে আর আগ্রহ দেখায় নি। কলকাতার দাদনী ব্যবসায়ী শেষ ও বসাকরা কোম্পানীর পণ্যসংগ্রহ ব্যবস্থা থেকে আস্তে আস্তে অপসৃত হল। কোম্পানীর কর্মচারীরা প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে এদেশীয় দাদনী বণিকদের বা কোম্পানীর পণ্যসরবরাহে যুক্ত অন্যান্য বণিকদের অপছন্দ করেছিল।

গ. এই পর্বে ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব কোম্পানীর রপ্তানি পণ্যসংগ্রহ নীতির উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ১৭৮৩ খ্রিষ্টাব্দে ম্যানচেস্টারে যন্ত্রশিল্পে প্রস্তুত মসলিন তারা পরীক্ষামূলক ভাবে এদেশের বাজারে পাঠিয়েছিলেন। এ সময় মাঝারি ও মোট কাপড় নিয়ন্ত্রণ শুরু হয়।

ইংল্যান্ডের বস্ত্র উৎপাদক ও শিল্পপতিরা এগুলির রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ডিরেক্টর সভার উপর ক্রমাগত চাপ দিতে থাকে। ১৭৮৬ সালে বাদ পড়ে গেল তুলার সুতা রপ্তানি। আশির দশক ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তুলা, নীল, চিনি, তামাক, পাট, ক্ষণ ইত্যাদি রপ্তানি করার চিন্তা করতে থাকে। অস্টাদশ শতাব্দীর বাংলায় তাঁতের প্রয়োজনীয় তুলা উৎপন্ন হতনা। এজন্য পশ্চিম, মধ্য ও দক্ষিণ ভারত থেকে তুলা আমদানি করে বাংলার ঘাটতি মেটাতে হতো। নীল ও চিনি কোম্পানীর রপ্তানি তালিকায় স্থান পেল। ১৭৯৫ সালে চিনির ব্যবসা তেমনটা লাভজনক হয়নি।

ইংল্যান্ডে এ সময় সুতী বস্ত্রশিল্পের উন্নতি ফলে, কোম্পানীর কাঁচা রেশম রপ্তানি ব্যবসা ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ইংল্যান্ডের বাজারে কাঁচা রেশমের দাম অস্বাভাবিক ভাবে নামতে থাকে। নাম প্রতি পাউন্ডের দাম ২১ শিলিং ৮ পেন্স থেকে ১৬ শিলিং ৪ পেন্সে নেমে আসে। এ সময় কোম্পানী চুক্তির মাধ্যমে নীল সংগ্রহ করে। এই নীল বস্ত্রশিল্পে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ক্ষণ বা পাট সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকায় কোম্পানীর রপ্তানি পণ্য তালিকায় স্থান পায়নি।

সম্পূর্ণ অষ্টাদশ শতাব্দী ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলা থেকে রপ্তানি পণ্য সংগ্রহের জন্য চার রকমের পদ্ধতি অনুসরণ করেছিল—

১. দালাল ও পাইকারদের মাধ্যমে

২. দাদনী-বণিকদের মাধ্যম-কন্ট্রাক সিস্টেম

৩. নিজেদের এজেন্ট ও গোমস্তাদের মাধ্যম-এজেন্সি সিস্টেম এবং

৪. নগদ মূল্যে পণ্য ক্রয় ব্যবস্থার মাধ্যম (Ready Money Purchase)

এক একটি পর্বে কমপক্ষে দুইটি পদ্ধতি চালু ছিল। যখন কোম্পানীর দাদনী বণিকদের সঙ্গে চুক্তি করে পণ্য সংগ্রহ করেছিল তখন রপ্তানি পণ্যের অন্তত এক তৃতীয়াংশ সরাসরি নগদ টাকায় কেনা হত। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কোম্পানী তার পণ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ঠিক করত। বাংলায় মারাঠা আক্রমণ ও দাদনী বণিকদের আর্থিক অবস্থার ক্রমাবনতি তাদের এজেন্সি ব্যবস্থার দিকে নিয়ে যায় (১৭৫৩)। কোম্পানী কর্মচারিদের অবৈধ বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য নিয়ে ওয়ারেন্ট হেস্টিংস আবার কন্ট্রাক্ট সিস্টেম চালু করে দেন (১৭৭৫)। বোর্ড অব ট্রেডের দুর্নীতি কর্ণওয়ালিশকে পুনরায় এজেন্সি ব্যবস্থা চালু করতে প্ররোচিত করে (১৭৮৮)। কোম্পানীর পন্য সংগ্রহ পদ্ধতিতে শতাব্দী ব্যাপি এরকম পরীক্ষা নিরিক্ষার উদ্দেশ্য হলো ন্যায্য দামে ও যথাযথ গুণগতমানে কোম্পানীর রপ্তানির পণ্য সংগ্রহ করা। অপর উদ্দেশ্য হলো বাংলার উৎপাদকদের উপর কোম্পানীর এজেন্ট, গোমস্তা, বণিক, দালাল ও পাইকারদের জবরদস্তি ও অত্যাচার বন্ধ করা। প্রথম উদ্দেশ্য আংশিক ভাবে বাস্তবায়ন হলেও দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে নি।

অষ্টাদশ শতকে ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাংলা থেকে রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ:

সারণী

বৎসর	**মোট রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ (টাকায়)**
১৭০০	১৮,৯৬,৯৬৮
১৭০৫	৫,২৭,১৪৪
১৭১০	১৩,৯০,৫৫২
১৭১৫	১২,৯০,৮৭২
১৭২০	২৬,৬২,৩৩৬
১৭২৫	১৫,২৮,৯৩৬
১৭৩০	৩৬,৫২,৬৪৮
১৭৩৫	৩২,০৭,৯০৪
১৭৪০	৩২,০৯,৩০৪
১৭৪৫	৩৫,৯৩,২১৬

১৭৫০	৪০,৮৯,৪১৬
১৭৫৩	৩০,০৩,৫৯২
১৭৫৫	৩২,৯২,০৪০
১৭৫৭	৫,৫৩,৭৫২
১৭৬০	২৯,৩৪,৯৭৬
১৭৬৭	৬০,০০,০০০
১৭৭২	৭৭,৯২,৯০২
১৭৭৫	৮৩,৯৫,৫৩৩
১৭৮০	৯৭,৪০,০৯৭
১৭৮৬	১,১২,৯৪,৬২২
১৭৮৮	৮১,৪৮,২০০
১৭৯০	৮২,৮০,৭১৭
১৭৯৩-৯৪	৯৯,১১,৫৯৮
১৭৯৪-৯৫	১,৪০,২০,৩৮২
১৭৯৫-৯৬	১,১০,৮৪,৪৮৭
১৭৯৭-৯৮	১,৪৫,৯৫,৪৭০
	১,২০,২৩,৯৪৪
	১,৫০,১৯,৬৮৫

কে. এন চৌধুরী ঐ.পৃ: ৫০৯-১০। জে.সি. যিঃ ২ = ইকনমিক এ্যানালস অব বেঙ্গল। পৃ. ১৭১-২৪৩। এন.কে সিংহ ঐ ১ম খন্ড পৃ. ১৮। এ. ত্রিপাটি, ঐ পৃ. ৪৯।

১৭০০-১৭৬০ পর্যন্ত এক পাউন্ড সমান আট টাকা ছি.

১৭৬১-১৭৯৩ পর্যন্ত এক পাউন্ড সমান নয় টাকা ছি.

৬.৩ ব্যক্তিগত বা বেসরকারি ব্যবসাঃ

অষ্টাদশ শতাব্দী ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক ব্যবস্থার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল বেসরকারি ব্যবস্থা। কারণ এ সময় কোম্পানীর কর্মচারীরা বেসরকারি ব্যবসায় এতটাই ব্যস্ত ছিল যে এই সময়কে

বেসরকারি ব্যবসার স্বর্ণযুগ এ কথা অনেকেই বলে থাকেন। কর্ণওয়ালিশ থেকে শুধু বাণিজ্য বিভাগের কর্মচারীরা ব্যক্তিগত ব্যবসার সীমিত অধিকার ভোগ করত।

বাংলায় ইউরোপীয় কোম্পানীগুলির ব্যবসা সরকারি ব্যবসা কোম্পানীগুলির কর্মচারী, লাইসেন্সধারী স্বাধীন বণিক ও লাইসেন্সহীন বেআইনি বণিকদের (Interloper) ব্যবসা একত্রে বেসরকারি ব্যবসা নামে অভিহিত। তাই আমরা বলতে পারি যে, ইউরোপীয় বণিকদের ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবসায়ই বেসরকারি ব্যবসা নামে পরিচিত। ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা নিয়োগপত্রের সঙ্গে ব্যক্তিগত ব্যবসা করার অধিকার লাভ করে।[১৮]

ইউরোপীয়রা ব্যক্তিগত ব্যবসা করে ধনবান হওয়ার উদ্দেশ্যে ভারতে এসেছিল। এসময় শুধু ইউরোপীয় কোম্পানীর কর্মচারীরা নয়, ধর্মযাজক, ডাক্তার ও সৈন্যবাহিনীর অফিসাররা পর্যন্ত এ ব্যবসায়ে যোগ দিত।

আর কিছু বণিক কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার অস্বীকার করে ভারতে ব্যবসা করতে আসত। এরা হল বেআইনি বণিক বা Interloper। প্রাক-পলাশী যুগে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের বেতন খুব কম ছিল। এসময় একজন গভর্ণর বার্ষিক ২৪০ পাউন্ড, একজন কাউন্সিল ৪০ পাউন্ড, একজন ফ্যাক্টর ১৬ পাউন্ড ও একজন রাইটার পেত ৫ পাউন্ড।[১৯]

কোম্পানীর কর্মচারী ও স্বাধীন বণিকরা এদেশীয় বেনিয়ান, গোমস্তা, মুন্সী, ও সরকারদের মাধ্যমে তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসা পরিচালনা করত। বাংলার পুঁজি, ব্যবসায়ী সংগঠন, ব্যবসায়ী বুদ্ধি, শ্রম ও দক্ষতা ইউরোপীয় বণিকদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের প্রধান স্তম্ভ বলা যেতে পারে।

কোম্পানির কর্মচারী ও স্বাধীন বণিকরা এদেশীয় বেনিয়ান, গোমস্তা, মুন্সী ও সরকারদের মাধ্যমে তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসা পরিচালনা করত। এদেশীয়দের পুঁজি, ব্যবসায়ী সংগঠন, ব্যবসায়ী বুদ্ধি, শ্রম ও দক্ষতা ইউরোপীয় বণিকদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের প্রধান স্তম্ভ বলা যেতে পারে। কোম্পানীর নবাগত রাইটারদের কেন্দ্র করে এদেশীয় বেনিয়ান ও গোমস্তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যেত।

---

[১৮] P.J. Marshall, *Problems of Empire : Britain and India 1457-1813*, Cambridge, London, 1963 p. 18.

[১৯] সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *প্রাক-পলাশী বাংলা, সামাজিক ও আর্থিক জীবন*, ১৭০০-১৭৫৭, কলকাতা: কে. পি. বাগচী এন্ড কো:, প্রথম প্রকাশ, ১৯৫৮, পৃ-১৫৮।

এরা একই সংগে ইউরোপীয়দের দোভাষী, দালাল, হিসাবরক্ষক, সেক্রেটারী, পুঁজির যোগানদার ও খাজাঞ্চী হিসেবে কাজ করত।[২০]

বেনিয়ান ও গোমস্তারা এদেশের হালাল গোপন কাজকর্ম ছোট খাট জালিয়াতিতে রপ্ত ছিল। অনেক ক্ষেত্রে, ইউরোপীয়রা শুধু তাদের নামটা ধার দিত এবং এর বিনিময়ে ব্যবসায়ের লাভ পেত। একজন বেনিয়ান একই সময়ে অনেকের হয়ে ব্যবসায়িক কাজকর্ম করত। ইউরোপীয় বণিক ও এদেশীয় বেনিয়ানদের মধ্যে প্রায় এক অবিশ্বাসের মনোভাব দেখা যেত। বেনিয়ান ও গোমস্তা ছাড়াও ইউরোপীয় বণিকরা কোম্পানীর সরকারি বাণিজ্যের মত দাদনী ব্যবসা, দালাল ও পাইকারদের মাধ্যমে উৎপাদকদের কাছ থেকে পণ্য কিনে ব্যবসা করত।

ব্যক্তিগত ব্যবসার ঝুঁকিসমূহ:

ব্যক্তিগত ব্যবসার ক্ষেত্রে কতকগুলি ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হত।

ক. চড়াসুদে তাদের ব্যবসায়ী পুঁজি যোগাড় করতে হত।

খ. ব্যবসা পরিচালনার জন্য এদেশীয় বেনিয়ান ও গোমস্তাদের উপর নির্ভর করতে হত।

গ. বাংলায় ও এশিয়ার দেশগুলিতে রাজনৈতিক অশান্তি ও জবরদস্তি শুল্ক আদায় অনেক সময় ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের ক্ষতির কারণ হত।

এসব ঝুঁকি নিয়েও ইউরোপীয় বণিকরা এদেশে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে আগ্রহী হত কারণ বাংলার ব্যবসায়ে লাভ হত অনেক বেশি। ১৭৭৬-এ এ্যাডাম স্মিথ বাণিজ্যে ৮ থেকে ১০ শতাংশ লাভকে যথেষ্ট বলে মনে করেছিলেন। ১৭৬৭-তে বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে সাধারণভাবে লাভের অংক ২০ থেকে ৩০ শতাংশ দাঁড়িয়েছিল।[২১]

এ সময়ে বাংলার চালের ব্যবসায়ে লাভের পরিমাণ হল ২৫ শতাংশ। ১৭৬৪ তে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে লাভের পরিমাণ ১০০ শতাংশ হবে বলে আশা করা হয়েছিল। তিনটি প্রধান নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য

---

[২০] এন. কে সিংহ, *দি ইকনোমিক হিস্ট্রি অব বেঙ্গল*, কলকাতা, ১৯৫৬-৭০, ১ম খন্ড, পৃ.১০১।

[২১] P.J. Marshall, *Problems of Empire : Britain and India 1457-1813,* Cambridge, London, 1963 p. 49।

লবণ, সুপারি ও তামাকের ব্যবসায়ে ষাটের দশকে লাভের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৫ শতাংশ। ইংরেজ ও ওলন্দাজরা পারস্যের সঙ্গে যে ব্যবসা করত তাতে লাভ হত ৫০ শতাংশ থেকে ৮০ শতাংশ।[২২]

হেস্টিংসের বন্ধু বার ওয়েল ১৭৬৭-তে একখানি চিঠিতে স্বদেশে তাঁর পিতাকে লিখেছেন "সোরার ব্যবসা থেকে তাঁর ৫০,০০০ টাকা আসছে অথচ এক টাকা ও দাদ্ন দিতে হচ্ছে না। কাঠের ব্যবসায়ে ও ঐ একই অবস্থান। শুধু সিল্কের ব্যবসায়ে তাঁকে অগ্রিম দিতে হয়েছিল। এ তিনটি ব্যবসায়ে তিনি সরকারি প্রভাব খাটিয়েছেন এবং অব্যর্থভাবে তাঁর বার্ষিক মোট আয় দাঁড়িয়েছে ২,৫০,০০০ টাকায়।[২৩]

এই বেসরকারি বাণিজ্যকে আবার ৪ ভাগে ভাগ করা যায়।

যেমন : ক. বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে ইউরোপীয় বণিকদের অংশগ্রহণ

খ. আন্তঃপ্রাদেশিক ও উপকূল-ভাগের সঙ্গে বাণিজ্য

গ. এশিয়ার বিভিন্ন দেশের (পশ্চিম, পূর্ব এশিয়া ও সূদুর প্রাচ্যের চীন) সঙ্গে বাণিজ্য ও

ঘ. ইউরোপের সঙ্গে বাণিজ্য

প্রথম তিন শ্রেণীর বাণিজ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীরা নির্ভয়ে অংশগ্রহণ করতে পারতো। ইউরোপের সঙ্গে ব্যবসা চলত সাধারণত মূলবান পাথর, হীরা, জহরত, মনিমুক্তো, ইত্যাদির মাধ্যমে। অন্য দেশের জাহাজে কিছু কিছু পণ্য আমদানি, রপ্তানীও চলত। বাংলার অভ্যন্তরীণ বাজারের বৈশিষ্ট্য নিয়ে বলতে গেলে দেখা যায় যে, প্রাক-পলাশীর যুগে কোম্পানীর কর্মচারীরা বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করত এবং তাদের বেসরকারি বাণিজ্যের জন্যে কোম্পানীর দস্তক ব্যবহার করে এদেশীয় সরকারকে বাণিজ্য শুল্ক ফাঁকি দিত। বাংলার অভ্যন্তরীণ বাজারের অপর বৈশিষ্ট্য হল বাংলার নবাবরা কয়েকটি বিশেষ পণ্য যেমন : লবণ, সুপারি, তামাক, চুন ইত্যাদি কয়েকজন মনোনীত ব্যক্তিকে ইজারা দিয়ে রাজস্ব নিতেন। এগুলো নিত্যপ্রয়োজনীয় বা ব্যবহার্য দ্রব্য বলে এগুলোতে লাভও বেশি হত। ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৭৫৩ খ্রি : থেকে এজেন্ট ও গোমস্তাদের মধ্যে পণ্য ক্রয় করত। ফলে কোম্পানীর সরকারি ব্যবসা ও বেসরকারি ব্যবসা আরও প্রসারিত হয়। ১৭০০ থেকে ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানী তার কর্মচারীদের বিনাশুল্কে ব্যক্তিগত বাণিজ্য করার অধিকার

---

[২২] P.J. Marshall, Ibid, p. 49।

[২৩] এন. কে সিংহ, *দি ইকনোমিক হিস্ট্রি অব বেঙ্গল*, কলকাতা, ১৯৫৬-৭০, ১ম খন্ড, পৃ. ২২৩।

স্বীকার করে নিয়েছিল। তবে ১৭৬২ খ্রি: পর্যন্ত কোম্পানীর কর্মচারীদের বিনাশুল্কে বাণিজ্য ছিল গোপন ব্যবসা কিন্তু নবাব মীর কাশিমের সময় থেকে এ ব্যবসা প্রকাশে ও ব্যাপকরূপে দেখা দেয়।

বেসরকারি ব্যবসার প্রতিক্রিয়া:

ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলার দেশীয় বাণিজ্য বিশেষ করে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি কুক্ষিগত করার চেষ্টা করে। তাদের এ প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত বাংলার নবাবের অধিকার ও এখতিয়ারের উপর আঘাতস্বরূপ হয়ে দেখা দেয়। এ সম্পর্কে ১৭৬২ খ্রিষ্টাব্দে মীর কাশিম ইংরেজ গভর্ণর ভ্যান্সিটার্টকে বলেন— এই হল আপনার ভদ্রলোকের ব্যবহার। আমার দেশের সর্বত্র তারা উপদ্রব করে, জনগণকে লুন্ঠন করে আর আমার কর্মচারীদের অপমান ও জখম করে প্রত্যেক পরগণা, গ্রাম ফ্যাক্টরিতে তারা লবণ, সুপারি, ঘি, চাল, খড়, বাঁশ, মাছ, চট, আদা, চিনি, তামাক, আফিম এবং অন্যান্য অনেক জিনিস বেচাকেনা করে। আমি আরো অনেক বস্তুর নাম করতে পারি, অপ্রয়োজনবোধে বিরত হলাম। তারা বলপ্রয়োগে কৃষক ও বণিকের বিভিন্ন পণ্য এক চতুর্থাংশ দামে ছিনিয়ে নেয়; আবার জবরদস্তি ও অত্যাচারের মাধ্যমে এক টাকার জিনিসের জন্য কৃষককে পাঁচ টাকা দিতে বাধ্য করে। আবার পাঁচটি টাকার জন্য তারা এমন একজন লোককে অপমান ও আটক করে যে একশ টাকা ভূমি রাজস্ব দেয়। তারা আমার কর্মচারীদের কোন রকম কর্তৃত্ব করতে দেয় না। প্রতি জেলাতে আমার কর্মচারীরা সমস্ত রকম কাজকর্ম থেকে বিরত আছে, সমস্ত শুল্ক থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে আমার বার্ষিক মোট রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে পঁচিশ লাখ টাকা।[২৪]

মীরকাশিমের অভিযোগ থেকে আরো জানা যায় ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা সারা বাংলাদেশে ব্যক্তিগত ব্যবসার জন্যে চারশ থেকে পাঁচশ ফ্যাক্টরি বানিয়েছিল। নবাব ৯ শতাংশ হারে বাণিজ্য শুল্কের বিনিময়ে কোম্পানীর কর্মচারীকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যাধিকার দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কোম্পানীর কর্মচারীরা শুধু লবনের উপর $২\frac{১}{২}$ শতাংশ বাণিজ্য শুল্ক ছাড়া আর কোনো পণ্যের উপর

---

[২৪] Romesh Chunder Dutt, The Economic History of India Volume 1, The University of Michigan, 16 December, 2012, p. 23.

শুল্ক দিতে রাজি হলনা। নবাব বিরক্ত হয়ে দুবছরের জন্য বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য শুল্ক মুক্ত বলে ঘোষণা করছেন।[২৫]

এই সুবিধাভোগী ইংরেজ বণিকরা মীর কাশিমকে তাদের বেসরকারি বাণিজ্য স্বার্থের সবচেয়ে বড় শত্রু ধরে নিয়ে গভর্ণর ভ্যান্সিটার্টকে নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় বাধ্য করল। এ সময়ে ইংরেজ বণিকদের আচরণ সম্পর্কে জেমস্ মিলের অসাধারণ উক্তিটি স্মরণ করা যেতে পারে —— "স্বার্থ মানুষের সমস্তরকম বিচারবোধ এমনকি লজ্জাবোধও কেমন করে নষ্ট করে দেয় তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল এসময়ে কোম্পানীর কর্মচারীদের আচরণ।"

ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের সমস্ত অঞ্চলের সঙ্গে বালেশ্বর, মাদ্রাজ, পণ্ডিচেরি, রাজমুন্দ্রি, নেগাপতম, বিলাখাপতম, কালিকট, কোতিম মাহে, সুরাট, বোম্বে, গোয়া প্রভৃতি—— বাণিজ্য করত। স্থলপথে আগ্রা, দিল্লী, মির্জাপুর, বারাণসী, অযোধ্যা, নাগপুর, হায়দ্রাবাদ, আসাম, তিব্বত, নেপাল ও ভুটানের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্কে প্রতিষ্ঠা করেছিল। চন্দন নগরে শেভালিয়র তুলা, চুন, তামাক, সোনার সুতো, মূগাধুতী, শাঁখ, হাতির দাঁত প্রভৃতি পণ্যে ব্যবসা করতেন। কোম্পানীর কর্মচারীরা বাংলা থেকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠাত লবণ, চিনি, চাল, চট, আশা, হলুদ, তামাক, সুপারি, রেশম, মস্‌লিন ও সূতীবস্ত্র।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জল ও স্থলপথে বাংলায় আনত তুলা, নীল, আফিম, কাঠ লংকা, মশলা ও লবণ। নীল, আফিম ও উপকূল বাণিজ্যে বেসরকারি ব্যবসায়ে বেশ লাভ হত। শতাব্দীর শেষ দুই দশকে কোম্পানীর কর্মচারীরা কলকাতার এজেন্সি হাউসগুলোতে টাকা লগ্নি করে লভাংশ পেত আর বৃটিশ স্বাধীন বণিকরা বেসরকারি ব্যবসা পরিচালনা করত।

৬.৪ আর্থিক নিষ্ক্রমণ (Economic Drain):

পলাশীর পর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে সম্পদের বর্হিগমন বা নিষ্ক্রমনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। বাংলার থেকে নিয়মিতভাবে এই সম্পদ চলে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে 'আর্থিক নিষ্ক্রমণ' (Economic drain) বলে। ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের মধ্যে হ্যারি ভেরেলস্ট, ফিলিপ ফ্রান্সিস, ওয়ারেন হেস্টিংস, জনলোর, জেমস্ গ্রান্ড এবং এ সময় কার ইংল্যান্ডের প্রখ্যাত বাগ্মী ও দার্শনিক

---

[২৫] Romesh Chunder Dutt, Ibid, p. 30

এডমন্ড বার্ক বিভিন্ন সময়ে বাংলা থেকে অর্থ নিষ্ক্রমণ এবং এর তাৎপর্য নিয়ে বিভিন্ন মতামত পোষণ করেছেন।

ভেরেলস্ট লিখেছেন ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে চীনদেশে কোম্পানীর বাণিজ্যের জন্যে বাংলা থেকে সোনা ও রূপো রপ্তানি শুরু হয়।[২৬]

ষাটের দশকে এর বার্ষিক পরিমাণ হল চব্বিশ লাখ টাকা; সত্তরের দশকে কুড়ি লাখ টাকা। ফিলিপ ফ্রান্সেস মন্তব্য করেছেন— 'কোম্পানির কর্মচারীদের উদ্দেশ্য হল দ্রুত সম্পদ আহরণ করা এবং সেই সম্পদ দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া। এভাবে সম্পদ আহরণের ফলে এদেশের সম্পত্তির উপরে স্বল্পকালীন চাপ সৃষ্টি হয় এবং এগুলি ভগ্নদশাগ্রস্ত ও নি:শেষিত বলে মনে হয়।

সুরেজ বাণিজ্যের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে ফ্রান্সিস আরো জানিয়েছেন বাংলা থেকে জাহাজের ক্যাপ্টেন ও অফিসাররা পণ্য নিয়ে যায় না কারণ এখন বাংলায় জিনিসের দাম বেশি অথচ পণ্যের দাম নিম্নমুখী। এজন্য তারা বাংলা থেকে সোনা ও রূপো নিয়ে যায় এবং তাঁর হিসাবমত এর পরিমাণ বার্ষিক বারো লাখ টাকার কম নয়।

১৭৮৯ এর প্রতিবেদনে জন শোর লিখেছেন— অনেকে ব্যক্তিগতভাবে ইউরোপে রূপো চালান করে। এর পরিমাণ নির্ধারণ করা যায় না। তবে কোম্পানীর দেওয়ানি লাভের পর থেকে এর পরিমাণ যথেষ্ট বলা যায়। মোট কথা আমার বলতে অসুবিধা নেই যে কোম্পানী দেওয়ানি লাভের পর থেকে দেশের প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণ অনেক কমে গেছে। আগের দিনে বিভিন্ন পথে আমদানির মাধ্যমে এ শূন্যতা পূরণ করা হত। সে পথগুলি এখন প্রায় বন্ধ। চীন, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে টাকার যোগান এবং ইউরোপীয়দের ইংল্যান্ডে টাকা পাঠানোর ফলে ভবিষ্যতে এদেশ থেকে রুপোর নিষ্ক্রমণ চলতে থাকবে।

জন শোর তাঁর মিনিটে আরো জানিয়েছেন বিদেশী কোম্পানীগুলি বাংলাদেশে আর সোনা রুপো আনে না বা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ থেকে যথেষ্ট পরিমাণে সোনা রুপোর বাংলাদেশে আসে না। তার ফলেই রুপোর দুষ্প্রাপ্যতা ও মুদ্রা সংকট দেখা দেয়। সি.জে হ্যামিলটনের মতে বাংলা থেকে রপ্তানি করা সোনা রুপোর বেশির ভাগ যেত চীন দেশে; ইংল্যান্ডে নয়। ইংল্যান্ডে যে সম্পদ যেত তার মাধ্যম হল পণ্য সম্ভার; সোনা রুপো নয়। তাঁর এ মন্তব্যের মধ্যে সত্য আছে কারণ সিলেক্ট কমিটির

---

[২৬] এন. কে সিংহ, *দি ইকনোমিক হিস্ট্রি অব বেঙ্গল*, কলকাতা, ১৯৫৬-৭০, ১ম খন্ড, পৃ. ২৩৩।

১৭৭২-৭৩ ও ১৭৮২-৮৩-র প্রতিবেদনে সোনা রূপোর মাধ্যমে আর্থিক নিষ্ক্রমণের কথা উল্লেখ করা হয়নি। শেষোক্ত রিপোর্টে রপ্তানি পণ্যের মাধ্যমে আর্থিক নিষ্ক্রমণ হয়েছে বলে উল্লেখ আছে। তাছাড়া এসময় বাংলার বাজারে সোনা রুপোর দাম ইংল্যান্ডের বাজার দরের তুলনায় বেশি। আর্থিক রীতি অনুযায়ী চড়া বাজার থেকে মন্দা বাজারে পণ্য রপ্তানি স্বাভাবিক ভাবে হয় না।

বাংলায় ইউরোপীয় স্বাধীন বণিকরা বাংলার আর্থিক সম্পদের নিষ্ক্রমণের অংশীদার হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে কোম্পানীর কর্মচারী জন বেবের (John Babb) মন্তব্য বেশ তাৎপর্যপূর্ণ : সুদূর এক দেশের অধীন থেকে এদেশে প্রতিনিয়ত ও অনিবার্যভাবে আর্থিক নিষ্ক্রমণ ঘটছে; এই লোকগুলি (ইউরোপীয় স্বাধীন বণিক) নিষ্ক্রমণের পরিমাণ বাড়াচ্ছে। এদের কেউই বাংলায় সংগঠন চায় না। যে মুহূর্তে তাদের সম্পদ অর্জিত হয় তারা দেশে পাঠায় এবং সেই পরিমাণে নিষ্ক্রমণ চলতে থাকে। বাংলায় থেকে তারা যা আয় করে তার বিনিময়ে বাংলায় কোন সাহায্য, কোনো অনুদান তারা রাখে না। যদি একজন বাঙ্গালী বা আর্মেনীয় বণিক তাদের মত বিশাল সম্পত্তি অর্জন করে তাহলে সে বা তার পুত্ররা সংগঠন আরো বাড়িয়ে তোলে এবং এদেশের সম্পদ এদেশের উন্নতিতে ব্যবহৃত হয়।[২৭]

এডমন্ড বার্ক ১৭৮৩-র সিলেক্ট কমিটির নবম রিপোর্টটি রচনাকালে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীও তার কর্মচারীদের কাজকর্ম সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য করে বলেছেন কোম্পানীও তার কর্মচারীরা বাংলাকে লুন্ঠন করে ধ্বংস করেছে। ঐ প্রতিবেদনে বার্ষিক লুণ্ঠনের (annual plunder) এর কথাও উল্লেখ করতে ভোলেননি।[২৮]

পার্সিভাল স্পীয়ার (Percival Spear) তাঁর A Modern History গ্রন্থে, বেসরকারি বণিজ্যদের আর্থিক লোভ (Private financial greed) এবং কোম্পানীর সরকারি নীতি (Public policy) বাংলার ধ্বংসের কারণ বলে উল্লেখ করেছে।[২৯]

সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, বাংলা থেকে আর্থিক নিস্ক্রমণ দু'টি প্রধান ধারায় হয়েছে বলে ধরা যায়—

ক. বেসরকারি বণিকদের ব্যবসায় এবং

খ. কোম্পানীর অনুসৃত বাণিজ্য ও অর্থনীতি

---

[২৭] এন. কে সিংহ, *দি ইকনোমিক হিস্ট্রি অব বেঙ্গল*, কলকাতা, ১৯৫৬-৭০, ১ম খন্ড, পৃ. ২২৬।

[২৮] P.J. Marshall, *Problems of Empire : Britain and India 1457-1813*, Cambridge, London, 1963 p. 261।

[২৯] Percival Spear, *The Nabobs: A study of the Social life the English in Eighteenth Century*, India, Oxford University Press, May 7, 1998, p. 197-198.

এই বেসরকারি বণিকদের মাধ্যমে যে আর্থিক নিষ্ক্রমণ হয়েছে তাকে চারভাবে আলোচনা করা যায়।

ক. হীরা, জহরত, মনিমুক্ত, কিনে ইউরোপে পাঠানো

খ. ইউরোপ ও ইংল্যান্ডে বাংলার রপ্তানি পণ্য সোনা রূপো পাঠানো

গ. ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর উপর বিল অব এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে

ঘ. অন্যান্য বিদেশী কোম্পানীর ফরাসি, ওলন্দাজ, দিনেমার প্রভৃতি বিল কিনে।

ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা বাংলার নানা উপায়ে প্রচুর অর্থোপার্জন করেছিল।

অর্থনৈতিক নিষ্ক্রমণের প্রভাবঃ

আর্থিক নিষ্ক্রমণ বাংলার অর্থনৈতিক জীবনের উপর নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। যেমন : বাংলার মুদ্রা সংকট। বাংলার সিক্কা টাকা প্রতিনিয়ত দেশের বাইরে চালান যাওয়াতে দেশের বাজারে মুদ্রার সরবরাহ কমে যেত। ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ও অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানীগুলির রপ্তানি বাণিজ্যের মূলধন বাংলা থেকে আনায়ন করত বলে তারা আর বাংলায় সোনা রূপা নিয়ে আসতনা। আর এজন্য বাংলায় মুদ্রার সরবরাহ কমে যায়। অবশেষে ওয়ারেন হেস্টিংস ও কর্ণওয়ালিশকে মুদ্রা নীতির পরিবর্তন ও সংস্কারের জন্য প্রয়াস চালাতে হয়। এই আর্থিক নিষ্ক্রমণের দরুণ কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যিক কাজকর্মে আশানুরূপ বাড়েনি। কোম্পানীর নিজস্ব একচেটিয়া ব্যবসা, কোম্পানীর কর্মচারীদের একচেটিয়া ব্যবসায়ের ঝোঁক, উৎপাদকদের উপর উৎপীড়ন, দালাল, পাইকার ও গোমস্তাদের অতিমুনাফার ঝোঁক বাংলার বাজারের স্বাধীনতা নষ্ট করেছিল। জেনস স্টুয়ার্টের মতে— বাংলা থেকে রপ্তানি বাণিজ্যের ফলে এদেশ ধনশালী হয়নি।[৩০]

সঠিক তত্ত্বাবধানের অভাবে এ সময়ে বাংলার লোকসংখ্যা, মোট উৎপাদন, আয়-ব্যয় ও মোট বাণিজ্যের পরিমাণ সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায়নি। বাংলা থেকে বছরে আর্থিক নিষ্ক্রমণের ফলে অর্থনীতির কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কি ধরনের প্রভাব বিস্তার করেছে তার সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব হয়নি।

ব্রুকস এ্যাডামস্ যাকে ব্রিটিশ সাম্রাজের কঠোর সমালোচক বলা হয়, তিনি মন্তব্য করেছেন — বৃটিশ জাতি ভারত থেকে অর্থ সংগ্রহ করে নিজেদের দেশে শিল্প বিপ্লব ঘটিয়েছিল। ভারতের এই আর্থিক শোষণ পলাশী থেকে শুরু হয়েছিল বলে তিনি অষ্টাদশ শতকের এই শোষণ পর্বকে ‘Plassey plunder’ বলে অভিহিত করা হয়।

---

[৩০] J.C. Sinha, *The Dacca Muslin Industry*, The modern review, Vol. XXXVII, No. 4, 1925, P. 54.

পরবর্তীকালে এডামসের এই স্বল্প তথ্য সম্বলিত জোরালোহীন মন্তব্যকে জাতীয়তাবাদী ইতিহাসবিদ্‌রা বৃটিশ সাম্রাজ্যের আর্থিক বনিয়াদের উপর আঘাত বলেছেন।

কার্ল মার্কস আর্থিক নিষ্ক্রমণ নিয়ে বলেছেন ভারত থেকে নিষ্ক্রান্ত সম্পদ ইংল্যান্ডে গিয়ে পুঁজিতে রূপান্তরিত হয়েছে।[৩১]

এ মন্তব্য আংশিকভাবে সত্য। এ দেশে থেকে নিষ্ক্রান্ত অর্থ ইংল্যাণ্ডের বণিক, কর্মচারী, জাহাজ ব্যবসায়ী, শেয়ার মালিকদের বাড়তি অর্থ এনে দেয়। তারা এ অর্থ আবার ব্যবসায়ে লগ্নী করে।

৬.৫ সমালোচনা

ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক বিনিয়োগ ও প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করলে আরো কিছু বিষয় প্রসঙ্গক্রমে চলে আসে। যেমন: (১) ইংল্যান্ডের ছাপা ও সাদা সুতীবস্ত্রের উপর ক্রমবর্ধমান সংরক্ষণমূলক আমদানি শুল্কের চাপ; (২) ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবের পর বাংলার মাঝারি ও মোটা বস্ত্র আমদানি বন্ধ হয়ে যায়; (৩) শিল্প বিপ্লবের আগেই বাংলার বয়ন শিল্পের উপর আঘাত শুরু হয়েছিল। কোম্পানী ও তার কর্মচারীদের একচেটিয়া বা আধা-একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ বাংলার বয়নশিল্পের অনেকখানি ক্ষতি করেছিল। কর্ণওয়ালিশ যখন এই ক্ষতিকর নিয়ন্ত্রণ থেকে বাংলার বয়নশিল্পকে বাঁচাবার ব্যবস্থা করলেন ঠিক তখনই শিল্প বিপ্লবের ধাক্কায় বাংলার জাতীয় শিল্পের সর্বনাশ হল। (৪) বিপ্লবী ফ্রান্স ও নেপোলিয়নের সঙ্গে ইংল্যান্ডের দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ (১৭৯০-১৮১৫) বাংলার বস্ত্রশিল্পের ক্ষতির কারণ হয়েছিল। এই যুদ্ধের ফলে দীর্ঘকাল ইউরোপের বাজারে বাংলার বস্ত্র বিক্রি করা সম্ভব হয়নি। বাংলার বয়নশিল্পের অবক্ষয় এদেশের আর্থিক জীবনের উপর গভীর প্রভাব রেখে যায়। প্রথমত, বাংলার মানুষের শিল্প-মুখী মানসিকতা (industrial spirit of the people) নষ্ট হয় এবং পরবর্তী প্রজন্মে উৎকট শিল্পবিমুখতা বাঙালীকে গ্রাস করে। দ্বিতীয়ত, বয়নশিল্পের পতনের পর বাংলার বস্ত্রশিল্পী, কারিগর ও সুতো মজুররা জমির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে জমির উপর অস্বাভাবিক চাপ বৃদ্ধি বয়নশিল্পের পতনকে দ্রুততর করে। কৃষি ও শিল্পের উপর নির্ভরশীল বাংলার মানুষ শুধু কৃষিনির্ভর হয়ে পড়ে।

পলাশী-উত্তরকালে বাংলা থেকে উদ্বৃত্ত উৎপাদনের একাংশ দেশের বাইরে চলে যায়। এজন্যে বাংলায় নতুন পুঁজির গঠন ও বিনিয়োগে অসুবিধা দেখা দেয়। পলাশী পরবর্তীকালে (১৭৫৭-১৭৭২) যে-

---

[৩১] এন. কে সিংহ, *দি ইকনোমিক হিস্ট্রি অব বেঙ্গল*, কলকাতা, ১৯৫৬-৭০, ১ম খন্ড, পৃ. ২৩৭।

অরাজকতা বাংলায় চলেছিল তার ফলে নতুন পুঁজি গড়ে উঠেনি। যেটুকু পুঁজি বাংলার বণিক ও মহাজনদের হাতে ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর সেটুকু জমিতে লগ্নী করা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলার নব্য ধনীরা তাদের পুঁজি কলকাতায় জমি ও বাড়ি, মফঃস্বলে জমিদারি ও মহাজনী কারবারে নিয়োগ করেছিল। বাংলার পুঁজিপতিরা শিল্প ও বাণিজ্য থেকে পিছিয়ে এসে নিরাপদ বিনিয়োগের ক্ষেত্র খুঁজে পেলেন জমিদারি, বাড়ি, জমি, মুদ্রা ও সুদের কারবারে। সম্ভবত বাংলার বাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্রে তাদের গত চার দশকের অভিজ্ঞতা তাদের এমন দুর্ভাগ্যজনক মানসিকতা সৃষ্টিতে সহায়তা করেছিল।

পলাশী-পরবর্তীকালে বাংলার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য ইউরোপীয়দের হাতে চলে যায়। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে এদেশীয়রা ইউরোপীয়দের সহযোগী বেনিয়ান, গোমস্তা, সরকার হিসেবে টিকে ছিল ঠিকই তবে তাদের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ন হয়। এ যুগে ইউরোপীয়দের বেসরকারি ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের মূলধনের একাংশ সংগঠন ও অভিজ্ঞতা এদেশীয়রা সরবরাহ করত। তবে কতগুলি পণ্যে কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার (লবণ, আফিম, সোরা) এবং অন্যান্য পণ্যে কোম্পানীর কর্মচারীদের বিনাশুল্কের ব্যক্তিগত সুবিধাজনক ব্যবসা এদেশীয় বণিক সমাজের ক্ষতিসাধন করেছিল। অসম প্রতিযোগিতার জন্যে এদেশীয় বণিকরা ব্যবসায় হাল ছেড়ে দিয়েছিলো অথবা ইউরোপীয়দের সহযোগী হিসেবে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে টিকে ছিল। বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রায় সবটাই ইউরোপীয়দের হাতে চলে যায়। ইউরোপীয়রা নিজেদের বাণিজ্যিক প্রয়োজনে শতাব্দীর শেষে তিনটি ব্যাঙ্ক, চারটি বীমা কোম্পানী, ও পনেরোটি এজেন্সি হাউস স্থাপন করেছিলেন। এদেশীয়দের মূলধন, সংগঠন ও আর্থিক প্রতিবিধানগুলির সাহায্য আর তাদের প্রয়োজন হত না। বাঙালী ও অবাঙালী বণিকরা যারা বাংলায় এতকাল এগুলি সরবরাহ করত তাদের বিদায় লগ্ন আসন্ন হয়ে উঠে।

১৭৯৭-৯৮তে জমিদারির দাম দাঁড়ায় ভূমি রাজস্বের ৯$\frac{১}{২}$ গুণ। এ সময় থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও সুদের হার নামতে থাকায় জমিদারির দাম বাড়তে শুরু করে। গ্রামবাংলায় জমিদার-কৃষকের সম্পর্কে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছিল। সরকারি রাজস্ব আদায়ে কড়াকড়ি জমিদার-রায়তের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হয়। ১৭৯৯-এর ৭নং রেগুলেশেনে জমিদারের হাতে বাকী খাজনার দায়ে রায়তের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করার অধিকার দেওয়া হয়। কর্ণওয়ালিশের নতুন বিচারবিধি জমিদার-কৃষকের সম্পর্ককে আদালতে নিয়ে হাজির করে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৃটিশ বিচার ব্যবস্থার সুফল বাংলার কৃষকের জীবনে লক্ষ্য করা যায় না। আগের দিনে যে জমিদার ছিল দন্ডমুন্ডের

কর্তা কর্ণওয়ালিশের নতুন ভূমি বন্দোবস্তে সে হল শুধু কর সংগ্রাহক। জমিদারির উন্নয়মূলক কার্যক্রম, যেমন—বাঁধ দেওয়া, জনসেচের ব্যবস্থা করা জঙ্গল কেটে চাষ বাড়ানো, রাস্তাঘাট, পাঠশালা/টোল, কলেজ, হাসপাতাল স্থাপন ইত্যাদি— খুব কম জমিদারই আগ্রহ দেখিয়েছিল। অনার্জিত আয়ে শহুরে জীবন কাটানো এদের শ্রেণী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলার কৃষির আশানুরূপ উন্নতি ঘটেনি ও সেই সূত্র ধরে ধনসঞ্চয় বা ব্যবসা বাণিজ্য বাড়েনি। 'দায়ভাগ' ব্যবস্থায় ভূসম্পত্তি বন্টনের সুব্যবস্থা থাকায় বাংলাদেশে জমির অতি খন্ডীকরণ (maximum fragmentation) পর্ব শুরু হয়ে যায় যা বাংলার কৃষির পক্ষে অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ তিন দশকে বাংলার অর্থনীতি ক্রমশ ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে (colonial economy) রূপান্তরিত হতে শুরু করে। ইংল্যান্ডের জাতীয় অর্থনীতির স্বার্থে বাংলার অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তন শুরু হয়। দেওয়ানি থেকে বাংলার রপ্তানি পণ্যে ইংল্যান্ডের সরকার ও ডিরেক্টর সভা রাজস্ব নিতে (tribute) শুরু করে দেয়। ইংল্যান্ডের অর্থনীতির স্বার্থে এদেশ থেকে একে একে রেশমবস্ত্র, সুতো, মাঝারি ও মোটা কাপড় রপ্তানি বন্ধ হয়। আবার ইংল্যাণ্ডের বস্ত্রশিল্পের প্রয়োজনে এদেশ থেকে নীল ও তুলো রপ্তানি শুরু করা হয়। তেমনি পাট, শণ, তৈলবীজ প্রভৃতি ইংল্যাণ্ডের শিল্পে ব্যবহার করার জন্য চেষ্টা চলতে থাকে। অর্থাৎ এদেশের উৎপন্ন শিল্প পণ্যের রপ্তানি কমিয়ে বা একেবারে বন্ধ করে এদেশ থেকে ইংল্যাণ্ডের শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহের পর্ব শুরু হয়ে যায়। বাংলার কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ এরই ফলশ্রুতি। বাংলার কৃষকরা খাদ্যশস্য উৎপাদন কমিয়ে বাজারে চাহিদা অনুযায়ী নতুন নতুন কৃষিপণ্য উৎপাদনে আগ্রহী হয়। এগুলি হল তৈলবীজ, পাট, শণ, বাদাম, আখ, তামাক, আফিম, নীল, তুলা প্রভৃতি।

ঔপনিবেশিক অর্থনীতির অপর বৈশিষ্ট্য সাম্রাজ্যবাদী দেশের পণ্য উপনিবেশের নিরাপদ ও একচেটিয়া বাজারে এনে বিক্রি করা অবশ্য এযুগে শুরু হয়নি। তবে ম্যানচেষ্টারে বস্ত্রশিল্পে প্রস্তুত মস্‌লিন ও অন্যান্য কাপড় পরীক্ষামূলকভাবে বাংলার বাজারে পাঠানো হয়েছিল। ঔপনিবেশিক অর্থনীতির অপর বৈশিষ্ট্য— কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগ— এ পর্বে নিঃসন্দেহে দেখা গিয়েছিল। রেশম উৎপাদন, আখের চাষ, চিনি শিল্প ও নীলের চাষে বিদেশী পুঁজি লগ্নী করা শুরু হয়। জাহাজ তৈরি ও পরিবহন বিদেশীদের একচেটিয়া কারবার হয়ে দাঁড়ায়। এসব ক্ষেত্রে ইউরোপীয় প্রযুক্তি ও কৌশলের ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার অর্থনৈতিক জীবনের অপর উল্লেখযোগ্য দিক হল ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসা ও কোম্পানীর কর্মচারী ও স্বাধীন বণিকদের বাণিজ্য স্বার্থের মধ্যে সমঝোতা ও আপস। কোম্পানী কতকগুলি পণ্যে— সোরা, আফিম ও লবণ— একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করেছিল। তাছাড়া ইউরোপীয় বাণিজ্য ছিল কোম্পানীর একচেটিয়া। অপরদিকে সিল্ক, চিনি ও নীলে বৃটিশ পুঁজি ক্রমশ কার্যকরী ভূমিকা নিতে শুরু করে। কিছুকালের জন্যে চুন ও সুপারির ব্যবসা এদের হস্তগত হয়। বাংলায় এশীয় বাণিজ্য, এদের হাতে চলে যায়। সারা শতকে কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য স্বার্থ ও বৃটিশ বণিকদের বাণিজ্যস্বার্থের মধ্যে সংঘাত ছিল তবে এ দুটি বাণিজ্যস্বার্থের মধ্যে দ্বন্দ্ব বা সংঘাত কখনো মারাত্মক রূপ নেয়নি। ১৭৯৩-এর চার্টার এ্যাক্টে বৃটিশ বণিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে বৃটিশ ও ইউরোপীয় বাণিজ্যের দুয়ার সীমিতভাবে তাদের জন্যে খুলে দেওয়া হয়। কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার ও বৃটিশ বণিকদের স্বাধীন বাণিজ্যের দাবী নিয়ে দ্বন্দ্ব শেষ হল ১৮১৩ সনে যখন কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকারের অবলুপ্তি ঘটে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে সরকারি ও বেসরকারি খাতে ইউরোপীয় বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে বাংলার শিল্প ও কৃষি পণ্যের চাহিদা বাড়ে। এজন্যে বাংলার শিল্প ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। কৃষিতে নতুন পণ্য উৎপাদন শুরু হয়। বাংলার অর্থনীতির এ দুই শাখায় অনেক লোকের কর্মসংস্থান হয়েছিল এরকম অনুমান করাও অসঙ্গত নয়। তবে যে অগ্রিম বা দাদন পদ্ধতিতে ইউরোপীয়দের অধীনে এদেশে কৃষি ও শিল্প উৎপাদন হত তাতে এদেশীয়রা খুব বেশি লাভবান হয়নি। এদেশে বহুকাল যাবৎ প্রচলিত দাদনী ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে ইউরোপীয়রা এদেশের উৎপাদকদের নানাভাবে ঠকাত। তাই বাংলা পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেলেও বাংলার উৎপাদকরা বাড়তি পারিশ্রমিক পায়নি। বাংলার তাঁতি, রেশম কারিগর ও লবণ শ্রমিক মালঙ্গিদের জীবনযাত্রার মানে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন চোখে পড়ে না। ইউরোপীয়রা এদেশীয় উৎপাদক ও শ্রমিকদের ঠকাত ঠিকই তবে এদেশের শ্রমিক শ্রেণীর মানসিকতা ও শ্রমবিমুখতা তাদের দারিদ্র্য ও দুর্দশার জন্যে অনেকখানি দায়ী ছিল বলে অনুমান করা যায়। ১৮০২-এ তমলুকের সল্ট এজেন্ট এদেশের সমস্ত শ্রেণীর শ্রমিক সম্পর্কে প্রযোজ্য হতে পারে। 'যদি একজন শ্রমিক তার এবং তার পরিবারের জীবিকার প্রয়োজনীয় অর্থ মাসে মাসে বা এমনকি দিনে দিনে রোজগার করতে পারে তাহলে সে সন্তুষ্ট। যদি তার একমাসের রোজগারে দু মাস চলে তাহলে সে অধিক পরিশ্রম করে স্থায়ী সম্পদ অর্জন করার পরিবর্তে সাধারণত আলস্যে সময় কাটায় যতক্ষণ না তার প্রয়োজন আবার তাকে জীবিকার্জনে বাধ্য করে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোম্পানীর কর্মচারীদের বেসরকারি ব্যবসার স্বর্ণযুগ। শতাব্দীর শুরু থেকে কর্ণওয়ালিশ পর্যন্ত কর্মচারীরা ব্যক্তিগত ব্যবসার অধিকার পেয়েছিল। কর্ণওয়ালিশ থেকে শুধু বাণিজ্য বিভাগের কর্মচারীরা ব্যক্তিগত ব্যবসার সীমিত অধিকার ভোগ করত। মুঘল সম্রাট ও বাংলার নবাবরা কোম্পানীকে যে বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধাগুলো দিয়েছিলেন কোম্পানী কর্মচারীরা তা ভোগ করত। শতাব্দীর শুরু থেকে মীরকাশিমের সময় পর্যন্ত বাংলার নবাবরা কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসাকে ভাল চোখে দেখেনি। বিনাশুল্কে বাণিজ্য ও বাণিজ্যিক অধিকারগুলি এদেশীয়দের হস্তান্তর করার বিরুদ্ধে তারা আপত্তি জানিয়েছিলেন। কর্মচারীদের অবৈধ ও বিনাশুল্কের বাণিজ্য নবাব ও কোম্পানীর মধ্যে অনেক বিরোধের কারণ। পলাশীর যুদ্ধ ও মীরকাশিমের সঙ্গে সংঘর্ষের পশ্চাতে কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা ও অতি মুনাফার ঝোঁক একটি শক্তিশালী কারণ হিসেবে দেখা গিয়েছিল। দেওয়ানি থেকে ওয়ারেন হেস্টিংস পর্যন্ত কোম্পানীর কর্মচারীদের উৎকোচ, উপঢৌকন, পারিতোষিক ও ব্যবসা থেকে লাভের পরিমাণ বিশাল। এদেশের অভ্যন্তরীণ (চাল, মোটা কাপড় ও তামাক ছাড়া), উপকূল ও এশীয় বাণিজ্য এদেশের একচেটিয়া ব্যবসায়ে লাভের অধিকাংশই দেশে পাঠানো হয়েছিল।

হ্যারি ভেরেলস্ট, ফিলিপ ফ্রান্সিস ও এডম্যান্ড বার্ক থেকে আধুনিককালে হোল্ডেন ফারবার ও পি. জে. মার্শাল পর্যন্ত দু'শ বছরের অধিককাল ধরে আর্থিক নিষ্ক্রমণের উৎপত্তি, প্রকৃতি, পরিমাপ ও বাংলা তথা ভারতের অর্থনীতিতে এর প্রভাব নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত রয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোম্পানীর কর্মচারীদের অনেকে এবং ইংল্যান্ডে বুদ্ধিজীবীদের একাংশ ক্রমাগত আর্থিক নিষ্ক্রমণকে বাংলার আর্থিক দুর্দশার কারণ বলে মনে করেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবীরা আর্থিক নিষ্ক্রমণকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে থাকেন। এ শতাব্দীতে আর্থিক নিষ্ক্রমণের উৎপত্তি, পরিমাণ বা পরিমাপ পদ্ধতি নিয়ে বিতর্ক অনেকখানি স্তিমিত। এখন এ বিষয়ে মূল প্রশ্নটি হল এই আর্থিক নিষ্ক্রমণের পরিবর্তে বাংলা বা ভারত সত্যিই কিছু লাভ করেছিল কিনা। যদি বাংলা এর পরিবর্তে অদৃশ্য সেবা বা আমদানি ভোগ করে থাকে তাহলে আর্থিক নিষ্ক্রমণকে আদৌ এ নামে আখ্যায়িত করা ঠিক হবে কিনা সেটাই এখন মূল প্রশ্ন। এ শতাব্দীতে থিয়োডর মরিসন থেকে পি. জে. মার্শাল পর্যন্ত সকলেই আর্থিক নিষ্ক্রমণের এই বৈশিষ্ট্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এদের যুক্তি হল বাংলা থেকে প্রতিবছর যেমন বেশি কিছু টাকা বা সম্পদ দেশের বাইরে চলে গেছে তেমনি এর বিনিময়ে বাংলা পেয়েছে: (১) বর্ধিত বৈদেশিক

বাণিজ্য, (২) বর্ধিত উৎপাদন ও বর্ধিত কর্মসংস্থান, (৩) উন্নত প্রশাসন ও সেনাবাহিনী, (৪) উন্নত ধরনের আর্থিক সংস্থা সমূহ— ব্যাঙ্কিং, বীমা, এজেন্সি হাউস ইত্যাদি, (৫) জাহাজ নির্মাণ, জাহাজ পরিবহন, চিনি ও রেশম শিল্পে উন্নত ইউরোপীয় প্রযুক্তি জ্ঞানের প্রয়োগ, (৬) সরকারি ও বেসরকারি খাতে ব্যবসায়ের লভ্যাংশে এদেশে নব্য ধনী সম্প্রদায়ের উদ্ভব। এদের মতে এগুলির আর্থিক মূল্য পরিমাপ করা সম্ভব হলে আর্থিক নিষ্ক্রমণের ঘটনা নিস্প্রভ হয়ে যায়। এমনকি আর্থিক নিষ্ক্রমণ নামক ঘটনার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। এদের সবচেয়ে জোরালো যুক্তিটি হল আর্থিক নিষ্ক্রমণের পরিবর্তে বাংলা যদি বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়ে থাকে তাহলে রপ্তানি বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত কখনো আর্থিক নিষ্ক্রমণ নয়। আমদানি বাণিজ্যে ঘাটতি অদৃশ্য আমদানি ও সেবা দিয়ে পূরণ করা হয়েছে। এদেরে মতে আর্থিক নিষ্ক্রমণে বাংলা আর্থিক দুর্দশার সৃষ্টি হয়েছিল বা বাংলার আর্থিক ক্ষতি হয়েছিল এমন সিদ্ধান্ত প্রমাণ করা যায় না। বাংলার লোকসংখ্যা, মোট উৎপাদন, মোট আয় প্রভৃতি সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যানের অভাবে এ সম্পর্কে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না।

এযুগে মুদ্রা ব্যবস্থার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল শতাব্দীর দ্বিতায়ার্ধে ক্রমবর্ধমান মুদ্রাসংকট। পলাশী-উত্তরকারে কোম্পানীর হাতে প্রচুর টাকা আসায় রপ্তানি পণ্যক্রয়ে দেশ থেকে সোনারূপো আনার প্রয়োজন হল না। আর কোম্পানীর কর্মচারীদের সঞ্চিত সম্পদ অন্যান্য বিদেশী কোম্পানীগুলির বাংলা বাণিজ্যের মূলধন হল। এজন্যে রূপোর সরবরাহ হ্রাস পায়। এ সমস্যার সমাধানের জন্য ক্লাইভের সময় থেকে বাংলার বাজারে রুপোর সিক্কা টাকার পাশাপাশি সোনার মোহর বৈধ মুদ্রা হিসাবে চালানোর চেষ্টা হয়। তবে সোনার মোহরের দাম রুপোর টাকার তুলনায় বেশি ধার্য হওয়ায় মোহর জনপ্রিয় হয়নি। তাছাড়া এরকম বেশি মূল্যের টাকা বাজারে খুচরো লেনদেনে বেশি কাজে লাগে না। মুদ্রাসংকটের অপর বৈশিষ্ট্য হল বহু মুদ্রার মধ্যে বিনিময় ব্যবস্থা। কর্ণওয়ালিশ সমস্ত রকম প্রচলিত মুদ্রার বিনাব্যয়ে পুনমুদ্রণের ব্যবস্থা করে এ সংকটের সমাধান করেছিলেন। শতাব্দীর শেষে রুপোর সিক্কা (১৯ সূর্যবর্ষ সিক্কা) ও সোনার মোহর বাংলার বাজারে বৈধমুদ্রা।

শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার দেশীয় ব্যাঙ্কিং-এর অবনতি শুরু হয়। জগৎ শেঠদের প্রতিযোগী অনেক ব্যাঙ্কিং পরিবার গড়ে উঠে। এরাও কোম্পানীর সমস্ত প্রয়োজন মেটাতে পারত না। হেস্টিংসের সময় বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কলকাতায় হুন্ডিতে টাকা পাঠানোর সমস্যা দেখা দেয়। এজন্যে হেস্টিংস সরকারি ব্যাঙ্ক স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। ডিরেক্টর সভার অনুমোদন না পাওয়ায় তাঁর এ পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। শিল্প-বাণিজ্য থেকে সরে এসে এদেশীয় ব্যাঙ্কিং টাকার বিনিময় ও হুন্ডির ব্যবসায় আশ্রয়

করে। শতাব্দীর শেষ দিকেও কলকাতায় এদেশীয় টাকার একচেটিয়া কারবারীরা কোম্পানীকে বেশি বাট্টায় টাকা ধার দিত। মাঝে মাঝে টাকার বাজারের উপর এদের নিয়ন্ত্রণ দেখা যেত। সত্তরের দশক থেকে ইউরোপীয় ব্যাঙ্কিং ও এজেন্সি হাউসের আবির্ভাবের পর থেকে এদেশীয় ও ইউরোপীয় ব্যাঙ্কিং স্বতন্ত্র ধারায় চলতে থাকে। বাংলার এশীয় ও ইউরোপীয় বাণিজ্য এদেশীয় মূলধনের আওতার বাইরে চলে যায়।

(উৎস: বাংলার আর্থিক ইতিহাস, সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, অষ্টাদশ শতাব্দী)

সপ্তম অধ্যায়

বাংলায় ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক প্রভাব

সতের শতক থেকে শুরু করে উনিশ শতকের মাঝামাঝি কাল পর্যন্ত বাংলার ইতিহাস এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ সময়ে বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সকল অবস্থার যে পরিবর্তন সূচিত হয় তা বিগত বাংলার পূর্বের সার্বিক পরিস্থিতির বনিয়াদকে বিধ্বস্ত করে এক নতুন পরিবেশ পরিস্থিতির সৃষ্টির সংকেত দেয়।

বাংলায় ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্য করার ফলাফল বা প্রভাব সুদূরপ্রসারী। ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রায় দুই শতাধিক বছরের অবস্থানের ফলে এই বাংলার ইতিহাস বিভিন্নভাবে প্রভাবিত হয়। ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাংলার বাণিজ্যে অংশগ্রহণ এদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে যেমন মারাত্মক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে ও এদেশীয় বণিকদের ব্যবসা বাণিজ্যে অভূতপূর্ব ক্ষতিসাধন করে। এছাড়া ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যের প্রভাবে এই বাংলার আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষা ও সংস্কৃতিক দিকের ক্ষেত্রে অনেক নতুনত্ব বা আধুনিকতার ছোঁয়া পেয়ে থাকে। কৃষি ও শিল্প প্রযুক্তিগত করণের ফলে ব্যাপক উন্নতি লাভ করে। আমেরিকা ও আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী ও খাদ্যশস্য আমদানির মাধ্যমে তারা বাংলার দ্রব্যসামগ্রীকে সমৃদ্ধশালী করে। তারা উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে এশিয়া ও ইউরোপে সরাসরি বাণিজ্য পরিচালনা করতে সক্ষম হয় এবং আরবদের মধ্যস্থতা এতে দরকার হয় না। ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক প্রভাব বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে একটি বিষয় ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন সেটি হল, ইংরেজ বণিক কোম্পানী বাংলায় বাণিজ্য করতে আসলেও সেই উদ্দেশ্য তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে এবং তারা বাংলার অভ্যন্তরীণ ও বর্হিদেশীয় বাণিজ্যের উপর সম্পূর্ণ একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় ছিলেন। বাংলার শিল্পকে ধ্বংস করা তাদের প্রথম উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু কালের বিবর্তনের ফলে, ইতিহাসের নির্দেশে ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক পরিবর্তন ও শিল্প বিপ্লবের সাথে সাথে এই বণিকদের ও (British Mercantalism বা Commercial Capitalism কৃষিযুগীয় অর্থনীতি থেকে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে প্রসার লাভের মধ্যবর্তী স্তর) দিন ঘনিয়ে এসেছিল। তারা বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক প্রয়োজনে বাংলা ও তার আশেপাশের বিভিন্ন এলাকায় বাণিজ্য কুঠি ও উপনিবেশ গড়ে তোলে। এছাড়া তাদের খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের ফলে বাংলায় খ্রিষ্টধর্মের সম্প্রসারণ বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া এই বাংলায় কল্যাণমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা; আধুনিক কৃষ্টি-সংস্কৃতি এবং প্রযুক্তিগত উন্নতি এসবই ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক প্রভাবের পরোক্ষ প্রভাব।

বাংলাসহ সমগ্র দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রভাব বিস্তার নিয়ে অনেকেই অনেক মতপোষণা করেছেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেছেন যে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর এদেশে অকস্মাৎ রাজনৈতিক আধিপত্য স্থাপন করে।[১] কিন্তু তাদের এই ধারণা যথার্থ মনে করা হয়না। কারণ ভারতবর্ষ ইংল্যাণ্ডের কাছে উজ্জ্বলতম রত্ন আর সেই রত্ন অপরিকল্পিত ভাবে ইংরেজদের হস্তগত হয়নি। ১৬৯৮ সালে কোম্পানীর জমিদারি স্বত্ব লাভ ছিল তাদের পরিকল্পনার সর্বপ্রথম ধাপ।[২] এরপর আস্তে আস্তে ফোর্ট উইলিয়াম দূর্গ স্থাপন, সম্রাট ফররুখশিয়ারের ফরমান লাভ, কোম্পানীর ব্যবসায়ে দেশীয় পুঁজির অংশগ্রহণ ইত্যাদি কার্যক্রম করে রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় হয়।[৩] প্রাক ঔপনিবেশিক বাংলায় কোম্পানীর উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধা আদায়। আর এই বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা আদায় করতে গিয়ে বাংলায় বসবাসরত সকল শ্রেণীর লোকের উপর যে নির্বিকার প্রভাব বিস্তার করে গেছে তার বর্ণনা অবর্ণনীয়। আর সরাসরি রাজ্য স্থাপনের নীতি গ্রহণ করা হয় পলাশী যুদ্ধের পরে। ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাংলায় অবস্থান এতদঞ্চলের ইতিহাসকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। তাদের অসহিষ্ণু বাণিজ্য নীতির ফলে এদেশের সাধারণ জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পর্যায়ে নানাভাবে বাঁধাবিঘ্নতার সৃষ্টি হয়।

বাংলায় ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক নীতির ফলাফল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। প্রায় শতাধিক বছরের ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক কার্যকলাপের ফলে এ অঞ্চলের ইতিহাসকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। বাংলায় ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে চলমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা একদিকে যেমন বাংলার আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে মারাত্মক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে, এদেশীয় বণিকদের ব্যবসা-বাণিজ্যে বিপুল ক্ষতিসাধন করে। অন্যদিকে তাদের প্রভাবে এতদঞ্চলে আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষা-সাংস্কৃতিক উন্নয়নে নতুন গতির সঞ্চার হয়। শিক্ষা-সংস্কৃতি বিস্তারের সাথে সাথে বাংলা ভাষাও সমৃদ্ধি লাভ করে। বাংলার ইতিহাসে মধ্যযুগের

---

[১] P.J. Marshall, *Problems of Empire : Britain and India 1457-1813*, Cambridge, London, 1963 page 3 Ramsay Muir, *The Making of British India* (1756-1858), Manchester : At the university press, London, 1923, page-2.

[২] Ram Gopal, How the British Occupied Bengal : A correct Account of the 1756-1765 Evnts, Asia Pub. House,1763, p-10, Anil Chandra Banerijee, The Agarian system of Bengal, (1582-1793), V-1, K.P. Bagchi and Calcutta, 1940, P-87. সিরাজুল ইসলাম, বাংলার ইতিহাস : উপনিবেশিক শাসন কাঠামো ১৭৫৭-১৮৫৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ-২।

[৩] ড: সিরাজুল ইসলাম, (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস, ১ম খন্ড (রাজনৈতিক)*, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৯৩, পৃ-১০৪।

অবসান হয়ে আধুনিক যুগের সূচনা হয়। কৃষি ও শিক্ষার আধুনিকতার ছোঁয়া পেয়ে ব্যাপক উন্নতি লাভ করে। এ দেশে পণ্যের উৎপাদনও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। তারা আমেরিকা ও আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে নতুন নতুন ফলমূল ও খাদ্যশস্য আমদানির মাধ্যমে বাংলার ফলসম্পদকে সমৃদ্ধি করে। আরবদের মধ্যস্থতা ছাড়াই উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে এশীয় ইউরোপীয় সরাসরি বাণিজ্য পরিচালনার গুরুত্ব লাভ করে। ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে বাংলার বাণিজ্য ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ হয়। তারা বাণিজ্যিক এবং প্রশাসনিক প্রয়োজনে বাংলা ও তার আশেপাশের বিভিন্ন স্থানে বাণিজ্যকুঠি ও উপনিবেশ গড়ে তোলে। তাদের বাণিজ্যের সংস্পর্শে উপকূলীয় শহরগুলোর ব্যাপক উন্নয়ন ঘটে।

অভিসন্দর্ভটির এই অধ্যায়ে বাংলায় ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের প্রভাব অনুসন্ধান করা হয়েছে। এতদউদ্দেশ্যে এখানে বাংলায় ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা-সংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে প্রভাব পৃথক পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৭.১ অর্থনৈতিক প্রভাব

ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাংলার বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলার বাণিজ্যে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অবস্থান বাংলার অর্থনীতিকে বিভিন্নভাবে পরিবর্তনের সূচনা করে। বাংলায় বাণিজ্যে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বানিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাংলার অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। সতের শতকের আশির দশক থেকে আঠার শতকের মাঝামাঝি সময়কাল পর্যন্ত ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলার বাণিজ্যে ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলায় ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক অবস্থান বাংলার অর্থনীতিকে বিভিন্নভাবে পরিবর্তনের সূচনা করে। অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্য ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। ইউরোপীয় বণিকরা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এদেশে বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী আমদানি করে এবং এদেশে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করে। শুধুমাত্র বাংলা নয় বরং এ বাণিজ্য বিপ্লব বিশ্ববাণিজ্য ও বিশ্ব অর্থনীতির গতি পরিবর্তনের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে।

তাছাড়া বিদেশি বিভিন্ন কোম্পানীর বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে বাংলা সমগ্র পৃথিবীর ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। তবে দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ পথে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সংযোগ স্থাপন হলে আলেকজান্দ্রিয়া, আলেপ্পো, বৈরুত, ভেনিস প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ও

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বিশ্বপরিসরে বৃটেন ও ইউরোপে লগ্নি পুঁজির দ্রুত বিকাশের ফলে পুঁজিবাদ একচেটিয়া রূপ পরিগ্রহ করে। পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়। পুঁজিবাদী দেশসমূহ ঔপনিবেশিক থাবা বিস্তারের জন্য অভূতপূর্ব প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়। ঔপনিবেশিক দেশসমূহে পুঁজির শোষণ তীব্র ও ব্যাপক আকার ধারণ করে। সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদীরা বাংলার সমাজের অধিকতর বিকাশ ও উন্নতির পথে কঠিন অন্তরায় হয়ে দেখা দেয়। ফলে বাংলা অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংকটের আবর্তে পতিত হয়।[৪]

বাংলার মুসলিম নিম্নবিত্ত সমাজের একটি বড় অংশ ছিল তাঁতী সম্প্রদায়। তাঁত শিল্প এদেশে অশেষ উন্নতি লাভ করেছিল। কিন্তু বিভিন্ন কৌশলে তাঁত শিল্প ধ্বংস করে বস্ত্র শিল্পের উন্নয়নশীল কেন্দ্র হিসেবে বাংলার অস্তিত্ব বিলুপ্ত করা হয়। ফলে বাংলার মুসলিম নিম্নবিত্ত সমাজে অর্থনৈতিক দুর্গতি নেমে আসে। সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাত্রার উপর কঠিন আঘাত হানে। যে চাষীরা নিজেদের জমিতে ফসল উৎপন্ন করে সফলভাবে জীবিকা নির্বাহ করত, জমি থেকে তারা আর স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহ করতে পারত না, বরং জমি থেকে তাদেরকে উচ্ছেদ করে নিঃসম্বল কুলিতে রূপান্তরিত হয়। তাদের সম্পদই তাদের জন্য অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়। ইংল্যান্ডের শিক্ষা বিস্তারে পর বাংলার মুসলমান জনসাধারণের অর্থনৈতিক দূর্গতি ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে। মুসলমানদের গোঁড়ামি এবং ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের অনিচ্ছার ফলে অবস্থাপূর্ণ কৃষকরা গ্রাম কেন্দ্রিক হয়ে উঠে। তাছাড়া পুরাতন সমাজ ব্যবস্থায় মেয়েরা সাধারণত বাড়িতে তাঁতের কাজ করত। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডের শিল্প-বিপ্লবের ফলে বাংলার তাঁতশিল্পের অবনতি ঘটে। তখন মুসলিম নারীদেরকে নতুন কর্মসংস্থান দেওয়া সম্ভব হয়নি। তাঁতী পরিাবরের একটি বিপুল অংশ বেকার হয়ে পড়ে।

ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী যে সকল পণ্য রপ্তানী করত তা হল-সূতা, রেশম, লবণ ইত্যাদি। কোম্পানীর গৃহীত বাণিজ্য নীতির ফলে এ সকল শিল্পে ভারতবর্ষ মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। পলাশী পরবর্তীতে বাণিজ্য নীতি সূতা প্রস্তুতকারকদের জন্য দুঃখ বয়ে আনে। কেননা, দেশীয় সূতা উন্নতমানের ছিল না। কোম্পানী এ সময় সূতা তৈরীর জন্য কারখানা প্রতিষ্ঠা করে। সূতা প্রস্তুতকারক কারখানায় যারা কাজ করত না তাদের আঙ্গুল কেটে দেয়া হবে এ মর্মে কোম্পানী আইন জারি করে। বাংলার সুতিবস্ত্রের তাঁতীরা প্রায় ১৮ ধরনের রেশম ও সুতিবস্ত্র উৎপাদন করত। কোম্পানীর বাণিজ্যে

---

[৪] মুসা আনসারী, *ইতিহাস: সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯২, পৃ. ১৭৭।

এজেন্সি ব্যবস্থায় বস্ত্র শিল্প সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তাঁতীরা দাদন নিতে অস্বীকার করলে তাদের কোমরে টাকা গুঁজে দিয়ে বেত্রাঘাত করা হত।

বাংলার কৃষি ও বাণিজ্য যখন ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হস্তগত করে ঠিক সে সময় ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব ঘটে। সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রচুর পরিমাণ বাংলার বস্ত্র ইউরোপে রপ্তানি হতো। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দী হতে ইংল্যান্ডের শিল্পজাত দ্রব্যাদি বাংলায় আমদানি শুরু হয়। ইংল্যান্ডে বাংলা তথা ভারতীয় রেশম বস্ত্রের আমদানির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। ইংল্যান্ডের শিল্পজাত দ্রব্যাদির আমদানির ফলে বাংলার কুটির শিল্পের বিলুপ্তি ঘটে। যার ফলে বাংলার বহুলোকের জীবিকা অর্জনের পথ রুদ্ধ হয়। ইংরেজ কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের পর বাংলার কৃষকদের জমির খাজনা অনেক বৃদ্ধি পায়। স্যার জন শোর রিপোর্ট থেকে জানা যায় সম্রাট আকবরের আমল থেকে ১৭২৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় জমির খাজনা সামান্য পরিমাণ বেড়েছিল। ১৭২৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে আলীবর্দী খান পর্যন্ত জমির খাজনা তুলনামূলক বাড়লেও তার পরিমাণ অতিরিক্ত ছিল না। কিন্তু ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা জোর করে খাজনার পরিমাণ অতিরিক্ত বাড়িয়ে দেয়। ১৭৬৪-৬৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার খাজনা আদায় হয়েছিল ৮ লক্ষ ১৮ হাজার পাউন্ড যেখানে দেওয়ানির প্রথম বছরে ১৭৬৫-৬৬ খ্রিস্টাব্দে খাজনা আদায় হয় ১২ লক্ষ ৭০ হাজার পাউন্ড।[৫] তাতে অনেক কৃষক তাদের জমি চাষ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলায় ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অনুপ্রবেশ ঘটে। বাংলার যে সম্পদ পৃথিবীর সর্বত্রই বর্তিত হয়েছিল তা আহরণ করার জন্যই এদেশে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আগমন ঘটেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলা থেকে সম্পদ নিঃসরিত হতে শুরু করে। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে ইউরোপীয় কোম্পানীগুলোর বেশির ভাগই বাংলা থেকে সম্পদ নিঃসরণ করে। ওলন্দাজ কোম্পানী তাদের সমগ্র আমদানির ৯৮ শতাংশ ছিল সোনা বা রূপায়।[৬] ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা বিভিন্ন ভাবে বাংলা থেকে সম্পদ আহরণ করে এবং আহরিত সম্পদ নানা পথে বিদেশে নিয়ে যায়। ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীও বাংলা থেকে সম্পদ নিঃসরিত করে। পলাশী যুদ্ধের পর ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা বাংলার নবাব, যুবরাজ, অভিজাত সম্প্রদায় এবং সাধারণ জনগণের কাছ থেকে অবৈধভাবে নজরানা ও উপহার গ্রহণ করতে থাকে। নবাব

---

[৫] হীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, *ভারতবর্ষের ইতিহাস*, মুঘল ও বৃটিশ ভারত, কলকাতা: কে.পিবাগচী এণ্ড কোম্পানি, ১৯৯৪, পৃ. ৪৪৫।

[৬] রত্নাবলী (সাহা), মুখার্জী, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর হুগলি, বণিক, ইতিহাস অনুসন্ধান-৯, সম্পা, আব্দুল ওহাব মাহমুদ, কলকাতা: কে.পিবাগচী এণ্ড কোম্পানি, ১৯৯৪, পৃ. ২১৫।।

সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করে এবং মীর জাফরকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার বিনিময়ে কোম্পানীর কর্মচারীরা মীরজাফরের নিকট হতে ১২, ৩৮, ৫৭৫ পাউণ্ড উপহার হিসেবে পেয়েছিল।[৭] শেষ পর্যন্ত কোম্পানী চাহিদা পূরণ করতে না পারায় মীর জাফরকেও সিংহাসনচ্যুত করে মীর কাশিমকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা হয়। তাতে মীর কাশিমও কোম্পানীকে প্রচুর অর্থ প্রদান করতে বাধ্য হন। কোম্পানীর সাথে সম্পর্ক খারাপ হওয়ায় বক্সারের যুদ্ধে মীর কাশিম পরাজিত হন। মীর জাফর কোম্পানীকে দ্বিতীয়বার প্রচুর পরিমাণ অর্থ প্রদানের বিনিময়ে সিংহাসন লাভ করেন। মীর জাফরের মৃত্যুর পর নাজমুদ্দৌলাকে সিংহাসনে বসিয়ে কোম্পানীর কর্মচারীরা প্রচুর অর্থ লাভ করে। এভাবে ১৭৫৭-১৭৬৬ খ্রিষ্টাব্দ সময়কালে কোম্পানীর কর্মচারীরা নজরানা ও উপহার হিসেবে পাঁচ কোটি টাকা আয় করে।[৮] তাছাড়া তারা হিসেব বহিঃর্ভূত আরও অনেক অর্থ উপার্জন করে, যার সবগুলো বিদেশে নিঃসরিত হয়।

১৭৫৭-১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই একশো বছরে বাংলার অর্থনৈতিক শোষণ যে পরিমাণ চলেছিল তার ফলেই ইউরোপে শিল্প বিপ্লব সফল হয়েছিল। তাছাড়া শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার হিসেবে এবং কাঁচামাল সংগ্রহের স্থান হিসেবেও ইংরেজরা বাংলাকে ব্যবহার করত। ইংরেজদের স্বার্থ ছিল এ দেশের জমিতে স্বল্পমূল্যে কৃষিজ কাঁচামাল উৎপন্ন করে ইংল্যান্ডের শিল্পকারখানায় তা ব্যবহার করা। ফলে এদেশের সনাতন অর্থনীতির ভারসাম্য ভেঙ্গে যায়।[৯] বিলেতি শিল্পজাত দ্রব্য এদেশে জোর করে আমদানির ফলে ছোট ছোট শিল্পগুলো ক্রমে ধ্বংস হয়। ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্ব হতেই এদেশের সোনা, রূপা প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু ইউরোপীয় বণিকরা নিয়ে যায়। ইংরেজ রাজত্ব স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে এ শোষণের মাত্রা স্বাভাবিক ভাবে বেড়ে যায়। উইলিয়াম হান্টার বলেন, মোগল আমলের তুলনায় ইংরেজ শাসনামলে মানুষের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। মোগল আমলে শতকরা ৯০ শতাংশ মানুষ ভাল খেয়ে পড়ে স্বস্তিতে থাকত।[১০]

১৭৬৫ সালে মুঘল সম্রাট ২য় শাহ আলমের নিকট থেকে ফরমানের মাধ্যমে কোম্পানী বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করে।[১১] এরপর প্রদেশের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব ইংরেজ কোম্পানীর উপর ন্যস্ত হয়। দেওয়ানির দায়িত্ব পাওয়ার পর মুঘল সম্রাট মনে করেছিলেন যে, তিনি কোম্পানীর

---

[৭]. এস. ওয়াজেদ আলী, *বাংলা অর্থনৈতিক ইতিহাস*, (১৭৫৭-১৯৪৭), ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থপ্রকাশন, ২০০০, পৃ. ১৮।

[৮]. এস. ওয়াজেদ আলী, *বাংলা অর্থনৈতিক ইতিহাস*, (১৭৫৭-১৯৪৭), ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থপ্রকাশন, ২০০০, পৃ. ১৮।

[৯] আব্দুল্লাহ ফারুক, *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৭৪, পৃ. ৪২।

[১০] হীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, *ভারতবর্ষের ইতিহাস*, মুঘল ও বৃটিশ ও ভারত, পৃ. ২৩০।

[১১] Ramsay Muir. *The making of British India*, 1756-1856, Book on demend Ltd. 19 June, 2014, p.35

উপর কর্তৃত্ব ফিরে পেয়েছেন। কিন্তু তার এই ধারণা ছিল ভুল। কারণ মুঘল সম্রাট এবং বাংলার নবাব উভয়ই প্রকৃত অর্থে ছিলেন কোম্পানীর কৃপাপ্রার্থী।

দেওয়ানি লাভের ফলে ইংরেজ কোম্পানী প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ না করে তা একজন নায়েব দেওয়ানের অর্থাৎ রেজা খানের উপর চাপিয়ে দেয়। রেজা খান সাধ্যমত পূর্ববর্তী মুঘল যুগের শাসন ও রাজস্বনীতি প্রবর্তন করতে সচেষ্ট হন। কিন্তু তাঁর এ প্রচেষ্টার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় দুটি কারণ। প্রথমত, অধিক মুনাফার জন্য কোম্পনির প্রতিনিয়ত চাপ এবং দ্বিতীয়ত, কোম্পানীর কর্মচারী ও গোমস্তাদের একচেটিয়া অভ্যন্তরীণ ব্যবসা। কোম্পানীর কর্মচারীদের যৎসামান্য বেতনের কারণে তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসা ছিল প্রধান আকর্ষণ এবং চাকরির সঙ্গে ব্যবসা দ্বারা বিপুল অর্থ সঞ্চয়ের মাধ্যমে ইংল্যান্ডে প্রত্যাবর্তন করে তারা নবাব হয়ে বসতো।[১২]

কোম্পানির কর্মচারী ছাড়াও এ দেশীয় বাণিজ্য প্রতিনিধিরাও বেআইনি ব্যবসা ও দস্তকের অপব্যবহার দ্বারা শুল্ক ফাঁকি দিয়ে অনেক অর্থ উপার্জন করে। ইংরেজ কর্মচারীদের অবৈধ ব্যবসা ও কার্যকলাপে এ দেশের ব্যবসা বাণিজ্য ধ্বংসের মুখে পতিত হয়েছিল এবং সরকারের রাজস্ব হ্রাস পেয়েছিল। এসবের মূলে অর্থাৎ এই অর্থনৈতিক অধ:পতনের মূলে কোম্পানীর নীতিই দায়ী ছিল।[১৩] দেওয়ানি লাভের পরে কোম্পানীর লভ্যাংশ, ব্যবসা পুঁজি ও যুদ্ধের খরচ যোগানের জন্য রাজস্ব বৃদ্ধির দিকে খুব মনোযোগ দেয়। এই রাজস্ব প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য আমিল বা রাজস্ব ঠিকাদার নিযুক্ত করা হয়। তারা নিয়মিত রাজস্ব ছাড়াও বাড়তি করও আদায় করত বলে প্রমাণ আছে।[১৪]

কারণ তাদের কার্যকলাপের উপর দৃষ্টি রাখা ও তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করা থেকে বিরত রাখার কোন ব্যবস্থা ছিলনা। এজন্য কৃষকদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। গভর্ণর হ্যারি ভেরলস্টের মতে, রাজস্ব আদায়ের এই পদ্ধতিটি ছিল দুর্নীতি গ্রস্থ।[১৫] এ সময়ে গোমস্তা ও আমিলরা কৃষকদেরও দেশকে শোষণের কাজে নিমজ্জিত ছিল।

ফলে সমগ্র পরিকল্পনা দেশের জন্য ক্ষতিকারক হয়ে পড়ে এবং বাংলার কৃষি অর্থনীতি ও সামগ্রিক জনজীবনের উপর বিপর্যয় ডেকে নিয়ে আসে। ব্যবসার ক্ষেত্রে এজেন্সি প্রথা বিলোপ করে দাদনী প্রথা

---

[১২] ডঃ সিরাজুল ইসলাম, (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস, ১ম খন্ড (রাজনৈতিক)*, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৯৩, পৃ. ৩১।

[১৩] Henry Vansittart, *A narrative of the transctions in Bengal*, Kalkata: 1976, p. 64-65

[১৪] Henry Vansittart, Ibid, p. 64-65

[১৫] এ্যাসকলি এফ. ডি. *আরলি রেভেন্যু হিস্ট্রি অব বেঙ্গল এ্যান্ড দ্যা ফিফথ রিপোর্ট*, ১৮১২, অক্সফোর্ড: ১৯১৭, পৃ. ৩২-৩৩.

চালু করা হয় এবং কোম্পানীর দালাল গোমস্তাদের নির্দেশ দেয়া হয় রেজা খান সরকারের কর্তৃত্ব মেনে চলতে।[১৬] কিন্তু এতেও দেশের অর্থনৈতিক অবনতি রোধ করা যায়নি। অনাদায়ী রাজস্বের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পায়। ১৭৬৯ সালে প্রতি জেলায় একজনকে কোম্পানীর পক্ষ থেকে সুপারভাইজার হিসেবে নিয়োগ করা হয়।[১৭] প্রশাসনিক গুরুত্বের অভাবে কর্মচারীদের উপর সুপারভাইজারদের কোনো নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং নানা কারণে তাদের দূর্নীতি মুক্ত রাখা যায়নি।

এর ফলে কৃষক ও তাঁতীশ্রেণীর উপর চরম অন্ধকার নেমে আসে। একদিকে শোষণ ও উৎপীড়নে জনজীবন বিপর্যস্ত হয় অন্যদিকে কুঠির শিল্প ধ্বংস ও ব্যবসা বাণিজ্যে ধ্বংস নেমে আসে। কোম্পানী কর্তৃক উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টাকে প্রতিনিয়ত ব্যাহত করার পরিণামে দেশে ১৭৬৯-৭০ সালে এক মহাদূর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই দুর্ভিক্ষ যেমন ছিল দীর্ঘস্থায়ী তেমনি ছিল ব্যাপক। এতে বাংলার এক তৃতীয়াংশ মানুষ মৃত্যুবরণ করে।

১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষে রেশম শিল্পী ও তাঁতীদের মধ্যে মৃত্যুর হার ছিল অত্যাধিক। অপরদিকে অভিজ্ঞ ও দক্ষ কারিগরের অভাবে গুণগত দিক দিয়ে রেশম ও তাঁত শিল্প পূর্বের উৎকর্ষতা হারিয়ে ফেলে। দূর্ভিক্ষের প্রভাবে সামাজিক অনুশাসনও ভেঙ্গে পড়ে। আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটে। পলাশীর যুদ্ধের পরে বিভিন্ন সময়ে অর্থের লোভে রাজস্ব এমনভাবে বৃদ্ধি করা হয় যে, ভূমির উৎপাদিকা শক্তি নির্ণয়ের উপরে ছিলনা। ইংরেজদের ক্ষমতা গ্রহণের পরে রাজস্ব শাসনের অবস্থা এবং দুর্ভিক্ষের ফলে পতিত জমির পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। সুপ্রাচীনকাল থেকে বাংলার কুটির শিল্পের সুনাম ছিল বিশ্বব্যাপী। মুঘল নবাবি আমলে বিশ্বব্যাপী বাংলা বস্ত্রের ক্রমবর্ধমান চাহিদা এই শিল্পের অসাধারণ উন্নতির প্রমাণ।[১৮] বাংলার অর্থনীতির উপর বস্ত্রশিল্পের প্রভাব ছিল অসামান্য। জেমস টেইলরের (James Taylor) মতে বাজার প্রসারতার কারণে এ শিল্পে বহু মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছিল।[১৯] অষ্টাদশ শতাব্দীর ২য়ার্ধে হেনরি পাত্তুলো (Henry Pattallo, 1786) মন্তব্য করেছিলেন যে, "বস্ত্রশিল্পে বিশ্বের অন্য কোন দেশ বাংলার সমকক্ষ হতে পারবে না। বাংলার তাঁতী

---

[১৬] Anil Chandra Banerjee, *Indian Constitutional Documents,* 1757-1939, Hesperides Press, 12 November, 2006, p. 87.

[১৭] Edward Thompson, and Garratt, Rise and Fulfilment of British Rule in India, Oxford, London, 1945, p. 103.

[১৮] J.C. Sinha, *The Dacca Muslin Industry*, The modern review, Vol. XXXVII, No. 4, 1925, P. 400, সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।

[১৯]. James Taylor. *The Sketch of the Topography and Statistics of Dacca,* Vol. 1. Military Orphan Press. Calcutta, 1840, p. 364.

সম্পর্কে সমকালীন বিদেশি পর্যটকরা সাক্ষ্য দেন যে, এরা পরিশ্রমি, দক্ষ, শান্ত ও নিরীহ।[২০] কোম্পানি সরকার শীঘ্রই ভূমিনীতির মতো তাদের ব্যবসায় রীতি-পদ্ধতিতে ও যুগান্তকারী পরিবর্তন আনয়ন করে। তারা বাংলা বাণিজ্যেও শিল্প উৎপাদনে একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে নানা প্রকার নিয়ম কানুন প্রবর্তন করেন। এর ফলে তাঁতী ও বিভিন্ন শিল্পের কারিগরদের ওপর নেমে আসে নানা ধরনের অত্যাচার ও শোষণ।

ওয়ারেন হেস্টিংস ও কনর্ণওয়ালিস বাংলার তাঁতীদের স্বার্থরক্ষামূলক অনেকগুলি ব্যবস্থা নেন বটে। কিন্তু ব্রিটিশ স্বার্থকে পরাস্ত করতে পারেন নি। কোম্পানীর কর্মচারীরা মানসম্মত কাপড়ের নীচু দাম ধার্য করে তাঁতীদের ফাঁকি দিতে থাকে। কোম্পানী অগ্রিম ব্যবস্থার আওতায় বস্ত্র বিক্রয়ে তাঁতীদের বাজার দর থেকে ১৫-৪০ শতাংশ কম দিতে বাধ্য করতো।[২১]

অগ্রিম বা দাদনী গ্রহণে কেউ অস্বীকার করলে তার উপর নেমে আসতো অমানুষিক অত্যাচার।[২২]

ইংরেজ কর্মচারী কন্টরেল (Conttrell) ১৭৭৪ খ্রিঃ এ ধনের প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে ঢাকার তাঁতীদের নিকট থেকে ৬৯,৮৩০ টাকা আয় করেন।[২৩] ১৭৭৫ সালে সোনারগাঁয়ের তাঁতীরা এরূপ অব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বাধ্য হয়।

এছাড়াও ইংরেজরা রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে, বাংলার বস্ত্র শিল্পে প্রতিযোগিতামূলক বাজারও সৃষ্টি করতে দেয়নি। অবশেষে এর পরিণতি হল অষ্টাদশ শতকের শেষে বিভিন্ন স্থানে তাঁতীদের সংখ্যা হ্রাস এবং বস্ত্র শিল্পের ধ্বংস সাধন। ১৭৭৪ খ্রিঃ বাজার তিতবাড়িতে ছিল ৯০০ ঘর তাঁতী। কিন্তু ১৭৮৮ খ্রিঃ এর সংখ্যা কমে দাঁড়ালো ৫০০ ঘরে।[২৪] তাই দেখা যায় যে, হস্তচালিত তাঁতী ও তকলি বাংলায় নিয়মিত ভাবে অসংখ্য সূতা কাটুনি ও তাঁতী সৃষ্টি করতো বণিক সরকার তা ভেঙ্গে ফেলে নিজেদের স্বার্থে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলার বস্ত্রশিল্প ও কৃষক তাঁতীদের নিজস্ব স্বাধীন উপজীবিকাটি ইংরেজদের একচেটিয়া ব্যবসায়ের মূলধনের আক্রমণে ধ্বংস হয়ে পড়ে।

---

[২০] N. K. Sinha, *The Economic History of Bangal*, Vol. 1, Firma K.L. Mukhopadhyay, Calcutta. 1965. p. 171.

[২১] N. K. Sinha, *The Economic History of Bangal*, Vol. 1, Firma K.L. Mukhopadhyay, Calcutta. 1965. p. 158.

[২২] William Bolts, *Considerations on Inidan Affairs. quated in D.B. Mitra*, The Cotton weavers of Bengal, 1757-1833, Firma K.L.M Calcutta, 1978, p. 49.

[২৩] N. K. Sinha, *The Economic History of Bangal*, Vol. 1, Firma K.L. Mukhopadhyay, Calcutta. 1965. p. 158.

[২৪] Hameeda Hossain, *The Company Weavers of Bengal*: The East India Company and the Organizationof Textile Production in Bengal 1750-1813, Oxfrod University press. Delhi, 1988, p. 22 : D.B. Mitra, op. cit., p. 93.

এ নীতিসমূহ এদেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। সামগ্রিকভাবে বাংলায় রপ্তানী বাণিজ্য হ্রাস পায় এবং বাংলায় ইউরোপীয় শিল্পজাত পণ্যের আমদানী বাড়তে থাকে। যা আমরা নিম্নোক্ত চিত্রের মাধ্যমে উপলব্ধি করতে পারি।

1601-1640[25]

Year	Ships sent out	Tonnage	Ships returned	Tonnage
1601-10	18	6692	10	3410
1610-20	63	27394	25	11535
1620-30	50	23103	38	21050
1630-40	37	19986	31	18323

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কৃষির উপরই অর্থনীতির প্রাধান্য ছিল। শুধু কৃষিজাত কাঁচামাল রপ্তানী পণ্য হিসাবে বিবেচিত হয়। বিশ্ববাজারে বাংলার বাণিজ্যিক অবস্থান পরিবর্তন হয়। বাংলায় ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক নীতি ও কোম্পানীর শুল্কমুক্ত বাণিজ্যের ফলে অন্য ইউরোপীয় বণিকরা প্রতিযোগীতায় টিকে থাকতে ব্যর্থ হয়। স্বদেশী বণিকরা বাণিজ্যের স্বার্থে কোম্পানীর বণিকদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

তাই আমরা উপরের আলোচনা থেকে দেখতে পাই যে, বাংলার সম্পদ নিঃশেষ করার জন্য ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক নীতি একটি পন্থা। কোম্পানী দুটি মাধ্যমে এদেশের সম্পদ নিঃশেষ করার প্রয়াস চালায়।

যেমন : স্থানীয়ভাবে পুঁজিসংগ্রহ নীতি ও অভ্যন্তরীণ প্রাইভেট ব্যবসা।

বৈদেশিক বাণিজ্যে বাংলা বরাবরের মতোই আমদানির চেয়ে রপ্তানি বেশি। বিশেষ করে, ইউরোপের পণ্যের চাহিদা থাকলেও এদেশে ইউরোপীয় পণ্যের বাজার ছিল খুবই সীমিত। তাই ইউরোপীয় কোম্পানীগুলোকে স্বর্ণ, রৌপ্য

---

[25] K.N. Chaudhury, *The English East India Company: The study of an early joint-stock* (London: 1965) p. 91.

বিনিময়ের জন্য আমদানি করতে হত, যা স্থানীয় বাজারে বিদ্রূপ করে টাকায় রূপান্তরিত করা হতো। পলাশীর পূর্বেও কোম্পানী বার্ষিক পঞ্চাশ লক্ষ টাকার স্বর্ণ রৌপ্য আমদানি করতো এদেশের পণ্য কেনার জন্য। কিন্তু পলাশীর পর স্বর্ণ রৌপ্য আমদানির প্রয়োজন পড়েনি। ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৩ সনের মধ্যে মীর জাফরের নিকট থেকে লাভ করেছে চুক্তি মোতবেক এক কোটি টাকা এবং উপহার-উপঢৌকন বরাদ্দ আরো সমপরিমাণ টাকা, চব্বিশ পরগনা জমিদারি থেকে লাভ করেছে বার্ষিক দশ লক্ষ টাকা রাজস্ব, ১৭৬০ সনের তিনটি জেলার (চট্টগ্রাম, বর্ধমান, মেদিনীপুর) দখল নিয়ে লাভ করেছে বার্ষিক ৫০ লক্ষ টাকা রাজস্ব এবং উক্ত সময়ে প্রয়োজনীয় পুঁজির চেয়ে স্থানীয় রাজস্ব ছিল আরও অনেক বেশি টাকা।

অন্যদিকে ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধও ঘটেছিল ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক নীতির কারণে। দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে যোগদান করতে এসেছিল আর্মেনীয়, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসি ইংরেজ বণিকরা। এই বাণিজ্য রূপান্তরিত হলো রাজনৈতিক অধিপত্যবাদে। স্থাপিত হলো ব্রিটিশ ঔপনেবিশিক রাষ্ট্র। বাংলা থেকে সমগ্র ভারতে এবং ভারত থেকে সমগ্র ভারত মহাসাগরীয় এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হলো ব্রিটিশ সাম্রাজ্য।

এতদিন ধরে যে সরকার পদ্ধতি, যে শাসনব্যবস্থা, যে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সম্পর্ক বাঙালি জাতির ঐতিহাসিক ভিত্তি রচনায় অবদান রেখেছে, পলাশী এসব প্রতিষ্ঠানের ইতি টেনে ভিত্তি করলো নতুন ব্রিটিশ-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের।

ব্রিটিশ কোম্পানীর বাণিজ্য নীতির দ্বারা বাংলার উন্নতশীল মুসলিম বয়ন শিল্প ধ্বংস হয়ে যায়। কোম্পানী বস্ত্রশিল্পের পরিবর্তে জোরপূর্বক নীলচাষের নীতি গ্রহণ করায় একদিকে যেমন বস্ত্র শিল্প ধ্বংস হয়ে যায় অন্যদিকে কৃষককূলের উপর নেমে আসে চরম দুর্ভোগ। যা আমরা দীনবন্ধু মিত্রের (১৮৩০-৭৩) "নীলদর্পণ" নাটকে দেখতে পাই। এছাড়া কোম্পানী বাণিজ্যের নামে যে অগাধ পরিমাণ সম্পদ বৃটেনে পাচার করে তার ফলে ভারতবর্ষের বাংলায় দূর্ভিক্ষ নেমে আসে। এটি শুধু এ উপমহাদেশকে অর্থনৈতিকভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত করেনি বরং সামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এটি নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল।

৭.২ রাজনৈতিক প্রভাব

বাংলায় ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক নীতির ফলাফল একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই নীতির ফলে প্রাচ্যের অনেক শক্তির উত্থান-পতন ঘটেছে। আবার অনেক শক্তির পতন হয়েছে। অনেক দেশ তাদের স্বাধীনতা হারিয়েছে, অনেক মানুষের মর্যাদা ধূলায় লুণ্ঠিত হয়েছে। বণিকদের মুনাফা তৃষ্ণা মিটাতে গিয়ে অনেক মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে। প্রাচ্যে আগমনের শুরু থেকেই ইউরোপীয় কোম্পানীগুলো তাদের বাণিজ্যিক প্রতিবন্ধকতা দূর করতে এ দেশে রাজনীতির আশ্রয় নেয়। ঐ সময় ইউরোপীয় কোম্পানীগুলো এ দেশে যেভাবে বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয় তাতে রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার ছাড়া বাণিজ্য আধিপত্য বিস্তার সম্ভব ছিল না। ইংরেজরা বাংলায় আগমনের প্রাক্কালেই তা উপলব্ধি করে প্রথমে মোগল রাজদরবারে বিভিন্ন বিদেশী কোম্পানীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে বাংলায় তাদের বাণিজ্যের ভিত্তি মজবুত করে। আঠারো শতকের প্রায় প্রথম থেকেই বাংলার নবাবের সাথে সামরিক অভিজাত সম্প্রদায়, ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ও জমিদারদের যে নতুন জোটবদ্ধতা তৈরি হয়েছিল নবাব সিরাজউদ্দৌলার সময় তা ভেঙ্গে পড়ে। তার ফলে বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সঙ্কট ঘনীভূত হয়। এই সুযোগে ইংরেজরা বাংলায় নিজেদের প্রাধান্য বিস্তারে সক্ষম হয়। বাংলা-ইউরোপীয় বাণিজ্যের ফলে বাংলার হিন্দু ব্যবসায়ী শ্রেণীর স্বার্থ ইউরোপীয় কোম্পানীগুলোর স্বার্থের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে এই বিশেষ শ্রেণী বাংলায় ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে বিশেষভাবে সাহায্য করে।[২৬]

পলাশী যুদ্ধের পূর্ব থেকেই ইংরেজ এবং ফরাসিরা মোগল সাম্রাজ্যের ভাগ-বাঁটোয়ারার দ্বন্দ্বে প্রতিযোগিতার রেষারেষি শুরু করে। বাংলার ঘাঁটিকেই ইংরেজরা তাদের বাণিজ্যের মূল ভিত্তি মনে করে। সেজন্য তারা নবাব বিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে যোগ দেয় এবং বাংলার রাজনীতিতে তাদের ভিত্তি সুদৃঢ় করে।[২৭] অতঃপর প্রথমে ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে পরে ১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভের ফলে তারা বাংলার রাজক্ষমতা দখলের পথ উন্মুক্ত করে। ওলন্দাজ বণিকরাও বাংলায় নিজেদের কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য এদেশের রাজনীতির সাথে জড়িত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা ব্যর্থ হয়। পলাশী যুদ্ধের পর বাংলায় ইংরেজদের রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হলে ওলন্দাজরা ইংরেজদের ক্ষতি সাধনের জন্য চেষ্টা করতে থাকে। বাংলার নতুন নবাব

া ইংরেজদের কবল থেকে

---

[২৬] সুশীল চৌধুরী, পলাশীর যুদ্ধ ও সিরজাউদ্দোলা, *বাংলার ইতিহাস*, কলকাতা: মৌলিক লাইব্রেরি, ১৯৮১, পৃ. ৫৬।

[২৭] রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ২য় খন্ড, মধ্যযুগ, কলাকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১৯৯৬, পৃ. ১৫৮।

মুক্তি লাভের উপায় খুঁজছিলেন। এমন সময় ওলন্দাজ বণিকরা সুযোগ বুঝে মীর জাফরের সাথে হাত মেলায়। ক্লাইভ মীর জাফরের দূরভিসন্ধি বুঝতে পারেন। তিনি মীর জাফরকে একটি চরমপত্রে লিখেন নবাব যদি ওলন্দাজদের সাঙ্গে সন্ধি করেন তাহলে ইংরেজরা তাকে কোন কাজে সাহায্য করবেন না। জবাবে মীর জাফর জানান ইংরেজরা যেভাবে চাইবে বন্ধুত্বের পরিচয় দিতে সর্বদা প্রস্তুত। তাতে ক্লাইভ ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে মীর জাফরকে স্বসৈন্যে ইংরেজদের সাহায্যের আহ্বান জানান। নিরুপায় মীর জাফর ইংরেজদের সাহায্যের জন্য পুত্র মীরনকে দিয়ে একদল সৈন্য পাঠান। প্রতিদ্বন্দ্বিতার চূড়ান্ত পর্যায়ে বিদারার যুদ্ধে ইংরেজদের কাছে ওলন্দাজদের পরাজিত হতে হয়।[২৮] বিদারার যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে ওলন্দাজদের বাংলার রাজনীতিতে প্রবেশের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। তারা বাংলায় ইংরেজদের ক্ষমতা সম্পর্কে অবগত হয়ে এদেশের রাজনীতি থেকে সরে পড়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য গুটিয়ে নেয়। ওলন্দাজদের পতনের ফলে বাংলায় ইংরেজরা ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করে এবং ক্রমে ভারতে তাদের ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত করে। এদেশীয় ব্যবসায়ীরা ইংরেজদের কাছে মাথানত করতে বাধ্য হয় এবং নিজেদের টিকিয়ে রাখার জন্য ইংরেজ কোম্পানীর সহযোগী হিসেবে বা অধস্তন কর্মচারী হিসেবে কাজ করতে বাধ্য হয়।[২৯] বাংলা তথা ভারত প্রায় দু'শত বছরের জন্য ইংরেজদের অধীনে চলে যায়।

ক্লাইভের আমলে রাষ্ট্রপরিচালনায় নিযুক্ত ছিল মুঘল অভিজাত ও মুৎসুদ্দি শ্রেণী: আর হেস্টিং এর আমলে কেন্দ্রীয় ছাড়া আঞ্চলিক শাসন-দায়িত্ব অর্পিত ছিল সনাতন শাসকশ্রেণীর হাতে। কিন্তু লর্ড কর্ণওয়ালিশের কাছে উক্ত দু'টির কোনটিই গ্রহণযোগ্য ছিলনা। তার ইচ্ছা ছিল সর্বস্তরে ইউরোপীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে বাংলাকে একটি পূর্ণাঙ্গ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে পরিণত করা। তাঁর এই ইচ্ছার প্রাধান্য জানাল কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্ট। ১৭৯৩ সালের সনদ আইনের মাধ্যমে বাংলাকে একটি স্থায়ী ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র হিসেবে প্রকাশ করে এর শাসনের জন্য প্রয়োজনীয় টেকসই শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেয়া হলো ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে। এ ঘোষণার আগেই কর্ণওয়ালিশ এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কর্ণওয়ালিশ পূর্বের সকল চুক্তি উপেক্ষা করে মুগল সম্রাটের সঙ্গে সার্বভৌমত্বের সম্পর্ক ছেদ করেন এবং নবাবকে সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে অব্যাহতি

---

[২৮] S.N. Sen. *History of Modern India. Third Edition* (New Delhi : New Age International P. Ltd. Publisher. 2006) p. 40.

[২৯] রত্মাবলী (সাহা), মুখার্জী, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর হুগলি, বণিক, ইতিহাস অনুসন্ধান-৯, সম্পা, আব্দুল ওহাব মাহমুদ, কলকাতা: কে.পিবাগচী এণ্ড কোম্পানি, ১৯৯৪, পৃ. ২১৭।

দেন। এভাবে তিনি বাংলাকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে পরিণত করেন এবং এই ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য একটি যথোপযুক্ত আমলাতন্ত্র ও নর্মস করেছিলেন।

বাণিজ্য থেকে প্রশাসন সম্পূর্ণ আলাদা করে প্রশাসনিক চাকুরি ও বাণিজ্যিক চাকুরি পৃথক পেশায় পরিণত করা হয়। ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী যখন শুধুমাত্র একটি প্রাইভেট বাণিজ্যিক সংস্থা তখন স্বাভাবিক কারণেই অন্যান্য প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের মতো কোম্পানীও অনুসরণ করতো এর নিজস্ব নিয়োগ-নীতি। কিন্তু এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটল যখন কোম্পানী বাংলার রাজ্য স্থাপন করলো। ব্রিটিশ আইন অনুসারে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রাজ্য শাসন করতে পারেনা, কারণ রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও শাসনের অধিকার একমাত্র সার্বভৌম রাজা ও পার্লামেন্টের। ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রকৃতপক্ষে শাসক হিসেবে নয়, ১৭৬৫ সালের চুক্তি মোতাবেক মুঘল সরকারের অধীনে বাংলা-বিহার উড়িষ্যার দিওয়ান হিসেবে কিছু মুনাফা অর্জনকারী ভূমিকা পালন করেছে মাত্র যা কিনা কোম্পানীর বাণিজ্যিক কর্মকান্ডের একটি দিক।

ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক নীতির ফলাফলের রাজনৈতিক দিক নিয়ে আলোচনা করলে আরও দেখা যায় যে, কোম্পানী শুধু মুর্শিদাবাদের শাসক চক্রকেই উৎখাত করেনি, দেশের সর্বস্তরের জনগণের প্রতিটি স্তর, উপস্তর উপলব্ধি করে কোম্পানীর আধিপত্যের উপদ্রব। নবাব হারায় ক্ষমতা, অভিজাত শাসক শ্রেণী হারায় তাদের শাসনক্ষমতা ও অর্থনৈতিক শক্তি। জমিদার হারায় তার প্রভাব-প্রতিপত্তি সহায় সম্পত্তি। শোষিত রায়ত শ্রেণী শুস্ক শীর্ণ অঞ্চলের ঘন ঘন দুর্ভিক্ষে ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে। ব্যবসায়ীরা তাদের পুঁজি হারায়, হারায় তার অস্তিত্ব; তাঁতী, মালঙ্গী ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে। এমনকি সংসারত্যাগী ফকির সন্ন্যাসীরা পর্যন্ত ইংরেজ শাসনে শংকিত হয়ে পড়ে। তারা এখন পূর্বের মত ভিক্ষাবৃত্তি ও মুস্টি সংগ্রহ করতে বের হতনা। নিরাপদে তীর্থস্থান ভ্রমণ করতে বের হত না। নবাবের সিংহাসন থেকে গরিবের পর্ণকুটির পর্যন্ত এমন আকাশপাতাল প্রলয়ংকরী উল্টপাল্টা ইতোপূর্বে হয়নি।

১৬৫০ সালে কলকাতা, সূতানুটি ও গোবিন্দপুর নামক তিনটি মৌজার উপর কোম্পানীর জমিদার স্বত্ব লাভ ছিল ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম দৃশমান ধাপ। এরপর পর্যায়ক্রমে প্রতিটি পদক্ষেপ কোম্পানীকে এদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে ক্রমশ সক্রিয় ও শক্তিশালী করে তোলে। যেমন : ১৬৯৮ সালে কলকাতায় দূর্গ স্থাপন, এবং পরে কলকাতার পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের উপর কোম্পানীর বেনামী জমিদারি স্বত্বের প্রসার লাভ করে। আঠারো শতকের প্রথম থেকে এদেশে বিপুলহারে কোম্পানীর

ব্যবসা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৭১৭ সালে সম্রাট ফররুখশিয়ারের কাছ থেকে মহা সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ফরমান লাভ, ক্রমশ কোম্পানীর ব্যবসায়ে দেশীর পুঁজির অংশগ্রহণ, ব্যাপকহারে কোম্পানী-কর্মচারীদের অবৈধভাবে দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে অংশগ্রহণ, ব্যবসায়িক স্বার্থে ইউরোপীয় বণিকদের সঙ্গে দেশীয় গোমস্তাদের আঁতাত এবং সবশেষে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে উৎখাত করার জন্য কোম্পানী ও দেশী বেনিয়া-মুৎসুদ্দিদের মধ্যে গোপন ষড়যন্ত্র (১৭৫৬)। ১৬৯০-১৭৫৬ পর্যন্ত সময়কালে কোম্পানীর উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে অধিকতর বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধা আদায় করা এবং বাণিজ্যিক কর্মকান্ডের নিরাপত্তা বিধান। প্রকৃতপক্ষে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় পর্যায় ক্রমে এবং ধাপে ধাপে। পলাশী যুদ্ধ পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ কোম্পানীকে উদ্বুদ্ধ করে প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য, কিন্তু তখনো যে রাজনৈতিক অভিলাষ সীমাবদ্ধ ছিল এদেশে বাণিজ্যরত কোম্পানীর কর্মচারীদের মধ্যে।

তবে ইংরেজ শাসন অনেক ক্ষেত্রে বাংলা তথা ভারতের জন্য ইতিবাচক ফল বয়ে আনে। ইংরেজদের প্রভাবে উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার রাজনৈতিক আকাশে নবজাগরণের সূচনা হয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলায় জাতীয়তাবাদ বলতে কিছুই ছিল না। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ও প্রগতিমূলক ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক চেতনা তথা জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। রাজনৈতিক চেতনার মূলে দ্বিতীয় যে কারণটি কাজ করেছিল তা ছিল ইংল্যান্ডের প্রচলিত আইনের শাসনের ভিত্তির উপর বাংলা প্রশাসনের প্রতিষ্ঠা ও ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন। সমকালীন ইউরোপীয় সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শনে বিশ্বের জনগণের যে স্বাধীনতার আদর্শ প্রচারিত হয়েছিল বাঙালিরা এ আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ভারত দরদী অক্টোভিয়ান হিউমেনের প্রচেষ্টায় সর্বপ্রথম বাংলা তথা ভারতের জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল হিসেবে সর্বভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩০] প্রশাসনিক ব্যাপারে বাংলা তথা ভারতীয় বুদ্ধিজীবিদের মনোভাব এবং মতামত সম্পর্কে সরকারকে ওয়াকেফহাল করার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই জাতীয় কংগ্রেস সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ও অনুপ্রেরণা লাভ করে এবং বাঙালিদের পক্ষে ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা আদায় করার সুযোগ পায়। লর্ড কার্জনের প্রচেষ্টায় ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা প্রেসিডেন্সি বিভক্ত হয় এবং তা টিকিয়ে রাখতে আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তায় ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিম লীগ নামে নতুন অপর একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গ ভঙ্গ রদের সূত্র ধরে

---

[৩০] অতুল চন্দ্র রায়, *ভারতের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড প্রাচীন যুগ, ১৭০৭-১৯৫০, কলিকাতা: মৌলিক লাইব্রেরি, ১৯৮১, পৃ. ৩৫৪।

১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এমনকি আধুনিক গণতন্ত্রও তাদের প্রভাবের যে পরোক্ষ ফল তা অনস্বীকার্য।

৭.৩ সামাজিক ক্ষেত্রে প্রভাব

ইউরোপীয়দের আগমনের প্রাক্কালে বাংলায় এ জাতিভেদ প্রথা বিদ্যমান ছিল। তাছাড়া ইউরোপীয়দের দ্বারাও সর্বদা বাঙালিরা ঘৃণিত হতো। ইংরেজ শাসনামলে এদেশীয়দের ইংরেজরা ঘৃণা করত এবং বাঙালি সংস্পর্শ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করত। ওয়ারেন হেস্টিংস কিছুটা ব্যতিক্রম হলেও কর্ণওয়ালিশ থেকে ডালহৌসির সময়কাল পর্যন্ত এদেশীয়দের সম্পর্কে ইংরেজদের প্রচণ্ড অবজ্ঞা প্রকাশ পায়। জন মেকলে যখন এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন সম্পর্কে বিভিন্ন নীতিকথা বলেন, তখনও তার মধ্যে বাঙালিদের কল্যাণ কামনার চেয়ে এদেশ শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্পর্কে নিদারুণ ঘৃণাই ফুটে উঠে।[৩১]

ইংরেজ রাজশক্তি যে সেনাবাহিনীর উপর নির্ভর করত সেখানেও বাঙালিদের প্রতি বৈষম্য ছিল। বাঙালি বা ভারতীয় সৈনিকদের বেতন ছিল শ্বেতাঙ্গ সামরিক কর্মচারী ও সৈনিকদের বেতনের চেয়ে অনেক কম। এক জরিপ হতে জানা যায় ৩,১৫,৫২০ জন এদেশীয় সৈন্যদের জন্য বছরে খরচ হতো ৯৮ লক্ষ পাউন্ড এবং ৫১,৩১৬ জন শ্বেতাঙ্গ সৈন্যদের জন্য খরচ হতো ৫৬ লক্ষ ৬০ হাজার পাউন্ড।[৩২] ইংরেজদের মধ্যে যারা এদেশের লোকদের সঙ্গে মিশত, তাদের অধিকাংশের চরিত্র এমন ছিল যে, বাংলাবাসীর কাছে তারা কখনো শ্রদ্ধা পেত না। তাছাড়া এ দেশে অবস্থানকালে ইউরোপীয়দের বিশেষ করে ইংরেজদের নৈতিক মান ভাল ছিল না। ইংরেজরাই কলকাতা শহরের পত্তন করায় প্রথম থেকেই এটি তাদের নিজ শহরে পরিণত হয়েছিল। প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় সংখ্যায় ইংরেজরা ১২০০ জন ছিল। শতাব্দীর শেষে তাদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪০০০ জনে। তাদের মধ্যে মেয়ের সংখ্যা ছিল মাত্র ২৫০ জন। অধিকাংশ ইংরেজরা তাদের যৌনচাহিদা পূরণ করত এদেশীয় মেয়েদের দ্বারা।[৩৩] অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলায় ওলন্দাজদের প্রভাব হ্রাস পেতে থাকে এবং তারা ইংরেজদের পেছনে পড়তে থাকে।[৩৪] তার প্রধান কারণ ছিল তাদের কৃত্রিম আচরণ ও দূর্নীতি।

---

[৩১] হীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, *ভারতবর্ষের ইতিহাস*, মুঘল ও বৃটিশ ভারত, কলাকাতা: সাহিত্যলোক, ১৯৮৫, পৃ. ৪১৪।

[৩২] হীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৪।

[৩৩] অতুল সুর, *আঠারো শতকের বাংলা ও বাঙালী* (কলকাতা : সাহিত্য লোক, ১৯৮৫), পৃ. ১২৬।

[৩৪] H.H. Dodwell, *The Cambridge History of India*, Vol. V (Cambridge, 1920), p.4

পলাশীর যুদ্ধ ছিল এমন একটি সন্ধিক্ষণ। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী পলাশী যুদ্ধের পটভূমি রচনা করতে সক্ষম হয় এবং বাংলার সমাজ বিকাশে এক নতুন ধারার দিক নির্দেশ করে।[৩৫] এ সময় বাংলার মধ্যযুগের অবসান হয়ে আধুনিক যুগের সূত্রপাত হয়। বাঙালি জীবনধারার পরিবর্তন ঘটে। আস্তে আস্তে অজ্ঞানের কাল কুয়াশা দূর করে জ্ঞানের সূর্যালোকে বাঙালির জীবন ধারায় এক নতুন আবহাওয়ার সৃষ্টি করে।[৩৬] কিন্তু ইংরেজি শিক্ষা, শিক্ষা-বাণিজ্য প্রভৃতি নতুন রীতির প্রভাবে পূর্বেকার উঁচুনিচু নানা জাতি ও শ্রেণীর প্রভেদ ও বৈষম্য দূর হয় এবং নতুন সামাজিক স্তর গড়ে উঠে।[৩৭]

প্রাচীনকাল থেকেই বাংলায় বিধবা নারীদের প্রতি বিভিন্ন প্রকার সামাজিক অনাচার করা হতো। এমনকি অষ্টাদশ শতাব্দীতেও বাংলায় সতীদাহ প্রথার প্রচলন লক্ষ করা যায়। শতাব্দীর মধ্যভাগে নাটোরের রাণী ভবানী বিধবা নারীদের একাদশী ব্রত পালনের কঠোরতা দূর করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু বাংলার শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের তীব্র বিরোধীতার ফলে তাঁর ঐ প্রচেষ্টা সফল হয়নি। অপরদিকে রাজা রাজবল্লভ ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে বিধবা বিবাহের প্রথা প্রচলনের চেষ্টা করেন। অনেক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এটা সমর্থনও করেন। কিন্তু নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বিরোধীতার ফলে শেষ পর্যন্ত তা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে উনবিংশ শতাব্দীতে রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে এক ঐতিহাসিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। এ ব্যাপার লর্ড বেন্টিঙ্ক ও প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর তাকে পূর্ণ সমর্থন করেন। বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে এক আইনের মাধ্যমে সতীদাহ প্রথা চিরতরে নিষিদ্ধ করেন।[৩৮] তাছাড়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় ইংরেজ সরকার ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে বিধবা-বিবাহ আইন পাস করে। এভাবে বাঙালি সমাজ সংস্কারকদের চেষ্টায় ও ইংরেজদের সহযোগিতায় সমাজের এক অবর্ণনীয় সামাজিক অনাচার থেকে হিন্দু বিধবা নারীরা মুক্তিলাভ করে।

'অর্থই পরমার্থ' এই পাশ্চাত্য আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ধনশালী-লক্ষপতি বা কোটিপতির উদ্ভব হয় এবং তারাই এক নতুন অভিজাত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করে।[৩৯] এ অঞ্চলে ইউরোপীয় বণিকদের প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ অবস্থানের ফলে বিভিন্ন স্থানে শহর গড়ে উঠে। এরই ধারাবাহিকতায় ইংরেজ বণিকদের দ্বারা কলিকাতা শহর প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা যখন কলিকাতায় বসবাস

---

[৩৫] মুসা আনসারী, *ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯২, পৃ. ১১১।

[৩৬] তপোন মোহন চট্টপাধ্যায়, *পলাশীর যুদ্ধ*, ২য় সংস্করণ, কলকাতা: নাভানা, ১৯৫৬, পৃ. ৪।

[৩৭] রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলার ইতিহাস*, ৩য় খন্ড, আধুনিক যুগ, ৪র্থ সং. (কালকাতা জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রা: লি: ১৯৯৬) পৃ. ২৫৮।

[৩৮] অতুল চন্দ্র রায়, *ভারতের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড প্রাচীন যুগ, ১৭০৭-১৯৫০, কলিকাতা: মৌলিক লাইব্রেরি, ১৯৮১, পৃ. ১২১।

[৩৯] অতুল চন্দ্র রায়, প্রাগুক্ত, পৃ.১২১।

শুরু করে তখন জায়গাটি সম্পূর্ণ গ্রাম ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে সেখানে এক অভিজাত শ্রেণীর অভ্যুত্থানের মাধ্যমে গ্রাম্যসমাজ শহরে রূপান্তরিত হয়।[৪০] তাছাড়া বাংলা তথা ভারতসহ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে যে সকল শহর প্রতিষ্ঠিত হয় তা ছিল ইউরোপীয় বিভিন্ন বণিকদের প্রতিযোগিতার ফল।

ইংরেজ শাসনের পূর্বে বাংলায় কোন রাজপথ যানবাহন চলাচলের উপযুক্ত ছিল না। সাম্রাজ্যের সর্বত্র ইংরেজ সেনাবাহিনী দ্রুত গমনাগমনের প্রয়োজনীয়তায় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হয়। ইংরেজ সরকারের প্রয়াসের ফলেই বাংলায় সর্বপ্রথম রেলপথ প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতের তিনটি প্রেসিডেন্সির মধ্যে দ্রুত যোগাযোগের জন্য এবং ভারতীয় সাম্রাজ্যের মধ্যে ইংরেজ সেনাবাহিনী দ্রুত গমনাগমনের জন্য লর্ড ডালহৌসি রেলপথের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। সর্বপ্রথম বোম্বাই ও পুণার মধ্যে রেলপথ নির্মিত হয়। পরে কলিকাতা ও রাণীগঞ্জ কয়লাখনির মধ্যে রেলযোগাযোগ স্থাপিত হয়। এভাবে বাংলার বিভিন্ন স্থানে রেলপথ স্থাপিত হয়। তাছাড়া বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ ও ডাক বিভাগের সংস্কারও তাদের দ্বারা সম্ভব হয়।[৪১]

সর্বোপরি বাংলায় ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অবস্থান এবং বাণিজ্যিক নীতি বাংলার ইতিহাসে গুরুত্বসহ বিবেচনা করা যায়। তাদের বাণিজ্যিক নীতির কারণেই বাংলার বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটে। ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রভাবে উপকূলীয় বিভিন্ন স্থানে ব্যাপকভাবে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত শহর প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাংলা তথা ভারতবর্ষে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারকে কেন্দ্র করে আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষার প্রচলন হয়। শিক্ষা ছাড়াও তাদের মাধ্যমে বাংলায় আধুনিক বিচার, প্রশাসন, রাষ্ট্রনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, চিকিৎসা, আবাসন প্রভৃতির প্রবর্তন ঘটে।

বিভিন্ন ব্যধির প্রাদুর্ভাব

বাংলায় ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠা ও ব্রিটেনে শিল্প বিপ্লব ছিল সমকালীন ঘটনা। বাংলায় ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কুশাসনে দূর্ভিক্ষ ও অভাব-অনটনের পাশাপাশি বাংলার অধিবাসীদের মহামারী রূপে বিভিন্ন রোগের আবির্ভাব ঘটে। কিছু রোগ আবার অনেক অঞ্চলে

---

[৪০] অতুল চন্দ্র রায়, *ভারতের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড প্রাচীন যুগ, ১৭০৭-১৯৫০, কলিকাতা: মৌলিক লাইব্রেরি, ১৯৮১, পৃ. ১২১।

[৪১] অতুল চন্দ্র রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫।

দীর্ঘস্থায়ী হতো। যক্ষ্মা, প্লেগ প্রভৃতি রোগব্যাধি বৃটিশ শাসনপূর্বকালে ভারতে খুব একটা দেখা যায়নি।[৪২]

তবে মারাত্মক মহামারী রূপে কলেরা, গুটিবসন্ত, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর প্রভৃতি ব্যধি মাঝে মাঝে বাংলার জনসংখ্যা ব্যাপকভাবে কমিয়ে দিত। মৃত্যুর প্রকৃত অজ্ঞাত কারণকে জ্বর বলে চালিয়ে দিত।[৪৩]

ভারতে বিপুল সংখ্যক লোকের মৃত্যুর কারণ বলে গুটিবসন্তকে পুরনো ব্যাধি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কুশাসনের ফলে বাংলার জনজীবনে নেমে আসে দুর্ভোগ। আর এর কারণে ১৭৭০ সনে সর্বপ্রথম দেখা দেয় মহাদুর্ভিক্ষ। এ সময় কালাজ্বরে বহু গ্রাম উজাড় অথবা পরিত্যক্ত হয়ে যায়। বৃহত্তর বঙ্গের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ এ দূর্ভিক্ষে মৃত্যুবরণ করে।[৪৪] দুর্ভিক্ষ কমিশনের প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রির মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘকাল যাবৎ সে অনুপাতে দিনমজুরের আয় বৃদ্ধি করা হয়নি।[৪৫] দ্রব্যমূল ও মজুরি ব্যবধান উত্তরোত্তর আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। অতএব দুর্ভিক্ষও অনটনের সহজ শিকারে পরিণত হয় এই দিনমজুর শ্রেণী।

ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার কৃষিভিত্তিক সমাজে মৌলিক পরিবর্তন ঘটায়। ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া শাসনের প্রভাব এতটাই ব্যাপক ছিল যে, এটি প্রবর্তনের মাত্র কিছুকালের মধ্যেই অর্ধেক ভূ-সম্পত্তিরই মালিকানাস্বত্ত্ব হাতবদল হয়ে যায়।[৪৬] এবং মধ্যস্বত্বভোগী কৃষি রায়তদের কাছ থেকে খাজনা উসুল করা শুরু করে। নতুন এ ব্যবস্থার আওতায় ভূমির উপর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপের ফলে সৃষ্টি হয় এক নব্য শোষক শ্রেণীর। এই কৃষিব্যবস্থায় সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে গ্রামীণ এলাকায়। অভাবে ক্ষুদ্র কৃষক কৃষিমজুর সম্প্রদায় যেকোন দূর্ভিক্ষ ও অনটনের ছোবলে নেতিয়ে পড়ে।

---

[৪২] K. Davis, *The Population of India and Pakistan*, New Jersy: 1951, 45-47.

[৪৩] K. Davis, Ibid p. 42.

[৪৪] W.B. Arther and G Mc.nicoll, *Analytical survey of population and Development in Bangladesh*, Population and Development Review, IV : II :1976, 29.

[৪৫] B.M. Bhatia, *Faminies in India*, A study in some aspacts of economy history of India, 1860-1945, Bomby, 1963, p. 24-26

[৪৬] S. Islam, *Rent and Raiyat-Society and Economy of fastera Bengal*, 1859-1928, Dhaka-1989, 12

৭.৪ শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রভাব

ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আগমনের পূর্বে মোঘল সাম্রাজ্যের অন্তীম যুগে বাংলায় যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিল তা ছিল মূলত ধর্মভিত্তিক। এই শিক্ষা ব্যবস্থা জনগণের বৈষয়িক ও রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য মোটেই উপযোগী ছিল না। পূর্বতম এ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রাথমিক শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষা এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। উচ্চ শিক্ষার পাঠ্যসূচি ছিল প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্য ও আরবি-ফার্সি সাহিত্য। যার পঠন পাঠন চলত টোল, চতুস্পাঠি, মক্তব ও মাদ্রাসায়। অপরদিকে পাঠশালাগুলো ছিল প্রাথমিক শিক্ষার কেন্দ্র। উচ্চ শিক্ষা সাধারণ ধর্মীয় ও শিক্ষিত শ্রেণীর মানুষের মধ্যে এবং প্রাথমিক শিক্ষা বণিক ও কৃষক শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সে সময় প্রাথমিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের হিসাবপত্র পরিচালনার দক্ষতা অর্জন করা। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে এ শিক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ক্রমেই ইউরোপীয়দের সহযোগিতায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঘটতে থাকে।

ইউরোপীয় রেনেসাঁয় যে মানবতাবাদ, যৌক্তিকতা, জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ ও সৃষ্টিশীলতার প্রতি আকাঙ্ক্ষা অভিব্যক্ত হয়েছিল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্রমোন্নয়নের মাধ্যমে তা সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত বিকশিত থাকে। তবে তা ইউরোপীয়দের নিজেদের দেশেই।[৪৭] তাদের উপনিবেশভূক্ত দেশগুলোতে বিজ্ঞান ও মানবতাচর্চা একটি নিষ্ঠুর ও চাতুর্যের মধ্যেই আবর্তিত হলেও বাংলা-ভারতে তার কিছু অনুকূল দিকও পরিলক্ষিত হয়। কেননা অনেক পরে হলেও বাংলা উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখের মাধ্যমে আধুনিকতার দরজা উন্মুক্ত হতে শুরু করে। রাজা রামহোমন রায়ের মানবিক ও প্রজ্ঞা-প্রসূত ধর্মীয় যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সতীদাহ প্রথা রোধের মাধ্যমে তাঁর কর্ম প্রচেষ্টা বাঙালীর বদ্ধ-চিন্তা-মানসে মুক্তচিন্তা ও সংস্কার মুক্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করতে থাকে। বাল্যবিবাহ রোধ এবং বিধবাবিবাহ প্রচলন প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিদ্যাসাগর বাঙালি সমাজে ধর্মীয় বদ্ধ ভাবনার নিরসনে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেছেন।[৪৮] কোম্পানী আমলে বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার কোম্পানী শাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য দিক হিসেবে পরিগণিত। কোম্পানী আমলেই বাংলা সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে এবং উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতে যে জাতীয়তাবাদের সূচনা হয়েছিল তা ছিল বাংলায় এই পাশ্চাত্য শিক্ষা ও চেতনার

---

[৪৭] রহমান হাবিব, *আমাদের আধুনিকতা-সংকট*, দৈনিক আমার দেশ, ২২ জানুয়ারী, ২০১০, পৃ. ৯।

[৪৮] রহমান হাবিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

প্রত্যক্ষ ফল। বস্তুত ঊনবিংশ শতকে যে সৃষ্টিশীল ও উদারনৈতিক চিন্তাধারার বিকাশ ঘটে তার ঢেউ বাংলাতেও এসে লাগে। আর এই পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলেই মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণা ও গতানুগতিক রীতিনীতির স্থলে যুক্তিবাদ, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্মলাভ করে এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা তথা ইংরেজি শিক্ষার সুয়োগ গ্রহণ করে বাঙালিরা ভারতে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহকে পরিণত হয়।

বাংলা সাহিত্যের বিবর্তনে ইংরেজ কর্মচারী ও মিশনারীদের অবদান অপরিসীম। শাসন কার্যের সুবিধার জন্য ইংরেজ কোম্পানী কর্মচারীদের বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। কোম্পানী আমলে বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার বা ক্রমবিকাশ মূলত কোম্পানীর কয়েকজন প্রশাসকের উদারনৈতিক মনোভাব ও উৎসাহের ফলেই ঘটে। ১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে কোম্পানীর কর্মচারী ব্রাসি হ্যালহেড ইংরেজি ভাষায় একটি বাংলা ব্যকরণ প্রকাশ করেন। তারপর জোনাথান ডানকান, হেনরি ফরস্টার প্রমুখ ইংরেজ লেখকগণ একাধিক আইনগ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেন।[৪৯] মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার ভট্টাচার্য বলেন, ইংরেজ সিভিলিয়ানদের পড়বার জন্যই প্রথমে বাংলা গদ্যে কিছু সংখ্যক টেকস্ট বুক লেখা হয়। তারপর রাজা রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টায় বাংলা গদ্য রাস্তা খুঁজে পায়।[৫০] বিদেশিদের অনুসরণ করে এ দেশের লেখকরাও প্রাচ্যবিদ্যার গবেষণা করতে পারদর্শী হয়ে উঠে। নতুন ধরনের মনসৃষ্টি হওয়াতে এ দেশের মানুষ বিদ্যাকে শুধু ভক্তিমূলক না ভেবে যুক্তিমূলক দৃষ্টিতে দেখতে থাকে।[৫১] অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলা তথা বিশ্বে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হয়। মানুষ জ্ঞানবিজ্ঞানের দ্বারা অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলে। বিজ্ঞানের সাথে সাথে মানুষের মন শিক্ষার দিকে ঝুঁকে পড়ে। দেশের সর্বত্রই গড়ে উঠে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ইংরেজ বণিকদের সাথে ব্যবসা সংক্রান্ত কথাবার্তা বলার জন্য প্রথমে কিছু সংখ্যক বাঙালি ইংরেজি ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

ইংরেজ শাসন প্রবর্তনের ফলে এর প্রয়োজনীয়তা আরও বেড়ে যায়। প্রথমে ইংরেজরা এদেশীয় লোকদের ইংরেজি বা পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষার কোন ব্যবস্থা করেনি। কিন্তু খ্রিষ্টান মিশনারীরা ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলা ভাষা শিক্ষা করে এবং বাঙালিদেরকে ইংরেজি শিক্ষা দেওয়ার জন্য সচেষ্ট হয়।[৫২] ১৭৩১ খ্রিষ্টাব্দে সেন্ট অ্যানড্রুজ প্রেসবিটোরিয়ান চার্চ (St. Andrews presbyterian

---

[৪৯] অতুল চন্দ্র রায়, *ভারতের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড প্রাচীন যুগ, ১৭০৭-১৯৫০, কলিকাতা: মৌলিক লাইব্রেরি, ১৯৮১, পৃ. ৩০১।

[৫০] তপোন মোহন চট্টপাধ্যায়, *পলাশীর যুদ্ধ*, ২য় সংস্করণ কলকাতা, নাভানা-১৯৫৬, পৃ. ১৯৪।

[৫১] তপোন মোহন চট্টপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫।

[৫২] রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলার ইতিহাস*, কলিকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯২, ২য় খন্ড, মধ্যযুগ, পৃ. ১১৭।

Church) একটি অবৈতনিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করে।[৫৩] তারপর অনুরূপ আরও কয়েকটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করে ইংরেজি এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তাতে এ দেশের অনেক সম্ভ্রান্ত লোক ইংরেজি ভাষা শিখতেন। তাছাড়া সাধারণ অনেক মানুষ জীবিকা অর্জনের উপায় স্বরূপ ইংরেজি ভাষা শেখার চেষ্টা করত।[৫৪] ইউরোপীরা সর্বপ্রথম এ দেশে মুদ্রণযন্ত্রের প্রচলন করে এবং এর ফলেই বাংলা ভাষা সাহিত্যের কথা নববাংলার বার্তা সর্বত্র প্রসার লাভ করে। তাছাড়া অবিভক্ত ভারতে ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে হিকি (Hicky) সর্বপ্রথম 'বেঙ্গল গেজেট' নামে একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তারপর থেকে এ দেশে বিভিন্ন পত্রিকা প্রকাশ শুরু হয়। ১৭৮০-১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে শুধুমাত্র কলিকাতা থেকেই ছয়টি ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশিত হয়।[৫৫]

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ইউরোপীয়দের অবদান অপরিসীম। তাদের দীর্ঘ দিনের অবস্থান ও এদেশের মানুষের সাথে মেলামেশার কারণে তাদের ভাষার অনেক শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে। বাঙালিদের ব্যবহারের অনেক জিনিসপত্রও বাংলা ভাষায় ইংরেজি নামে পরিচিত হয়। যেমন- স্কুল, কলেজ, স্টীমার, পাশ, ফেল, ফুটবল, মাস্টার, ডাক্তার, হাসপাতাল, ভিজিট, ইউনিয়ন, রেকর্ড, নার্স, লাইব্রেরী, পেনসিল, চেয়ার, টেবিল, আদম, এ্যালবাট্রোস, অ্যাপেল, ব্যাকটিরিয়া, বাজার, কর্ণেল, কেটলি, কেরোসিন, শার্ট, প্যান্ট, টেলিভিশন, রেডিও, ফোন, অফিস, পেপার ইত্যাদি।

The East India Company was at first a trading rather than a ruling corporation. It was no business of theirs to educate the people they flueced for commercial purpose."[56]

একটি বাণিজ্যিক সংগঠন হিসাবে যাত্রা শুরু করলেও পরবর্তীতে রাজনৈতিক প্রভু হিসেবে এদেশের শাসন ভার গ্রহণ করে বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রথম ৫০ বছরে স্থানীয় অধিবাসীদের শিক্ষার প্রতি কোন দায়িত্ব না নিয়ে চরম উদাসীনতা প্রদর্শন করে। পরবর্তীতে কোম্পানী বৃটিশ পার্লামেন্টের চাপে সম্পূর্ণ নিজেদের সুবিধামত একটি শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও সে শিক্ষা ব্যবস্থা এদেশের শিক্ষা [illegible] ম হয়।

---

[৫৩] আব্দুল করিম, *বাংলার ইতিহাস*, মুসলিম বিজয় থেকে সিপাহী বিপ্লব পর্যন্ত, পৃ. ৩১৬-১৭।

[৫৪] রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলার ইতিহাস*, কলিকাতাঃ জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯২, ২য় খন্ড, মধ্যযুগ, পৃ. ১১৭।

[৫৫] অতুল চন্দ্র রায়, *ভারতের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড প্রাচীন যুগ, ১৭০৭-১৯৫০, কলিকাতাঃ মৌলিক লাইব্রেরি, ১৯৮১, পৃ. ৩০৩।

[৫৬] A.Mishra, *The Financing of Indian Education*, Bombay, 1967, p-174.

ঐতিহাসিক Ram Gopal এর মতে, কোম্পানী যখন বঙ্গে ক্ষমতা গ্রহণ করে তখন এখানে মোঘল আমলের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল, যা ছিল ধর্ম নির্ভর এবং অনেকাংশে বিদ্যা শিক্ষা শুধু জীবিকা নির্বাহের উপায় হিসেবে প্রদান করতে হত। পলাশী পূর্ব সময়ে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃপক্ষ ভারতগামী প্রতিটি বাণিজ্য জাহাজে কিছু সংখ্যক মিশনারীকে ভারতে আনতো। ১৬৫৯ সালে কোম্পানীর শাসন ব্যবস্থার একটি বিবরণীতে দেখা যায় যে এখানে শিক্ষা বিস্তারের সাথে মিশনারী কার্যক্রমের একটি সুযোগ আছে। ভারতবাসীকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করতে না পারলে এখানে ধর্ম প্রচার সম্ভব হবে না এটা মনে করেই মিশনারীরা শিক্ষা ব্যবস্থা রচনায় আগ্রহী হয়ে উঠেছিল এবং তারা কোম্পানীর পৃষ্ঠপোষকতায় Society for Promoting christian knowledge (SPCK) নামে একটি সংঘ গঠন করে।[৫৭]

কিন্তু প্রথমদিকে কোম্পানী মিশনারীদের কার্যক্রমে সহায়তা করলেও ১৭৫৭ সালের পর তারা আর স্থানীয় অধিবাসীদের শিক্ষিত করার কাজ কোনরূপ মাথায় নেয় নি। মূলত কয়েকটি কারণে:

১. পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা থেকে তারা বুঝতে পেরেছিল এদেশবাসী শিক্ষিত হলে সাম্রাজেবাদের বিরুদ্ধে সচেতন হবে।

২. ব্যয়ভার বৃদ্ধি পাবে।

পলাশী পরবর্তী কোম্পানীর শিক্ষা ব্যবস্থা:

১. ধর্ম নির্ভর বিচার ব্যবস্থা সহ বিভিন্ন প্রশাসনিক প্রয়োজনে তাদের এদেশীয় লোকবল দরকার ছিল, কিন্তু এখানকার প্রচলিত শিক্ষায় শিক্ষিত লোক কোম্পানীর প্রতি অনুগত নাও থাকতে পারে এ চিন্তা থেকেই তারা বৃটিশ শিক্ষা ব্যবস্থার আলোকে বাংলায় শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

২. তাদের এই শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণের কারণে ম্যাকলে ১৮৩৫ সালে তার ঐতিহাসিক মিনিটে বলেন "The purpose of education was to form a class who may be interpriters between us and the millions whom. We Govern, a class of persons, Indian's in blood and colour but English in tastes, in opinions, in morals and in intellect.

---

[৫৭] নলিনী ভূষণ দাশগুপ্ত, *ভারতের শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষা সমস্যা*, কলকাতা: ১৯৮৬, পৃ. ৪

তারা তাদের স্বার্থে এদেশে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে কারণ কোন বণিক প্রতিষ্ঠান লাভজনক না হলে বিনিয়োগ করে না।

প্রথমেই প্রাচ্য বিদ্যার পুনরুজ্জীবন ও ভাষার মাধ্যম নিয়ে কোম্পানীর সদস্যরা ২ ভাগে ভাগ হয়ে যায়। Warren Hasting, H.T. Prinsep. Dr. H.H wilson প্রমুখ ছিলেন প্রাচ্যপন্থী, G.E. Trevelyan, Bentink, Macauley প্রমুখ ছিলেন পাশ্চাত্যপন্থী।

প্রাচ্যবাদীদের মতে, কোনরূপ পরিবর্তন না করে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত করার কাজে অগ্রসর হলেই ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি হবে। ভাষা নিয়ে আঘাত করলে ইংরেজ বিদ্বেষ বেড়ে যেতে পারে। প্রাচ্যবাদীদের চেষ্টাতেই ১৭৮১ সালে কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় যাকে ঐতিহাসিক I.H. Qureshi, বর্ণনা করেছেন এভাবে “This won the only instance of patronage of Muslim learning under the rule of the company.” ১৮২৯ সালে এখানে Anglo persian Department কিন্তু পাশ্চাত্যবাদীরা ক্ষমতায় এসে এ বিষয়টি মেনে নেয়নি। তাদের মতে পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞানই যুগোপযোগী এবং ইংরেজী ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হলে অতি অল্প সময়ে ভারতবাসী পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত হয়ে ব্যবহারিক জীবনে উন্নতির দিকে দ্রুত এগিয়ে যেতে পারবে।[৫৮]

পরবর্তীতে ১৮১৩ সালের চার্টার আইনে শিক্ষাক্ষেত্রে এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হলে সেই টাকা কিভাবে শিক্ষার জন্য ব্যয় হবে এই আলোচনা প্রসঙ্গে ভাষা সম্পর্কে বিতর্ক আরো বৃদ্ধি পায় এই বিতর্ক আরো জোরদার হয় ১৮৩৩ সালের সনদ আইনে শিক্ষাখাতে টাকার পরিমাণ এক লক্ষের পরিবর্তে বাড়িয়ে দশ লক্ষ টাকা করা হলে। ১৮২৩ সালে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার কোম্পানীর অধিকারভূক্ত অঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থা দেখা শুনার জন্য General Committee of Public Instruction নামে একটি শিক্ষা সংস্থা গঠন করা হয়।

শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজীকে স্থাপন করার ক্ষেত্রে প্রথমত প্রস্তাব উত্থাপনকারী জন স্যুলিডানকে কেমলের পূর্বসূরী বলা যায়। তিনি ১৭৮৫ সালে দক্ষিণ ভারতের তাঞ্জোর অঞ্চলে তিনটি ইংরেজী

ীতির আরেকজন বড় স্বপ্ন

---

[৫৮] নলিনী ভূষণ দাশগুপ্ত, *ভারতের শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষা সমস্যা*, কলকাতা: ১৯৮৬, পৃ. ১৫।

[৫৯] নলিনী ভূষণ দাশগুপ্ত, *ভারতের শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষা সমস্যা*, কলকাতা: ১৯৮৬,পৃ. ৫।

দ্রষ্টা চার্লস গ্রান্ট ১৭৯২ সালে তার প্রকাশিত “observations” পত্রিকায় এদেশের পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের কথা বলেন।

ডেভিড হেয়ার School Book Socity এবং Calcutta School Society নামে দুটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন যা কলকাতা ও পার্শ্ববতী এলাকায় কিছু বিদ্যালয় স্থাপন করেছে।[৬০] এছাড়াও হেস্টিংস, বেন্টিংক Prinsep, Wilson, Macauly প্রভৃতি কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ নীতিনির্ধারক ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান :

কলকাতা মাদ্রাসা — ১৭৮১ সাল

সংস্কৃত কলেজ বানারসী — ১৭৯১ সাল

সংস্কৃত কলেজন পুনে: — ১৭৯১ সাল

ফোর্ট ইউলিয়াম কলেজ — ১৮০০ সাল

হিন্দু কলেজ — ১৮১৭ সাল

সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা — ১৮২১ সাল

কলকাতা মেডিকেল কলেজ — ১৮৩৬ সাল

হুগলী কলেজ — ১৮৩৬ সাল

ইনপেন্ট স্কুল — ১৮৩৯ সাল

কলকাতা গার্লস স্কুল — ১৮৪৯ সাল

কলকাতা, বোম্বে, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় — ১৮৫৭ সাল।

ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা এদশে যে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার ধারা প্রবর্তন করে তার মাধ্যমে পাশ্চাত্য মডেলে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা পায়, তার প্রভাব পড়ে এদেশের সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতিতে। এদেশের হিন্দু মুসলিম ২ শ্রেণীই বিভিন্ন ভাবে প্রভাবিত

---

[৬০] নলিনী ভূষণ দাশগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

হয়েছে। ঐতিহাসক Hafeez Malik এর মতে — রক্ষণশীল মুসলিম সম্প্রদায় তাদের আত্মমর্যাদা ও গোঁড়ামির কারণে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী ছিল না, কারণ তারা বৃটিশ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে তাদের ধর্ম ও ঐতিহ্যের পরিপন্থী মনে করত। ঐতিহাসিক Ram Gopal এর মতে, মুসলমানরা ভেবেছিল ইংরেজী ভাষা শিক্ষার প্রচলন এদেশে মিশনারী কার্যক্রম বিস্তারে সহায়তা করবে।[৬১]

১৮৩৭ সালে ইংরেজীকে দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হলে হিন্দুরা অধিক উপকৃত হয় তার কারণ মুসলমানদের স্থানে ইংরেজদের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া তাদের কাছে শাসক শ্রেণীর পরিবর্তন ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তাই তারা উদার ভাবেই বৃটিশদের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করেছিল। Sufia Ahmed এর মতে, The change of the official language was advantage to our Hindus who had by this time made great Progress in English educantion through the Hindu and Sanskrit colleges.

বৃটিশ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি হিন্দু মুসলিম বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছিল।

On April 1841			
Institution	**Hindu**	**Muslim**	**Others**
Hindu College	557	0	0
Medical College	51	3	25
Sanskrit College	123	0	0
Tribeny School	97	0	0
Dacca College	199	39	19
Chittagong College	94	6	8
Barisal College	41	0	4
Sylhet College	73	2	1

---

[৬১] Indian Muslims : A political study 1858-1747, p.20.

সূত্রঃ A.R. Mallick, British policy and muslim in Bengal, 9.137

তবে ১৮৩৭, ১৮৪৪ সালের পরিবর্তনগুলো তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করেনি, এটির ক্ষতিকর প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারী, ১৮৫০/৬০ এর দশকে এসে দেখা যায় অনেক Traditional শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমান পরিবারের সন্তানেরা অশিক্ষিত থেকে গেছে, কলকাতা মাদ্রাসার সহকারী অধ্যাপক A. Blochman ১৮৭১ সালে কলকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ J. Suteliffe কে একটি পত্রে লেখেন — "I have invariably met with most educated fathers and most illiterate youths."[62]

তবে বৃটিশ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ ভাবে মুসলমানদের ক্ষতিগ্রস্থ করলেও পরোক্ষভাবে উপকৃত করেছে। কারণ এই পরিবর্তন না আসলে মুসলমানরা হয়তো আরো অনেক পরে আধুনিক শিক্ষায় সংস্পর্শে আসতো যা তাদের জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষকেও পিছিয়ে দিত। তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এদেশে জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার জন্ম দিয়েছে। Vidya Dhar Mahajan এর মতে, The English language played an important part in the growth of nationalsim in the country.[63]

বৃটিশ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে মুসলমানরা যেখানে গোঁড়ামির পরিচয় দিয়েছে হিন্দুরা সেখানে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছে। Latifa Akanda এর মতে, "They cultivated English as the language of commerce before it was recognised as the language of Government. In short the changes which were recieved by the Muslims with alarm, were readily accepted by the hindus from the earliest days of the company.[64]

কোম্পানির শিক্ষা ব্যবস্থা এদেশীয়দের একেবারেই ধ্বংস করে দিয়েছে একথা সর্বত্রভাবে সঠিক নয়। [illegible]ণ যারা ইংরেজী একেবারে জানতো না তারাও ইচ্ছে করলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে পারতো, উনিশ শতকের মুসলমানদের যে জাগরণ সৃষ্টি হয় তার পিছনে যে চেতনা অনুঘটক হিসাবে কাজ করেছে তা এই

---

[৬২] Amrita Bazar Patrika, 30 December, 1875
[৬৩] The Nationalist movement in India New Delhi : 1975, p. 8
[৬৪] Social history of muslims in Bengal, p.127

দেশীয় শিক্ষার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের ইতিবাচক নেতিবাচক ধারণা স্বত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে বৃটিশ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা এদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি অবকাঠামো তৈরি করে দিয়েছে। তবে এই অবকাঠামোতে নিয়ন্ত্রণ ইংরেজী ভাষায় যে প্রাধান্য তৈরি হল তাতে ভয় পেয়ে যারা দূরে থাকল তারা দূরেই থেকে গেল।

৭.৫ ধর্মীয় ক্ষেত্রে প্রভাব

সুচতুর ইংরেজরা ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভের পর প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন এবং ব্যবসায়িক স্বার্থে এদেশে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারে বিরোধিতা করে। নববিজিত রাজ্যে হিন্দু ও মুসলিম ধর্ম এবং সংস্কৃতিতে যাতে আঘাত না লাগে সে জন্যই প্রথমে তারা এর বিরোধিতা করেছিল। পরবর্তীতে তারা এ মনোভাব পরিত্যাগ করে। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ আইনে কোম্পানী এদেশে খ্রিষ্টান মিশনারীদের খ্রিষ্টধর্ম প্রচারে অনুমতি দেয়। তবে তারও কিছুকাল পূর্বে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর অঞ্চলে দিনেমার উপনিবেশের ছত্রছায়ায় ড. উইলিয়ম কেরী ও মার্শম্যান প্রমূখের প্রচেষ্টায় খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের উদ্যোগ শুরু হয়।[৬৫]

ইংলিশ ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে খ্রিষ্টান ধর্মপ্রচারকগণ ধর্ম প্রচারে নানা বাঁধাবিপত্তির সম্মুখীন হলেও কোম্পানীর শাসনামলে তা দূরীভূত হয়। বাংলায় ধর্মাচরণেরও একটি পরিবর্তন দেখা দেয়। ক্রমে মানুষের অনুষ্ঠান-সর্বস্ব ধর্মে বিশ্বাস চলে আসে। ধর্ম সম্বন্ধে যে দু'টি ধারণা এতদিন ধরে মানুষের মনে শিকড় গেড়েছিল, তাও শিথিল হয়ে যায়। এতদিন তাদের বিশ্বাস ছিল ধর্ম কোন লৌকিক ব্যাপার নয়। তাই ধর্ম লাভ করতে হলে সংসারধর্ম ত্যাগ করা চাই। মানুষের সে বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করে। তারা মনে করতে শিখে সংসারেই মানুষের জন্ম। সেই সংসার ত্যাগ মানুষের ধর্ম হতে পারে না। মানুষের কল্যাণকর কার্যের অনুষ্ঠানই ধর্মাচরণ।[৬৬] খ্রিষ্টান মিশনারীদের খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের ফলে এ দেশের মানুষের নীতিবোধ ও কর্মের দ্বায়িত্বজ্ঞান লাভ করে। এ জন্মায় যে, যেখানে মনুষ্য সমাজের স্বার্থ সেখানেই দেশের স্বার্থ এবং যেখানে দেশের স্বার্থ সেখানেই আমার নিজের স্বার্থ। এ দেশের লোকদের ইংরেজি শিক্ষা লাভের আগ্রহ দেখে খ্রিস্টান ধর্মযাজকরা কয়েকটি স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠা করে। তাদের স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ছিল এদেশীয় লোকদের খ্রিষ্টধর্মের প্রতি

---

[৬৫] প্রদীপ্ত রঞ্জন রায়, *নদীয়া জেলার খ্রীস্টান শিমনারীদের অবদান ও বর্তমান অবস্থা (ঐতিহসাকি পর্যালোচনা)*, ইতিহাস অনুসন্ধান-৯, সম্পা. আবদুল ওহাব মাহমুদ (কলিকাতা : কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৯৪), পৃ. ৫৯৯।

[৬৬] তপন মোহন চট্টোপাধ্যায়, *পলাশীর যুদ্ধ*, দ্বিতীয় সং, (কলকাতা : নাভানা, ১৯৫৬), পৃ. ১৯৬।

আকৃষ্ট করা।[৬৭] বাংলা তথা ভারতবর্ষে খ্রিস্টান মিশনারীদের সকল কার্যাবলীর একমাত্র লক্ষ্য ছিল খ্রিস্টধর্ম প্রচার ও এদেশীয়দের খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরিতকরণ।[৬৮]

খ্রিষ্টধর্ম প্রচার ও এদেশীয়দের খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরিতকরণের মাধ্যম ছিল শিক্ষা। তবে আধুনিক শিক্ষা সম্ভ্রান্ত বাঙালিদেরকে আকর্ষণ করলেও মিশনারীদের ধর্ম শিক্ষা ও ধর্মান্তরকরণের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি বাঙালিরা ভাল চোখে দেখেনি। তাই খ্রিস্টানদের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য তারা সমাজের অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষদের কাছে আত্মনিয়োগ করে।[৬৯] তারা প্রাথমিক শিক্ষার উপর জোর দেয়। শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে তারা মাতৃভাষা বেছে নেয়। শ্রেণীকক্ষে ধর্মশিক্ষা তথা বাইবেল ও নীতিশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। মুখে-মুখে আলোচনা এবং গল্পের ছলে বারবার দ্রুতপঠনের মাধ্যমে খ্রিষ্টীয় বিশ্বাস ছাত্রদের মধ্যে গাঁথতে থাকে।[৭০] এভাবে তারা এতদঞ্চলে খ্রিস্টধর্মের প্রসার ঘটায়।

---

[৬৭] বিনয় ঘোষ, সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র, পঞ্চম খণ্ড, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-২ (কলিকাতা : প্যাপিরাস, ১৯৬৩), পৃ. ২৫৯।

[৬৮] নিবেদিতা ভট্টাচার্য, *শ্রীরামপুর মিশনারী ও ভারতীয় নারী শিক্ষা*, ইতিহাস, অনুসন্ধান-৯, সম্পা, আবদুল ওহাব মাহমুদ (কলিকাতা : কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৯৪), পৃ. ৩০১।

[৬৯] প্রদীপ্ত রঞ্জন রায়, *নদীয়া জেলার খ্রীস্টান শিমনারীদের অবদান ও বর্তমান অবস্থা (ঐতিহসাকি পর্যালোচনা)*, ইতিহাস অনুসন্ধান-৯, সম্পা. আবদুল ওহাব মাহমুদ (কলিকাতা : কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৯৪), পৃ. ৬০৫।

[৭০] প্রদীপ্ত রঞ্জন রায়, *নদীয়া জেলার খ্রীস্টান শিমনারীদের অবদান ও বর্তমান অবস্থা (ঐতিহসাকি পর্যালোচনা)*, ইতিহাস অনুসন্ধান-৯, সম্পা. আবদুল ওহাব মাহমুদ (কলিকাতা : কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৯৪), পৃ. ৬০৫।

অষ্টম অধ্যায়

উপসংহার

উপসংহার

সুপ্রাচীনকাল থেকে বাংলা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার একটি উর্বর ভূমি ক্ষেত্র। প্রতিষ্ঠা লাভের আশায় এবং ধন-সম্পদের মোহে প্রাচীন ও মধ্যযুগে অনেক বিদেশি শক্তি এদেশে এসেছে। যদি স্বাধীনভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পেতো, তাহলে এসব বিদেশি শক্তির পক্ষে এখানে একাধিক জাতি-রাষ্ট্র গঠনের যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। ভাষা, রক্ত-সম্বন্ধ ইতিহাস-ঐতিহ্য, ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় ভারতের অন্য এলাকার চেয়ে বাংলায় জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের সম্ভাবনা ছিল সবচেয়ে উজ্জ্বল। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার উর্বর ভূমিক্ষেত্রে এই বাংলায় ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজদের সপ্তদশ শতাব্দী ওলন্দাজদের, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দী ইংরেজদের একচ্ছত্র আধিপত্য। ইউরোপীয়দের আগমনের পূর্বে দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বাণিজ্যিক নিয়ন্ত্রণ ছিল আরব, পারসিক ও গুজরাটি বণিকদের হাতে। মধ্যযুগের শেষদিকে ইউরোপে রেনেসাঁর কারণে তাদের জীবন ব্যবস্থা বিলাসবহুল হয়ে পড়ে। আর বিলাসবহুল জীবন পরিচালনার একটি কাঙ্ক্ষিত দ্রব্য ছিল মসলা। এই মসলা বাণিজ্যকে কেন্দ্র করেই ইউরোপিয় বণিক গোষ্ঠী বাণিজ্যের মুখোশ পরে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় আগমণ করে।

তখনকার সময়ে এশিয়ার দেশসমূহ এবং ইউরোপের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনকারী পশ্চিম এশিয়া ও মধ্য এশিয়ার স্থলপথে মুসলমানদের আধিপত্য ছিল। ফলে শুরু হয় বিকল্প পথের সন্ধান। এ থেকেই আবিষ্কৃত হয় নতুন জলপথ। ইউরোপের সাহসী নাবিকেরা মসলা দ্বীপের সন্ধানে সমুদ্র পথে বেরিয়ে পড়ে। আর এ সুযোগ সবচেয়ে বেশি পায় পর্তুগীজ ও স্পেনীয়রা। কারণ এ দুটো ছিল আটলান্টিক মাহসাগরীয় দেশ। পর্তুগীজরা চেষ্টা করে আফ্রিকা ঘুরে ভারতবর্ষে আসার আর স্পেনীয়রা চেষ্টা করে পশ্চিমদিকের দেশগুলোতে বিজয় অভিযানের। পর্তুগীজরাই ছিল ভৌগোলিক আবিষ্কারের অগ্রদূত। তারাই প্রথম আফ্রিকা ও এশিয়ার বাণিজ্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। ১৪৮৭ খ্রিঃ বারথোলোমিউ দিয়াজ নামে এক পর্তুগীজ নাবিক আফ্রিকার দক্ষিণে এক অন্তরীপে হাজির হন। সেখানে তিনি ঝড়ের মুখে পড়েন বলে এর নাম দেন ঝড়ের অন্তরীপ। পর্তুগালের রাজা ২য় জন এর নাম দেন “উত্তমাশা অন্তরীপ” কারণ তার মতে এ অন্তরীপ দিয়েই একদিন ভারত মহাসাগরের দ্বীপগুলোতে পৌছানো সম্ভব। এ পথ ধরেই আরেক পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা ১৪৯৮ খ্রিঃ ২৭ মে ভারতের পশ্চিম উপকূলে কালিকটে সরাসরি ভারত আসার জলপথ আবিষ্কৃত হয়। পর্তুগিজদের দ্বারা এ নতুন জলপথ আবিষ্কার বিশ্বের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। এই পথ ধরে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরেজ,

ফরাসি, দিনেমারসহ বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতি ভারতবর্ষ এবং প্রাচ্যের অন্যান্য, দেশে আগমন করে। ইউরোপীয় বণিকগোষ্ঠীর মধ্যে এশীয় বাণিজ্যে ইংরেজদের আগমন ঘটে পর্তুগীজ ও ওলন্দাজদের সবার পরে। পর্তুগীজ ও ওলন্দাজদের বাণিজ্যিক সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে ইংরেজদের বাণিজ্যিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য আগমন করে। প্রথমদিকে ইংল্যান্ডের বণিকরা ব্যক্তিগতভাবে প্রাচ্যের বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করতে আসে কিন্তু পর্তুগিজরা বাঁধার সৃষ্টি করে। এরপর ইংরেজরা সম্মিলিতভাবে প্রাচ্যের বাণিজ্যে অংশগ্রহণের পরিকল্পনা করে রানী এলিজাবেথের কাছে প্রাচ্য বাণিজ্য পরিচালনায় অনুমতি প্রার্থনা করে। ১৫৯৯ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর ৮০ জন অংশীদার নিয়ে সর্বপ্রথম ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয়। রানী এলিজাবেথ ১৬০০ খ্রিঃ ৩১ ডিসেম্বর “The Governor and Company of Merchants of London Trading into the East Indies” নামে বণিক কোম্পানীকে প্রাচ্যের সকল দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের রাজনকীয় সনদ প্রদান করেন। সনদ প্রাপ্তীর পর এটা “English East India Company” নামে পরিচিতি লাভ করে।

১৬৫১ সালে শাহ-সুজার কাছ থেকে জেমস ব্রিজম্যান প্রথম নিশান আদায় করেছিলেন ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর জন্য। এর বছর খানেক আগে মুঘল সম্রাট শাহজাহানের কাছ থেকে ইংরেজরা যে ফরমান পেয়েছিলেন তার ভিত্তিতেই এই নিশান দেয়া হয়। এই ফরমানের মূল উদ্দেশ্য ছিল অযোধ্যা, আগ্রা, প্রভৃতি অঞ্চল থেকে সংগৃহীত যেসব পণ্য পশ্চিম উপকূলীয় বন্দরগুলিতে রপ্তানির জন্য পাঠানো হতো সেগুলিকে রাহাদারি বা পথকর থেকে রেহায় দেয়া। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর থেকে সিংহাসন ও অন্যান্য উচ্চপদ নিয়ে বিবাদ ও গৃহযুদ্ধ ছিল নিত্যনৈমেত্তিক ব্যাপার। এ সুযোগে কোম্পানী সরকারকে নানারকম পেশকাশ প্রদান করে অনেক সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নেয়। ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আধিপত্য বিস্তারের গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো ১৭১৭ সালে ফররুখশিয়ার ফরমান দ্বারা বিনা শুল্কে অবাধে বাণিজ্য বিস্তার। এর মাধ্যমে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলায় তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে, রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে ভবিষৎ সাম্রাজ্য স্থাপনের পথ উন্মুক্ত করার প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু নবাব মুর্শিদকুলী খান (১৭২৩-২৭) অত্যন্ত বিচক্ষণ হওয়ায় তাদের এই অবাধ বাণিজ্য কার্যকর করতে অস্বীকৃতি জানায়। পরবর্তীতে সুবাদার সুজাউদ্দৌলা খান (১৭২৭-৩৯) ও আলীবর্দী খান (১৭৪০-৫৬) তার অনুসৃত নীতি চালু রাখেন। এভাবে প্রত্যেক সুবাদার অতি কৌশলে কোম্পানীর সঙ্গে দ্বন্দ্ব এড়িয়ে চলেন। কিন্তু নবাব আলীবর্দী খানের মৃত্যুর পর ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পুনরায় আধিপত্য স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু করে। ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের মাধ্যমে নবাবী

শাসনের অবসান ঘটে এবং সূচনা হয় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের। অন্যদিকে ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে বাংলায় ওলন্দাজদের শক্তি হ্রাস পায় এবং ১৭৫৯ খ্রিঃ সংঘটিত বিদারার যুদ্ধে ইংরেজদের নিকট ওলন্দাজরা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়ে মালয় দ্বীপপুঞ্জে চলে যায়। ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এভাবে সমগ্র ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে উঠার সুযোগ পায়।

ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল ব্যবসা সম্প্রসারণ ও মুনাফা অর্জন। এজন্য তারা ক্রমে ক্রমে বাণিজ্যের প্রসার ঘটায় এবং ১৬৫১ সালে বিখ্যাত হুগলী বন্দরে ইংরেজ বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের মধ্য দিয়ে বাংলা বাণিজ্যে ইংরেজ কোম্পানী সরাসরি প্রবেশ করে। ভারতের তিনটি এলাকাকে কেন্দ্র করে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য চলছিল। এলাকা তিনটি হয়ো বাংলা, বোম্বে ও মাদ্রাজ। ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসা পরিচালনার প্রশাসনিক এলাকার নাম ছিল প্রেসিডেন্সি। প্রেসিডেন্সির প্রধান কর্মকর্তার পদবী ছিল গভর্ণর। ১৭৬৫ সালের সুবে বাংলার (বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা) দিউরানি লাভের মাধ্যমে কোম্পানি রাজ্য পরিচালনার যাত্রা শুরু। কিন্তু ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক প্রশাসনিক কাঠামো দ্বারা রাজ্য পরিচালনা সম্ভব ছিল না, উপরন্তু রাজ্য পরিচালনার কোন আইনসম্মত অনুমতিও ছিল না এ দুটি বাঁধা দূর করার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ১৭৭৩ সালে রেগুলেটিং এ্যাক্ট নামে একটি পাশ করে। এ আইনের আওতার বোম্বে ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি দুটোকে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভূক্ত করা হয়। কলকাতাকে করা হয় ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী। এভাবে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সূচনা ঘটে বাংলা ভূ-খন্ডে এবং তখন বাংলার গভর্ণর হন একই সঙ্গে বাংলা, বোম্বে ও মাদ্রাজ নিয়ে গঠিত ব্রিটিশ ভারতের গভর্ণর জেনারেল।

রাজনৈতিক অপরিপক্কতা, দেশীয় বণিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য স্থানীয় কোন বণিক সংস্থা না থাকা, নৌজাহাজ শিল্পে বাংলার রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক ও বণিকদের দূর্বলতা, ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য তৈরী ফরমান ব্যক্তিগত বাণিজ্যিক স্বার্থে ব্যবহার প্রভৃতি কারণেই মূলতঃ ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলার সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্যিক নীতিগুলোকে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিভক্ত করেছেন। যেমন: প্রাক পলাশী বাণিজ্যনীতি ও পলাশী পরবর্তী বাণিজ্যনীতি। প্রাক পলাশী বাণিজ্যনীতিতে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী শুল্ক ফাঁকি দিয়ে ব্যবসা করে একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার লাভ করে। পুঁজি বৃদ্ধির লক্ষ্যে তারা ফরমান ও দস্তকের অপব্যবহারের মাধ্যমে কর ফাঁকি দিয়ে বাংলা থেকে পুঁজি সংগ্রহ করে। ১৭৫২ সালের তালিকা অনুযায়ী ৫৬ লক্ষ টাকা পন্য তারা বাংলা থেকে সংগ্রহ করে ৫০ বছরের মধ্যে রপ্তানির পরিমাণ হয় ১ কোটি টাকার ও

বেশী। ১৭৫১ সালের বাণিজ্যের বিনিয়োগ ৩৪ লক্ষ, ১৭৯২ সালে হয় ১ কোটি ৯ লক্ষ। ১৭৬৬ সালে আমদানী করেছে ৬ লক্ষ পাউন্ড আর রপ্তানী করেছে ৬০ লক্ষ পাউন্ড। পলাশীর পূর্বে তারা একচেটিয়া বাণিজ্যিক আধিপত্য লাভের জন্য বাঙলায় বসবাসরত অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

এছাড়া পলাশীর পূর্বে তারা সুদ প্রদান ও দূর্নীতির মাধ্যমে দেশীয় পুঁজিপতি শ্রেণীকে নিজেদের আওতায় এনে উৎপাদিত পণ্য সমূহের উপর একচেটিয়া প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে। প্রাক পলাশী বাণিজ্য নীতিতে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় এদেশের ভূমি কেন্দ্রিক অর্থ ব্যবস্থায় ভূমির উপর নিয়ন্ত্রণ লাভের নীতি গ্রহণ করে ১৬৯৮ সালে সুতানটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতা নামক তিনটি গ্রামের জমিদারী লাভ করে যা ১৭৬৫ সালের দেওয়ানী লাভের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য করা হয়। অন্যদিকে পলাশী উত্তর বাণিজ্যনীতিতে লক্ষ্য করা যায়, ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বানিজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে রাজনৈতিক আধিপত্যবাদের দিকে নজর দেয়। তাদের এই আধিপত্যবাদের পরিণয় ঘটে বাংলা থেকে সমগ্র ভারতে এবং ভারত থেকে সমগ্র ভারত মহাসাগরীয় এলাকায় প্রতিষ্ঠা পায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য। এসময় ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রধান মনোযোগ আকর্ষণ করে ভূমি অর্থাৎ এসময় তারা একটি কার্যকর ভূ-সম্পত্তি নীতির প্রণয়ন প্রধান উদ্দেশ্য করে কার্যক্রম শুরু করে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে বাংলার ভূমি ও ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন এ পর্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক ঘটনা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যে সুফলগুলি কর্ণওয়ালিশ আশা করেছিলেন তার অনেকগুলিই অপূর্ণ রয়ে যায়। প্রথমদিকে সরকারি ভূমিরাজস্বের দাবী অত্যাধিক বেশি হওয়ায় এবং সুদের হার বাড়তে থাকায় জমিদারির দাম নামতে থাকে। ১৭৯৭-৯৮ তে জমিদারির দাম দাঁড়ায় দেয় ভূমি রাজস্বের মাত্র ৯ $\frac{১}{২}$ গুণ। এসময় থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও সুদের হার নামতে থাকায় জমিদারির দাম বাড়তে শুরু করে। গ্রামবাংলায় জমিদার-কৃষকের সম্পর্কে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছিল। সরকারি রাজস্ব আদায়ে কড়াকড়ি জমিদার-রায়তের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হয়। ১৭৯৯-এর ৭নং রেগুলেশনে জমিদারের হাতে বাকী খাজনার দায়ে রায়তের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করার অধীকার দেওয়া হয়। পলাশী পরবর্তী সময়ে বাংলার অর্থনীতি ক্রমশ ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে (colonial economy) রুপান্তরিত হতে শুরু করে। ইংলান্ডের জাতীয় অর্থনীতির স্বার্থে বাংলার অর্থনৈতিক কাঠামোয় পরিবর্তন শুরু হয়। দেওয়ানি থেকে বাংলার রপ্তানি পণ্যে ইংল্যাণ্ডের সরকার ও ডিরেক্টর সভা রাজস্ব নিতে (tribute) শুরু করে দেয়।

ইংল্যান্ডের অর্থনীতির স্বার্থে এদেশ থেকে একে একে রেশমবস্ত্র, সুতা, মাঝারি ও মোটা কাপড় রপ্তানি বন্ধ হয়। আবার ইংল্যাণ্ডের বস্ত্র শিল্পের প্রয়োজনে এদেশ থেকে নীল ও তুলা রপ্তানি শুরু করা হয়। তেমনি পাট, শণ, তৈলবীজ প্রভৃতি ইংল্যাণ্ডের শিল্পের ব্যবহার করা জন্য চেষ্টা চলতে থাকে। অর্থাৎ এদেশের উৎপন্ন ইংল্যাণ্ডের শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহের পর্ব শুরু হয়ে যায়। বাংলার কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ এরই ফলশ্রুতি। বাংলার কৃষকরা খাদ্যশস্য উৎপাদন কমিয়ে বাজারে চাহিদা অনুযায়ী নতুন নতুন কৃষিপণ্য উৎপাদনে আগ্রহী হয়। এগুলি হল তৈলবীজ, পাট, শন, বাদাম, আখ, তামাক, আফিম, নীল, তুলা প্রভৃতি।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার অর্থনৈতিক জীবনের অপর উল্লেখ্যযোগ্য দিক হল ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসা ও কোম্পানীর কর্মচারী ও স্বাধীন বণিকদের বাণিজ্য স্বার্থের মধ্যে সমঝোতা ও আপস। কোম্পানী কতকগুলি পণ্যে-সোরা, আফিম ও লবণ—একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করেছিল। তাছাড়া ইউরোপীয় বাণিজ্য ছিল কোম্পানীর একচেটিয়া। অপরদিকে সিল্ক, চিনি ও নীলে বৃটিশ পুঁজি ক্রমশ কার্যকরী ভূমিকা নিতে শুরু করে। কিছুকালের জন্যে চুণ ও সুপারির ব্যবসা এদের হস্তগত হয়। বাংলায় এশীয় বাণিজ্য এদের হাতে চলে যায়। সারা শতকে কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য স্বার্থ ও বৃটিশ বণিকদের বাণিজ্যস্বার্থের মধ্যে সংঘাত ছিল তবে এ দুটি বাণিজ্যস্বার্থের মধ্যে দ্বন্দ্ব বা সংঘাত কখনো মারাত্মক রূপ নেয়নি। ১৭৯৩ এর চার্টার এ্যাক্ট বৃটিশ বণিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে বৃটিশ ও ইউরোপীয় বাণিজ্যের দুয়ার সীমিতভাবে তাদের জন্যে খুলে দেওয়া হয়। কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার ও বৃটিশ বণিকদের স্বাধীন বাণিজ্যের দাবী নিয়ে দ্বন্দ্ব শেষ হল ১৮১৩ সনে যখন কোম্পানির একচেটিয়া অধিকারের অবলুপ্তি ঘটে।

ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭০-১৭৮৫) ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে প্রথমে সমান অংশীদার এবং পরে অত্যন্ত প্রভাবশালী অংশীদারে পরিণত করে কোম্পানীর অবস্থানকে উন্নীত করেন। লর্ড কর্ণওয়ালিশ (১৭৮৬-৯৩) আরও এক ধাপ এগিয়ে যান। তার সময়ে নানাবিধ পরীক্ষা-নীরিক্ষার পর প্রণীত হলো ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। এই বন্দোবস্তের বহুবিধ উদ্দেশ্যের অন্যতম ছিল প্রথমত: এর মাধ্যমে সরকারের প্রয়োজনে অধিক মাত্রায় রাজস্ব আয় নিশ্চিত করা, দ্বিতীয়ত: একটি জমিদার শ্রেণী গড়ে তোলা, যারা জমির প্রকৃত মালিকরূপে গণ্য হবে এবং তারা রাষ্ট্র ও কৃষকের মধ্যবর্তী হিসেবে জমি থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব সংগ্রহ করে রাষ্ট্রকে নিয়মিত ভাবে প্রদান করবে। তৃতীয়ত: এর মাধ্যমে একটি সরকার সহায়ক শ্রেণী গড়ে উঠবে, যারা হবে এদেশে ইংরেজ সরকারের

অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শক্তির ভিত্তি। চতুর্থত: এদেশীয়দের হাতে যে বিরাট পুঁজি আছে তা অন্য কোনোভাবে বিনিয়োগ না করে ভূ-সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য ব্যয় করবে। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, লর্ড কর্ণওয়ালিস কর্তৃক প্রর্বতিত ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে বাংলার সাধারণ জনগণ কোন ভাবে উপকৃত হয় নি। ১৮১৩ সালে সনদ আইনের নবায়নের সময় ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর চা ব্যবসায় একচেটিয়া অধিকার অব্যাহত থাকে। ১৮৩৩ সালের সনদ আইনের মাধ্যমে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্যিক ক্ষমতা বিলোপ করে সম্পূর্ণভাবে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রদান করা হয়। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, ব্রিটিশ সরকার এখানে প্রত্যক্ষ শাসন প্রতিষ্ঠা না করে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মাধ্যমে পরোক্ষ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা করে। এ ব্যবস্থা চলে প্রায় একশ বছর। এই একশ বছর ধরে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক শাসনের মূল লক্ষ্য ছিল শোষণ উপযোগী শাসন ব্যবস্থা প্রণয়ন করা। ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী শাসনে বাংলায় সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে।

ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য নীতির ফলে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তো ব্যাখ্যা করতে গেলে দেখা যায় যে, এই বাণিজ্যিক নীতির ফলে প্রথম দু-দশকে দায়িত্বহীন দুঃশাসন, অভাবনীয় অরাজকতা, শোষনমুখী রাজস্বনীতি, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, সম্পদ পাচার, দূর্ভিক্ষ ও মৃত্যুর মর্মন্তুদ পরিবেশ উপলব্ধি করা যায়। এতে ভাগ্যক্রমে অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকা বাংলার জনসাধারণের পক্ষে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর এই বাণিজ্য নীতিকে ইতিবাচক কোন পদক্ষেপ হিসেবে গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। এরপর কর্নওয়ালিস থেকে বেন্টিংকের আগমন পর্যন্ত নতুন ভূমিব্যবস্থা প্রবর্তিত হবার ফলে ঘটে নতুন শাসন ও বিচারব্যবস্থা, পুরাতন মূল্যবোধ, প্রতিষ্ঠানে যে আমূল পরিবর্তন আনে এবং তাদের একচ্ছত্র আধিপত্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ভাঙ্গাগড়া ও অনিশ্চয়তার সুযোগে চোর, ডাকাত, দস্যুও অন্যান্য সামাজিক দুবৃত্তরা গ্রামাঞ্চলে যে প্রাকৃতিক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে তাতে বাংলার সকল শ্রেণীর জনগণ এই ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য নীতির প্রতি অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। অবাধ বাণিজ্য নীতির ফলে ব্রিটেনের কলকারখানায় সস্তা পণ্য এসে স্থানীয় শিল্পের সমাধি রচনা করে, সরকারের প্রশয়ে নীলকরেরা গ্রামাঞ্চলে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। এ নীতির কারণে বাংলার কৃষিজাত ও শিল্প জাত পণ্যের রপ্তানীর বাজার, উৎপাদনের পরিমাণ বাড়লেও উৎপাদন প্রযুক্তি ও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কোন পরিবর্তন ঘটেনি। তার প্রমাণ পাওয়া যায় বাংলায় উৎপাদিত প্রধান দুটি পণ্য সুতী বস্ত্র ও রেশম উৎপাদন ও

রপ্তানীর পরিমাপ করলে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কৃষির পরেই অর্থনীতির প্রধান স্থান ছিল বাংলার সুতী বস্ত্রের। বাংলার তাঁতীরা মলমল, তানজীরসহ আঠার রকমের বিভিন্ন রেশম ও সুতীবস্ত্র উৎপাদন করতো। কোম্পানীর বাণিজ্যে এজেন্সী ব্যবস্থায় বস্ত্র শিল্প সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়াভাবে নিয়ন্ত্রিত তাঁতশিল্প ও লবণ শিল্পে নিয়োজিত লক্ষ লক্ষ লোক ছিলো কোম্পানীর মুনাফানীতির শিকার। কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ তাঁতীরা ছিল প্রায় বন্দীশ্রমিক। কোম্পানীর বাণিজ্যে এজেন্সী ব্যবস্থায় বস্ত্র শিল্প সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। পলাশী যুদ্ধ এবং ১৭৭০ সালের মনন্তর বাংলার তাঁত শিল্প ধ্বংস করে দেয়। সস্তা দামে কোম্পানী তাঁত বস্ত্র ক্রয়, তাঁতীদের মৃত্যু এবং শতাব্দীর শেষ প্রান্তে বস্ত্র রপ্তানী বন্ধ করে কোম্পানী ইংল্যান্ডের শিল্প জাত বস্ত্র ও পন্য আমদানী শুরু করলে ক্রমেই বাংলার তাঁত শিল্প ধ্বংস হয়ে যায়।

ইংল্যান্ডের ডিরেক্টর সভায় বাংলা থেকে বস্ত্র রপ্তানী বন্ধের আদেশ দেয়। ১৭৯০ সালে বাংলা থেকে বস্ত্র রপ্তানি বন্ধ হয়ে যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলায় উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে অন্যতম ছিল কাঁচা রেশম। বাংলায় প্রচলিত প্রক্রিয়ায় রেশম উৎপাদন ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তাদের কারখানার চাহিদা অনুসারে রেশম চাষের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটায়। রেশম উৎপাদন ও বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে কোম্পানীর বাণিজ্য সম্প্রসারণ হয়েছিল ১৮৩২ সাল পর্যন্ত। পরবর্তীকালে এই উৎপাদন প্রক্রিয়াটিও হ্রাস পায়। এর প্রভাবে পরে রেশম গুটি উৎপাদনকারী ও রেশম কারীগর ও সওদাগরদের উপর। ১৭৯০ সালে শুরু হওয়া নীল চাষ বাংলার অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে রেশমের স্থান দখল করে নেয়। বাংলায় উক্ত দুটি পণ্য উৎপাদন ও সম্প্রসারণের ফলে সবচেয়ে লাভবান হয়েছিল কোম্পানীর বণিক গোষ্ঠী। ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক বয়ন শিল্প ও রেশম উৎপাদন প্রক্রিয়াই নিরস্কুশ নিয়ন্ত্রণ বাংলা বাণিজ্যে কোম্পানীকে প্রতিষ্ঠিত হতে ছিল সহায়ক। অন্যদিকে বাংলার উৎপাদক ও সওদাগর শ্রেণীর জন্য লোকসানের দিক। আর বাংলার সামগ্রিক অর্থনীতির জন্য এর ফল ছিল আরও সুদূর প্রসারী। বাংলায় কোম্পানীর অনুসৃত বাণিজ্যিক নীতির ফলে বাংলার অর্থনীতি ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হয়। যার প্রকৃতি ও গঠন কোম্পানীর আমদানী-রপ্তানীর উপর নির্ভরশীল ছিল। কোম্পানীর অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা ও স্বার্থের উপর নির্ভরশীল কোম্পানী বাণিজ্যের ফলে বাংলার অভ্যন্তরীণ অন্তর্দেশীয়, উপকূলীয় বাণিজ্যে স্থানীয় বণিকদের পতন ঘটে বাণিজ্য হয়ে পড়ে একচেটিয়াভাবে ইংরেজ কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণে। দেশী বণিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য স্থানীয় কোন বণিক সংস্থা না থাকা, রাষ্ট্রের প্রশাসনিক নির্দিষ্ট বাণিজ্য নীতির অনুপস্থিতি, নৌজাহাজ শিল্পে বাংলার রাষ্ট্রীয়

প্রশাসন ও বণিকদের দুর্বলতা, সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপীয় আক্রমনশীল ও অধিক সুসংগঠিত ইংরেজ বণিকদের অধিপত্য বিস্তারের মুখে দেশীয় বণিকদের টিকে থাকা ছিল অসম্ভব।

বাংলায় ইংরেজ কোম্পানী বাণিজ্যে দেশের স্থানীয় শিল্প বাণিজ্য যেমন পর্যদুস্ত হয়েছিল ঠিক তেমনি সামগ্রিকভাবে অর্থনীতিতে এ প্রভাব ছিল আরো সুদূর প্রসারী। গ্রামীণ অর্থনীতিতে মারাত্মক বিপর্যয় ঘটে। বণিক গোষ্ঠী থেকে বাংলায় কোম্পানী রাজস্ব ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ, বাংলায় ইংল্যান্ডের শিল্প পন্য আমদানী করে এ দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি হয়ে পড়ে পুরোটাই ভূমি ও কৃষিভিত্তিক। কৃষি অর্থনীতিকে কোম্পানী বাণিজ্যিকিকরণ (Commercialization) করে। কোম্পানীর কৃষি বাণিজ্যির ফলে বাংলা থেকে প্রচুর পরিমাণ অর্থ সম্পদের নির্গমন পথ তৈরি হয় যা Drain of wealth নামে পরিচিত। অক্টোপাস শিকারকে যেমন বহু কর্ষিকা দিয়ে চেপে ধরে রস পান করে, তেমনি সম্পদ শুষে নেবার জন্য অক্টোপাসরুপী ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ব্যবহার করে এর বহু কর্ষিকা। বাংলা বাণিজ্য থেকে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এবং কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা থেকে আহরিত সম্পদ বাংলা থেকে ইংল্যান্ডে ইংরেজরা পাচার করে। বাংলার শিল্প, বাণিজ্য ও সামগ্রিক অর্থনৈতিক ঐতিহ্য ধ্বংস হয়ে যায়। অর্থনৈতিক দিক থেকে তৎকালীন ভারত বর্ষের সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী প্রদেশ বাঙলা ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক শোষণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে দরিদ্র দেশে রুপান্তরিত হওয়ার পথ উন্মুক্ত হয়।

অবশ্য এদেশে ইংরেজ আধিপত্যের কিছু ইতিবাচক দিকও লক্ষ্যণীয় ছিল। ইংরেজ শাসনের প্রভাবে এ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে নতুন গতি পায়। বাংলার ইতিহাসে মধ্যযুগের অবসান হয়ে আধুনিক যুগের সূচনা হয়। কৃষি ও শিল্প আধুনিকতার স্পর্শ পায়। তারা আমেরিকা ও আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে নতুন নতুন ফলমূল ও খাদ্যশস্য আমদানির মাধ্যমে বাংলার ফলসম্পদকে সমৃদ্ধি করে। বাংলা তথা ভারতসহ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে নতুন নতুন অনেক শহর প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠার পর বাংলা পথঘাট নির্মাণ করা হয়। সাম্রাজ্যের সর্বত্র ইংরেজ সেনাবাহিনী দ্রুত গমনাগমনের প্রয়োজনীয়তায় যোগাযোগ ব্যবস্থার অনেক উন্নয়ন করা হয়। ইংরেজ সরকারের প্রচেষ্টার ফলেই বাংলায় সর্বপ্রথম রেলপথ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাছাড়া বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ ও ডাক বিভাগের সংস্কারও তাদের দ্বারা সম্ভব হয়। বাংলার অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্য ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। ইউরোপীয় বণিকরা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এ দেশে বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী আমদানি করে এবং এদেশে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বিভিন্ন দেশে

রপ্তানি করে। সমগ্র বিশ্বে বাংলার বর্হিবাণিজ্য সম্প্রসারিত হয়। ফলে এ বাণিজ্যবিপ্লব বিশ্ববাণিজ্য ও বিশ্ব অর্থনীতির গতি পরিবর্তনের এক নতুন দিগন্ত উম্মোচন করে। বাংলা তথা ভারতবর্ষে খ্রিস্টান মিশনারীরা বিভিন্ন কার্যাবলীর মাধ্যমে খ্রিষ্টধর্মের প্রচার ও প্রসার ঘটায়। কোম্পানী আমলে বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঘটে। যা কোম্পানীর শাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য দিক হিসেবে পরিগণিত হয়। বাংলা সাহিত্যের বিবর্তনে ইংরেজ কর্মচারী ও মিশনারীদের অবদান অপরিসীম। শাসন কার্যের সুবিধার জন্য ইংরেজ কোম্পানী কর্মচারীদের বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে, ব্যাকরণ প্রকাশ করে। জোনাথান ডানকান, হেনরি ফরস্টার প্রমুখ ইংরেজ লেখকগণ একাধিক আইন গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করে। ইংরেজ সিভিলিয়ানদের উদ্দেশ্যে প্রথমে বাংলা গদ্যে কিছু টেকস্ট বুক লেখা হয়। বিদেশিদের অনুসরণ করে এ দেশের লেখকরাও প্রাচ্যবিদ্যার গবেষণা করতে পারদর্শী হয়ে উঠে। এ দেশের মানুষ বিদ্যাকে শুধু ভক্তিমূলক না ভেবে যুক্তিমূলক দৃষ্টিতে দেখতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলা তথা বিশ্বে জ্ঞানবিজ্ঞানের সাথে সাথে মানুষের মন শিক্ষার দিকে ঝুঁকে পড়ে। ইংরেজ বণিকদের সাথে ব্যবসা সংক্রান্ত কথাবার্তা বলার প্রয়োজনে বাঙালিদের ইংরেজি ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ইংরেজ শাসন প্রবর্তনের ফলে এ প্রয়োজনীয়তা আরও বেড়ে যায়। ক্রমে দেশের সর্বত্রই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। ইউরোপীয়দের প্রচেষ্টায় সর্বপ্রথম এ দেশের মুদ্রণ যন্ত্রের প্রচলন শুরু হয়।

ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বণিকদের দীর্ঘ দিনের অবস্থান ও এদেশের মানুষের সাথে মেলামেশার কারণে তাদের ভাষার অনেক শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে। বাঙালিদের ব্যবহারের অনেক জিনিসপত্রও বাংলা ভাষায় ইংরেজি নামে পরিচিত হয়। যেমন-স্কুল, কলেজ, স্টীমার, পাশ, ফেল, ফুটবল, মাস্টার, ডাক্তার, হাসপাতাল, ভিজিট, ইউনিয়ন, রেকর্ড, নার্স, লাইব্রেরী, পেনসিল, চেয়ার, টেবিল, আদম, এ্যালবাট্রোস, অ্যাপেল, ব্যাকটিরিয়া, বাজার, কর্ণেল, কেটলি, কেরোসিন, শার্ট, প্যান্ট, টেলিভিশন, রেডিও, ফোন, অফিস, পেপার ইত্যাদি।

পরিশেষে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আধিপত্যের ফলে বাহ্যিক চাকচিক্যের মত বাংলার কিছু সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য অবস্থার উন্নয়ন ঘটলেও এই বাণিজ্য নীতির ফলে বাংলায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই নীতির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্বে এমন সব সমস্যার সৃষ্টি করে যা ছিল বাঙ্গালির সামাজিক সত্তা ও স্বকীয়তার প্রতি মারাত্মক চ্যালেঞ্জ। প্রথম পর্বে অত্যাচার, শোষণ, দ্বিতীয় পর্বে সামাজিক উলটপালট, তৃতীয় পর্বে

পুরাতনকে ভেঙে পশ্চিমের ছাঁচে নতুন গড়ার সংকল্প সবই ছিল বাঙ্গালির ইতিহাস বহির্ভূত চর্চা। পলাশী বক্সার উত্তর যুগে দেওয়ানী তথা ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী আমলের বাণিজ্য নীতি ছিল আরও অনেক শোষণমূলক যা ঔপনিবেশিক আমলে তা ধারবাহিকতা ভিন্ন আঙ্গিকে অব্যাহত ছিল।

বাংলায় ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক নীতি শীর্ষক গবেষণাটির শেষে এ কথা সুস্পষ্টভাবে বলা যায় যে, সপ্তদশ শতকের শুরুতে বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার উদ্দেশ্যে যে কোম্পানীর আগমন সেই সংগঠনটি পরবর্তীতে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বীজ বপন করে। তাই ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার ইতিহাস অধ্যয়নের ক্ষেত্রেও এ গবেষণাটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেহেতু বর্তমান গবেষণাটি শুধু বাংলায় ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার মধ্যে সীমাবদ্ধ তাই সমগ্র ভারতবর্ষে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য, রাজনীতি, ভূমি সংক্রান্ত কার্যকলাপ, অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতিসহ অন্যান্য কর্মকাণ্ড বিষয়ে গবেষণা সম্পন্ন করলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ ফুটে উঠবে। তাছাড়াও পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ফরাসি বণিকদের বাণিজ্যিক নীতি এবং বাংলা তথা ভারতবর্ষে তাদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভূমিকা গবেষণা করা প্রয়োজন।

গ্রন্থপঞ্জি

প্রাথমিক উৎস

বাংলা গ্রন্থাবলী

বাবুর, জহির উদ্দীন মুহম্মদ, বাবুরনামা, দ্বিতীয় খন্ড, অনু. প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ। ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩।

বারানী, জিয়াউদ্দিন, তারিখ-ই-ফিরুজশাহী, অনু. গোলাম সামদানী কোরায়শী। ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮২।

ফজল, আবুল, আইন-ই-আকবরী ও আকবরের জীবনী, অনু. পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। ঢাকা : দিব্যপ্রকাশ, ২০০৮।

কৌটিল্য, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, অনু. সুকুমার শিকদার। কলকাতা : অনুস্টপ, ২০০৫।

ফিরিস্তা, মুহাম্মদ কাশিম, ভারতে মুসলিম বিষয়ের ইতিহাস, অনু. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ। ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭।

সলিম, গোলাম হোসেন, রিয়াজ উস সালাতিন, অনু. আকবর উদ্দিন। ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪।

সিরাজ-মিনহাজ-ই, তবকাত-ই-নাসিরী, অনু. আবুল কালাম মোহাম্মদ জাকারিয়া। ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩।

প্রাথমিক উৎস

ইংরেজি গ্রন্থাবলী

Allami, Abul Fazl, Ain-I-Akbari, Vol-II Tr. Colonel HS, Jarrett & Sir Jadu-Nath Sarkar, Calcautta ; Royal Asiatic Socity of Bengal, 1949.

Barani, Ziauddin. Tarikh-i-Firuzshahi, translated by H.M. Elliot, The History of India As told by its Own Historians, vol.Ill, Trubner Company, London 1871.

Batutah, Ibn , Account of Bengal, Tra, Harinath De, ed. Pranabendr Nath Ghosh, Calcautta: Prajna. 1978.

Bernier, Francois, Travels in the Mogul Empire, A. D). 1656-1668, Delhi : Low Price Publication, 1999.

Fazl Abul, Ain-i-Akbari. vol.11 (Trans by H.S.Jarrett). The Asiatic Society. Calcutta, 1949.

Gladwin, Francis. A Narrative of Transaction in Bengal. Stuart Press & Company. Calcutta, 1788.

Jahangir, Emperor of Hindustan, The Tuzuk-i-Jahangiri or Memoirs of Jahangir, translated by Alexander Rogers. 2 vols. Royal Asiatic Society, London, 1909-1904.

Marcopolo, The Travel Marcopolo, ed. Sir E. Denison Ross and Eileen power. London: George Routledge & Sons, Ltd, 1931.

Salim, Ghulam Husain. Riyaz.u-s-Salatin, translated by Maulvi Abdus Salam, The Asiatic Society. Calcutta. 1902.

গৌণ উৎস

বাংলা গ্রন্থাবলী

আনসারী, মুসা, ইতিহাস : সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনা। ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯২।

আলিম, এ.কে.এম. আবদুল, ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস, ৭১০-১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দ। ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩।

আলী, ওয়াজেদ, ইউরোপের ইতিহাস, ১৪৫৩-১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দ। অধুনা প্রকাশন, ২০০৫।

বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস, ১৭৫৭-১৯৪৭। ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০০।

আলী, সৈয়দ আমীর, এ শর্ট হিস্ট্রি অব স্যারাসিনস, অনু. আহসান হাবিব, কলিকাতা : মল্লিক ব্রাদার্স ১৯৯৭।

আহমদ, ওয়াকিল, বাংলায় বিদেশী পর্যটক, ৩য় সং.। ঢাকা : গ্লোব লাইব্রেরী প্রাঃ লি., ২০০০।

আহমেদ, ইমতিয়াজ, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পর্তুগিজ বাণিজ্য। ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৮।

আহসান, সৈয়দ আলী : যখন কলকাতায় ছিলাম। ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২০০৪।

ইমামুদ্দিন, এস.এম. মুসলিম স্পেনের রাজনৈতিক ইতিহাস। ঢাকা : খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি, ২০০১।

ইসলাম, কাবেদুল, প্রাচীন বাংলার জনপদ ও জনজাতিগোষ্ঠী। ঢাকা : উত্তরণ, ২০০৪।

ইসলাম, সিরাজুল, বাংলার ইতিহাস : ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো, ১৭৫৭-১৮৫৭। ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪।

ইসলাম, নজরুল, বাংলায় হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক। কলিকাতা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., ১৪০২ বা.।

করিম, আবদুল, মোগল রাজধানী ঢাকা, অনু. ড. মোহাম্মদ মুহিবুল্লাহ, ছিদ্দিকী। ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৩।

মুর্শিদকুলী খান ও তাঁর যুগ, অনু. মোকাদ্দেসুর রহমান, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯।

গিব, এইচ,এ.আর, ইবনে বতুতার ভ্রমণ কাহিনী, অনু. খুররম হোসাইন, টাঙ্গাইল : ক্যাবকো বিসিক শিল্পনগরী, ২০০০।

ঘোস, এস প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস, কলিকাতা : জে.এন ঘোস এন্ড সন্স, ১৯৯৫।

চট্টোপাধ্যায়, তপন মোহন, পলাশীর যুদ্ধ, দ্বিতীয় সং.। কলকাতা : নভানা, ১৯৫৬।

চৌধুরী, আবদুল মমিন, প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি। ঢাকা : বর্ণায়ন, ২০০২।

চৌধুরী, কমল, কলকাতা বণিক সমাজ। কলকাতা : প্রেস এ্যাণ্ড প্রোসেজ স্টুডিও, তা.বি.।

চৌধুরী, কিরণ চন্দ্র, ইউরোপের ইতিহাস, ১৪৫৩-১৮১৫। কলিকাতা : মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৩।

চৌধুরী, সুশীল, পলাশীর যুদ্ধ ও সিরাজউদ্দৌলা, বাংলার ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় সং. সম্পা. সিরাজুল ইসলাম। ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭।

আঠার শতকে ইউরোপীয় কোম্পানি ও রপ্তাণি বাণিজ্য, বাংলার ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় সং., সম্পা. সিরাজুল ইসলাম। ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭।

চট্টোপাধ্যায়, তপন মোহন, পলাশীর পর বক্‌সার। কলিকাতা : ত্রিবেণী প্রকাশন প্রা.লি., ১৩৭১ বাং.।

চট্টোপাধ্যায়, সতীন্দ্রমোহন, কালিকট থেকে পলাশী। কলিকাতা : সাহিত্য সংসদ, ১৯৬৯।

জাফর, শামসুদ্দীন আবু, বাঙ্গালীর আত্মপরিচয়, আবহমান বাংলা, সম্পা. মুস্তফা নূরউল ইসলাম। ঢাকা : অন্যপ্রকাশ, ১৯৯৯।

টেলর, জেমস, কোম্পানী আমলে ঢাকা, অনু. মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮।

তরফদার, মমতাজুর রহমান, হোসেন শাহী আমলে বাংলা ১৪৯৪-১৫৩৮, একটি সামাজিক রাজনৈতিক পর্যালোচনাা, অনু. মোকাদ্দেসুর রহমান। ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০১।

পত্রী, পূর্ণেন্দু, পুরনো কলকাতার কথাচিত্র , দ্বিতীয় সং.। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮২।

পণ্ডিত, রামাই, শুণ্য পুরাণ। ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায়, সম্পা.। কলিকাতা : ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৭।

ফারুক, আব্দুল্লাহ, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস। ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪।

ফিশার, এইচ.এ.এল, ইউরোপের ইতিহাস, ১৫০০-১৮০০, অনু. আরশ্াদ আজিজ। ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২০০৮।

বসু, শ্যামাপ্রসাদ, মুশিদকুলি খাঁর আমলে বাংলা ১৭০০-১৭২৭। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪।

বার্ট, এফ বি ব্রাডলী, প্রাচ্যের রহস্য নগরী, অনু. রহীম উদ্দীন সিদ্দিকী। ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশনালয়, ২০০৬।

বাংলা পিডিয়া, ১ম খণ্ড। ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩।

বাংলা পিডিয়া, ২য় খণ্ড ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৪।

বাংলা পিডিয়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড। ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৪।

বাংলা পিডিয়া, ৭ম খণ্ড। ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩।

ব্যানার্জ্জী. জে. আর, ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস। কলিকাতা : বুক ল্যাণ্ড, ১৯৪০।

বাংলার কৃষক বিদ্রোহ ও মধ্যবিত্তশ্রেণি, আবদুল বাছির।

মজুমদার, রমেশ চন্দ্র, বাংলা দেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, প্রাচীন যুগ, সপ্তম সং.। কলিকাতা : জেনালের প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯২।

বাংলাদেশের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, মধ্যযুগ। কলিকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৭।

বাংলার ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, আধুনিক যুগ চতুর্থ সং. কলিকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রা. লি., ১৯৯৬।

মতিন, আবদুল, ইউরোপের দেশে দেশে। ঢাকা : সাহিত্যিকা, ১৩৬৭ বা.।

মাইতি, প্রভাতাংশু, ভারত ইতিহাস পরিক্রমা, প্রাগৈতিহাসিক যুগ-১৭০৭ খ্রী., চতুর্থ সংস্করণ। কলকাতা : শ্রীধর প্রকাশনী, ১৯৯৪।

মামুন, মুনতাসীর, ঢাকার মসলিন। ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, তা.বি.।

মিত্র, সতীশ চন্দ্র, যশোর খুলনার ইতিহাস, ২য় খ., ২য় সং.। কলকাতা : দাসগুপ্ত এ্যান্ড কো.প্রা.লি., ১৯৬৫।

মিত্র,সুধীর কুমার, হুগলী জেলার ইতিহাস। কলকাতা : শিশির পাবলিশিং হাউস, ১৩৫৫।

মুখোপাধ্যায়, সুখময়, বাংলা ইতিহাসের দু'শো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল, ১৩৩৮-১৫৩৮। কলিকাতা : ভারতীয় বুক স্টল, ১৯৮৮।

মুখোপাধ্যায়, সুবোধ কুমার, বাংলার আর্থিক ইতিহাস, অষ্টাদশ শতাব্দী। কলিকাতা : কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ২০০১।

রহমান, এ.এইচ.এম.শামসুর, স্পেনে মুসলমানদের ইতিহাস, ৫ম সং.। ঢাকা : স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৪০২ বা.।

রহিম, মুহম্মদ আবদুর, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ১২০৩-১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দ, অনু. মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫।

রহিম, মুহাম্মদ আবদুল, বাংলাদেশের ইতিহাস। ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৭ ও অন্যান্য।

রায়, অজয়, বাঙালির জন্ম, আবহমান বাংলা, সম্পা. মুস্তফা নূরউল ইসলাম। ঢাকা : অন্যপ্রকাশ, ১৯৯৯।

রায়, অতুল চন্দ্র, ভারতের ইতিহাস ১৭০৭-১৯৫০। কলিকাতা : মৌলিক লাইব্রেরী, ১৯৮১।

রায়, অনিরুদ্ধ, মুঘল ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস। কলকাতা : কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৯৯৬।

রায়, অসীম কুমার, বঙ্গ বৃত্তান্ত, বিদেশী পর্যটকদের লেখায় বাংলার কথা, পঞ্চম থেকে সপ্তদশ শতাব্দী। ঢাকা : দিব্যপ্রকাশ, ২০০৮।

রায়, নীহাররঞ্জন, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৪০২ বাং.।

লাহিড়ী, দুর্গাদাস, পৃথিবীর ইতিহাস, ৭ম খ. । হাওড়া : পৃথিবীর ইতিহাস কার্যালয়, ১৩২৬ ।

শাসুদ্দীন, এ.বি.এম, আধুনিক ইংল্যান্ডের ইতিহাস । ঢাকা : প্রগ্রেসিভ বুক কর্ণার, ১৯৮০ ।

সাহিদ, আবদুস, আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস, ১৪৫৩-১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ, ঢাকা : মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৭৪ ।

সাঙ, হিউয়েন, ভ্রমণ কাহিনী, অনু. খররম হোসাইন । ঢাকা : শব্দ গুচ্ছ, ২০০৩ ।

সিকদার, মোঃ আব্দুল কুদ্দুস, ইতিহাস অভিধান । ঢাকা : বর্ণায়ন, ২০০৩ ।

সিনহা, গোপাল, আধুনিক ইংল্যান্ড, প্রথম খণ্ড, টিউটর যুগ, ১৪৮৫-১৭১৪ তৃতীয় সং. । কলিকাতা : আরামবাগ বুক হাউস, ১৯৯৮ ।

আধুনিক ইংল্যান্ড, দ্বিতীয় খন্ড, স্টুয়ার্ট যুগ, ১৬০৩-১৬০৩, তৃতীয় সং. । কলিকাতা : আরামবাগ বুক হাউস, ১৯৯৮ ।

সুর, অতুল, আঠারো শতকের বাংলা ও বাঙালী । কলকাতা : সাহিত্য লোক, ১৯৮৫ ।

সেন, জহর, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস, মালই-ইন্দোনেশিয়া, কলিকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৯৬ ।

সেন সত্যেন, মসলার যুদ্ধ (ঢাকা : মুক্তধারা, ২০০৩)

সেন, সুকুমার, বঙ্গ ভূমিকা, খ্রিস্টপূর্ব ৩০০-১২৫০ খ্রিস্টপর । কলিকাত : ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, ১৯৭৪ ।

হক, মুহাম্মদ ইনাম-উল, ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাস, ৭১২ খ্রিস্টাব্দ-১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ। ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০৬ ।

হালিম, আবদুল ও নূরুন নাহার বেগম, মানুষের ইতিহাস, আধুনিক ইউরোপ, ১৪৫৩-১৬৪৮ । ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০০৫ ।

হান্টার, উইলিয়াম , দি ইন্ডিয়ান মুসলমান, অনু. আবদুল মওদুদ। ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ২০০৭ ।

হাসান, খন্ডকার মাহমুদুল, বাংলার প্রাচীন সভ্যতা ও পুরাকীর্তি । ঢাকা : শিখা প্রকাশনী, ২০০০ ।

আজাদ, ড. লেলিন, ভারতীয় সামন্ততন্ত্র ও মোগল আমলে বাংলার কৃষি কাঠামো, ইউ পি এল, ঢাকা, ১৯৮৯ ।

আহমদ. ড. ওয়াকিল, বাংলায় বিদেশি পর্যটক, ঢাকা, ১৯৯০।

ইসলাম, কাবেদুল, বাংলাদেশের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা, ২য় খণ্ড, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০২।

ইসলাম, সিরাজুল, বাংলার ইতিহাস : ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো (১৭৫৭-১৮৫৭), বাংলা একাডেমী, ঢাকা , ১৯৮৪।

ইসলাম, সিরাজুল (সম্পাদনা) বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), ১ম, ২য় ও ৩য় খন্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৯৩।

উমর, বদরুদ্দীন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাঙলাদেশের কৃষক, চিরায়ত প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৮৩।

ঘোষ বিনয়, বাংলার নবজাগৃতি, ওরিয়েন্ট লংম্যান লি: কলকাতা, ১৯৭৯।

——বাদশাহী আমল, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৮।

——বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, ১ম খণ্ড, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ১৯৫৫।

চন্দ্র, ড. বিপান (মূল) হিমাচল চক্রবর্তী সম্পাদিত, ভারতে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিকাশ, কে পি বাগচী, কলিকাতা, ১৯৯৮।

চট্টোপাধ্যায়, ড. পার্থ. বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালীর নবজাগরণ (১৮১৮-১৮৭৮), দে. ড পাবলিশিং, কলিকাতা, ১৯৭৭।

চৌধুরী, মীর ফজলে আহমদ, দলিলপত্রে পলাশীর যুদ্ধ, ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০০১।

দত্ত, রমেশ চন্দ্র (মূল) শিশিরকুমার মজুমদার (অনূদিত), দি পিজ্যান্ট্রি অফ বেঙ্গল, দীপায়ন, কলিকাতা, ১৩৯২।

দেশাই, এর আর, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমি, মানস্বিতা সান্যাল (অনূদিত) কে পি বাগচী, কলিকাতা, ১৯৯২।

বসু, স্বপন, গণ অসন্তোষ ও উনিশ শতকের বাঙলী সমাজ, পুস্তক বিপণি, কলিকাতা, ১৯৮৭।

ভূইয়া, গোলাম কিবরিয়া, বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির বিকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫।

ভট্টাচার্য, সব্যসাচী, ব্রিটিশ রাজ্যের অর্থব্যবস্থার ভিত্তি, কে.পি. বাগচী, কলিকাতা, ১৯৭৯।

ভট্টাচার্য, কুমুদকুমার, রাজা রামমোহন রায়, বঙ্গদেশের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি, বর্ণ পরিচয়, কলিকাতা ১৯৯২।

ভদ্র, গৌতম, মুঘল যুগে কৃষি-অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ, সুবর্ণরেখা, কলিকাতা, ১৩৯৮ : ইমান ও নিশান, সুবর্ণ রেখা, কলিকাতা ১৯৯৪।

মামুন, মুনতাসীর, উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িক পত্র, (১৮৪৭-১৯০৫), ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫।

মজুমদার, রমেশচন্দ্র, বাংলাদেশের ইতিহাস (আধুনিক যুগ), ৩য় খণ্ড, জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৯৬।

মওদুদ, আবদুল, মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ : সংস্কৃতির রূপান্তর নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৬৯।

মুখোপাধ্যায়, সুবোধ কুমার, প্রাক-পলাশী বাংলার সামাজিক ও আর্থিক জীবন (১৭০০-১৭৫৭), কে পি বাগচী, কলিকাতা, ১৯৮২।

——বাংলার আর্থিক ইতিহাস (অষ্টাদশ শতাব্দী) কে পি বাগচী, কলিকাতা, ১৯৮৫।

—— বাংলার আর্থিক ইতিহাস (ঊনবিংশ শতাব্দী), কে পি বাগচী, কলিকাতা, ১৯৪৭।

রব্বানী, গোলাম, উপনিবেশপূর্ব বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০০১।

রায়, রজতকান্ত, পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৯৪।

রায়, সুপ্রকাশ, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, বুক ওয়ার্লড, কলিকাতা, ১৯৮৮।

রহমান, মোকাদ্দেসুর, মুর্শিদকুলী খান ও তাঁর যুগ (অনুবাদ), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৯।

রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুর, সমাজবিজ্ঞান পরিচিতি, হাসান বুক হাউস, ঢাকা, ১৯৭৮।

শাস্ত্রী, শিবনাথ, রামতনু লাহিরী ও তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজ, নিউ এজ পাবলিশিং, কলিকাতা, ১৯০৩।

শরীফ, আহমেদ, ইতিহাস ও সমাজ চিন্তা, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০১।

সান্যাল, কমলকুমার, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সংগ্রামী কারা ? বর্ণালী প্রকাশ, কলিকাতা, ১৯৭৯।

সরকার, বিহারীলাল, তিতুমীর ন্যাশনাল বুক হাউজ, কলিকাতা, ১৩০৪।

সুর, অতুল, আঠারো শতকের বাঙলা ও বাঙালী, সাহিত্যলোক কলিকাতা, ১৯৮৫।

সিদ্দিকী, নোমান আহমদ, (মূল), সনতকুমার বসু (অনূদিত) মোঘল রাজত্বে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা (১৭০০-১৭৫০), পার্ল পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৯৪।

হাশমী, তাজুল ইসলাম, ঔপনিবেশিক বাঙলা, প্যাপিরাস, কলিকাতা, ১৯৮৫।

হাবিব, ইরফান, মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা (১৫৫৬-১৭০৭), (অনুবাদ), কে পি বাগচী, কলিকাতা, ১৯৮৫।

হক, মুহাম্মদ ইনাম-উল, বাংলার ইতিহাস (ভারতে ইংরেজ রাজত্বের সূচনা পর্ব, ১৬৯৮-১৭১৪), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯।

হুদা, মোহম্মদ, পলাশী উত্তর বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা, আশরাফিয়া বই ঘর, ঢাকা, ১৯৯১।

সিরাজুল ইসলাম, বাংলার ইতিহাস : ঔপনিবেশিক মাসনকাঠামো, ঢাকা, চয়নিকা, ২০০৮।

এ কে এম শাহনেওয়াজ, ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস : মধ্যযুগ (মোগল পর্ব) ঢাকা, প্রতীক, ২০০৭।

ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মণ, ব্রিটিশ ভারতে রাজনৈতক ও সামাজিক উন্নয়ন, ঢাকা, আজিয়িা বুক ডিপো., ২০০৫।

এম.এ. রহিম ও অন্যান্য, বাংলাদেশের ইতিহাস, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ২০১১।

মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, বাংলার ইতিহাস : ভারতে ইংরেজ রাজত্বের সুচনাপর্ব (১৬৯৮-১৭১৪), ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯।

কাবেদুল ইসলাম, ইংরেজ আমলে বাংলার প্রশাসনিক সংস্কার ও পূনর্বিন্যাস ১৭৬৫-১৯৪৭, ঢাকা, এডর্ন, ২০১০।

মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, ভারতে মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০৯।

এম. ওয়াজেদ আলী, বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস, ঢাকা, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশনা, ২০০০।

এম.এ.রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২০১১।

আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস (১২০০-১৮৫৭), ঢাকা, বড়াল প্রকাশনী, ২০০৮।

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ আহমদ খান, ভারতে বিদ্রোহের কারণ, অনুঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ঢাকা, ১৯৭৯ ।

বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩ ।

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৭৪ ।

ড. অতুলচন্দ্র রায়, ভারতের ইতিহাস, কলিকাতা, মৌলিক লাইব্রেরি, ১৯৮১ ।

সত্যেন সেন, ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের ভূমিকা, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশনালয়, ২০১৩ ।

আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, ঢাকা, মুক্তধারা ১৬৪ ।

জাফর, এস.এম. মুসলিম শাসিত ভারতে শিক্ষাব্যবস্থা, বাংলা অনুঃরশীদ আল ফারুকী, ঢাকা, ১৯৮৮ ।

গৌণ উৎস

ইংরেজি গ্রন্থাবলি

Afzal Iqbal (ed.), Selected Writtings and Speeches of Muhammad Ali, Lahore, 1944.

Ahmad Nafis, . An Economic Geography of East Pakistan. Oxford university Press. London. 1968.

Ahmed, Rafiuddin, The Bengal Muslims, 1871-1906 : A Quest for Identity, Oxford University Press. New York, 1981.

All. Md. Mobar, A Brief Survev of Muslim Rule in India. Dacca : Mullick Brother, 1969.

Amitabha Mukherjee, Reform and Regeneration in Bengal (1774-1823), Calcutta, 1964.

Anil saxena (ed.), Encyclopaedia of Indian history, New Delhi, Anmol Publication Ltd., 2006.

Animesh Mullick. Encyclopaedia of Indian History, Vol. 25, Dominant Publishers And Distributors, India, 1993.

Ascoli. F. David, Early Revenue History of Bengal and the Fifth Report. Oxford Press, London, 1917.

Azad Abul Kalam, India Wins Freedom, Delhi, Oriental Longman Publications, 1988.

Baden-Powell. B.H. Land Revenue System of India, 2 vols.. At the Clarendon Press. London, 1889.

Bagal. J.C. Peasant Revolution in Bengal, Calcutta. 1953.

Ban. Abdul, History of the Freedom Movement (1707-1947), vol.11,

Banerjee, Dr. Anil Chandra : The Agrarian System of Bengal, vol-I (1582-1793), K.P. Bagchind com. Calcutta, 1980.

Banerki, D.Q. : Early Land Revenue System in Bengal and Bihar. vol-I, (1765-1772) Longmans, Calcutta, 1936.

Bermer, F., Travels in the Mogul Empire, 1656-1668. (ed. V.A. Smith) * Oxford University Press. London, 1934.

Bhattacharya, Sukumar : The East India Company And The Economy of Bengal (1704-1740). Luzac and com. Ltd. London, 1954.

Bhattacharya, Sukumar, The East India Company and the Economy of Bengal from 1704-1740, London, Luzac, 1954. Boston. 1967.

Boxer C. R., The Dutch Seaborne Empire, 1600-1800 London : Hutchinson & Co. Ltd. 1966.

Brijen K. Gupta, Sirajuddaulah & The East India Company: 1756-1757, Laiden, E.J Brill, 1966.

Bt.. Sir George Dunber, A Historv of India, From the Earliest Times to Nineteen Thirty nine. **Vol.-l,** London: Nicholson & Watson Limited. 1949.

Buckland, C.E., Bengal under the lieutenant Governor;. Vol.1 and II, S.K.Lahiri and Company. Calcutta, 1901.

Chaiterjee, Suranjan & History of Modern India, 1707-1857,

Chanda A.N., The Sannaya.si Rebellion, Ratna Prakashan. Calcutta. 1977.

Chandra. Bipon. Nationalism and Colonialism in Modern India. Orient Longman. Delhi. 1979.

Charlesworth. Neil., British Rule and the Indian Economy. 1800-1914. Macmillan Press. London. 1982. Peasants and Imperial Rule : Agricultural and Agrarion Society in the Bomlay presidency, 1850-1935, Cambridge university press, Cambridge, 1985.

Chatterjee, Bankim Chandra. Sociological Essays: Utilitarianism and Positivism in Bengal. Translated and edited by Mukherjee. S.N. and Maddern, Marian, RDDHL, Clacutta, 1986.

Chatterjee, Sunjeeb, Bengal Ryots : Their Rights and Liabilities, K.P. Bagehi, Calcutta, 1986.

Chaudhuri, K.N., Economic Development in India under the East India Company Cambridge university press, Cambridge, 1971.

Chaudhury, K.N., The English East India Company, The study of an early Joint-stock company, London, Tylor and Francis group, 1915.

Chopra P.N., Role of Indian Muslims in the struggle for Freedom, New Delhi, Light and Life Publishers, 1979.

Choudhuri, N.H. : Peasant Radicalism in Nineteenth Centary Bengal, Asiatic society of Bangladesh, 2001.

Chowdhuri, Shoshi Boshon : Civil Disterbance During the British Rule in India (1765-1857) Calcutta, 1955.

Chowdhury B.K., Agrarian Economy and Agrarian Relations in Bengal, (1859-1885) University of Calcutta, 1967.

Cotton. H.J.S : Memorandum on the Revenue History of Chittagong, Calcutta, 1880.

Coupland, R. The Constitutional Problem in India, Oxford, 1944. Graham, L. Col, The Life and Work of Syed Ahmed Khan, Delhi, Reprint, 1974.

Datta, K.K., Studies in the History of Bengal Subah, vol. I, University of Calcutta, Calcutta, 1936.

Datta, Kalikinkar, The Dutch in Bengal and Biher, 1740-1825 D.. Patna: University of Patna, 1948.

Dutt, R.C., The Economic History of India, 2 vols. A.M. Kelley. New York, 1969.

Eastern India. Cosmo Publication. Delhi. 1976.

Eaton, Martin David, Portugal, Microsoft Encarta, DVD, Version,

Edwardes, Michael, A Histry of India, From the Earliest Times **16** the Present Day, London : The New English Library, 1967.

Firminger, W.K. Historical Introduction to the Bengal Portion of the Fifth Report (reprint). Today and Tomorrow's Pub. Delhi, 1977. (ed.) The Fifth Report from the Select Committee of the House of Commons on the Affairs of the East India Companv. dated 28" July 1812, 3 vols.. Camray and Company. Calcutta, 1917. (ed.) The Letter Copy Books of the Resident at the Durbar at Murshidabad. 1969-1770. Bensal Secretariat Press. Calcutta, 1919.

Foster, William ed., Early Travels in India, 1583-1619, New Delhi Oriental: Books Reprint Corporation, 1985.

Furnivall, J. S., Studies in the Social and Economic Development of the Netherlands East Indies, Rangoon: Burma Book Club Ltd. n.d.

Garret, J.H.E., Bengal District Gazetteer, Bengal Secretariat Book Depot, Nadia, Calcutta, 1910.

George D. Bearce, British Attitudes Towards India, 1784-1858, London: Oxford University Press, 1961.

Ghosal, H.R. Economic Transition in the Bengal Presidency, 1793-1833, Firma K.L. Mukhopadhyay, Calcuta, 1966.

Griffiths, Sir Percival, The British Impact on India, London : Macdonald, 1952.

H.H. Dodwell, Cambridge History of India, Cambridge, Cambridge University Press, 1932.

Hastings, Warren : A Letter to the Court of Directors of the East India

Hill, S.C. (ed:) Bengal in 1756-1757, John Murray. London. 1905.

Hitti, Philip K., History of the Arabs. 16th reprint, London: The Macmillan Press Ltd, 1994.

Hossain, Hamida, The Company Weavers of Bengal: The East India Company and the Organization of Textile Production in Bengal, 1750-1813, Oxford University Press. Delhi. 1988.

Hunter, W.W., A History of the British India. Vol. 1, Vol. 2, Newyork, Longmans, Green and Co., 1966.

Hanter W.W. The Indian Musalmans, Trubner, Lonon, 1871.

Hunter, W.W, History of Britsh India, Vol- 2. London Wilson Longmans Green & Co., 1899.

Hunter, W.W., Willson, The annals of rural Bengal, New York, Leypoldt and Holt, 1868.

Jones, Kenneth W. Socio-Religious Reform Movement in British India. Cambridge University Press, Cambridge. 1989.

Karim. Abdul. Murshid Quli Khan and His Times. Asiatic Society of Pakistan. Dhaka. 1963.

Kling, B.B.. The Blue Mutiny: The Indigo Disturbances in Bengal, 1959-62. Philadelphia: University of Pensyvania Press. 1966.

Long. J Adam's Report on vernacular Education in Bengal and Behar. 1835. Indian Govt. Calcutta, 1868.

Mahajan V.D., Modern Indian History, VII ed. New Delhi, S. Chand and Co. Ltd. Ramangar, 1990.

Maitra. Jayanti. Muslim Politics in Bengal. 1855-1906. K.P.Bagchi, Calcutta. 1984.

Majumdar, R.C. Sepoy Mutiny and the Indian Revolt of 1857. 2nd ed.. Firma K.L.Mukhopadhyay. Calcutta. 1963.

Mallick. A.R.. British Policy and the Muslims in Bengal. 1757-1856. Bangla Academy, Dhaka, 1977.

Martin. Montogomery. History, Antiquities, Topography and Statistics of Eastern India, Cosmo Publication, Delhi, 1976.

Mclane. John R.. Revenue Farming and the Zamindari System in Eighteenth Century Bengal. Manohar, New Delhi. 1984.

Dhaka University Institutional Repository

Michael Edwards, The Last Years of British India, World Pub. Co., 1st edition, London, 1964.

Mikhopadhyay. Calcutta, 1965.

Military Orphan Press. Calcutta, 1840.

Mitra. D.B., The Cotton Weavers of Bengal, 1757-1833. Firma K.L. Mukhopalhyay, Calcutta. 1978.

Monckton Jones, Warren Hastings in Bengal: 1772-1774, Oxford, Clarendon Press, 1918.

Monohar. Delhi. 1979.

Mookerji. R.K., Indian Land System : (Ancient, Medieval and Modern). Bangal Government press, Alipore, 1940.

Moore. Harrington, Social Origin of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World, Beacon Press. Boston, 1967

Moosvi, Shireen, The Economy of the Mughal Empire, C 1595 : A Statistical Study. Oxford University Press. Delhi, 1987.

MoreLand, W.H., The Agrarian System of Moslem India, Oriental Books (Reprint), Delhi, 1968.

Muir, Ramsay, The Making of British-India, 1756-1858, Manchester University press, London, 1923.

Mujeeb, N., Social Reform Among Indian Muslims. Delhi University, Delhi. 1968.

Mukerjee Radhakamal. Land Problems of India. Longmans Green, London. 1933.

Mukherjee, Nilmani, The Port of Calcutta. A Short History. Calcutta : The Commissioners for the port of Calcutta, 1968.

Mukherjee, Ramkrishna. The Dynamics of a Rural Society : A Study of the Economic Structure in Bengal Villages, Akademia-Verlagg, Berlin, 1957.

Mushirul Hasan, National and communal politics in India (1916-1928), New Delhi, 1979.

Nair, P. Thankappon, British Beginnings in Bengal (1600-1660), Calcutta, Punthi Pustak, 1991.

Natarajan, L., Peasant Uprisings in India, 1850-1900, People's Publishing

New Delhi. 1986.

Nisith Ranjann and Chiuabrata Palit (ed). Agrarian Bengal Under the Raj, Saraswat Library. Calcutta. 1986.

Nizami, T.A. Muslim Political Thought and Activity in India During the First Half of the 19th Century, Three Mens Publicaton, Aligarh, 1961.

Percival, Spear, *The Oxford History of Modern India.* 7975, New Delhi : Oxford University P-1988,

Philip J. Stern, The Company-State: Corporate Sovereignty and the Early Modern Foundations of the British Empire in India, USA, Oxford University Press, 2011.

Popkin. Samuel L.. The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam. University of California Press. Berkely. 1979.

Prokash, Om, The Dutch Factories in India, 1617-1623, Deli-Munshiram Monoharlal publishers Pvt. Ltd. n.d.

R.C. Majumdar. History of the Freedom Movement In India, Kolkata, Firma KLM Private Limited, 2004.

Rahim Aminur. Politics and National Formation in Bengladesh, The University Press Limited. Dhaka. 1997.

Rahim M.A., Social and Cultural History of Bengal. 1576-1757. Vol. II, Karachi: Pakistan Publishing House, 1967.

Ram Gopal. How the British Occupied Bengal. Asia publishing house, Bombay, 1963.

Ramkrishna, Mukherjee, The Rise And Fall of the East India Company, BomBay, Popular Prokashon, 1958.

Ray, Ratnalekha. Changes in Bengal Agrarian Society 1760-1850 Monohar, Delhi, 1979.

Roy, Niher Ranjan, The Dutch Activities in the East. Calcutta: The book Imperial Ltd. 1945.

Roy. Asim. The Islamic Syncretistic Tradition in Bengal, Princeton University Press. Princeton. 1983.

Roy. A.C., History of Bengal: Turko-Afgan Period. New Delhi, 1986. Kaiyani Publisher-.

Sarkar, Sir jadunaath ed., *The History of Bengal, Voi-11, Muslim Perid, 1200-1757.* Dacca : The University of Dacca, 2006.

Sen, S.N, *History of Modern India, Third Edition.*New Delhi : New Age International P. Ltd. Publishers, 2006.

Sen, Sunil : Agrarian Relations in India (1793-1947). People's Pub. House. New Delhi, 1979.

Shanin, Teodor (ed.), Peasant and Peasant Societies, Penguin Books. London 1987.

Siddhartha Guha Ray, Calcutta : Progressive Publishers, i 997. Dodwell, H. H.ed., The Cambridge History of India, **Vol.-v,** British India, **1497-1858,** Delhi : S. ('hand & Co., n.d.

Sinha Narendra K., The Economic History of Bengal, From: Pdkissev to the Permanent Settlement, Voi-l, Calcutta: Sri Lai Chand Roy Gossain & Company Private Ltd., 1956.

Sinha, N.K., The Economic History of Bengal, 2 vols., Firma K.L. Mokhopadhyay, Calcutta, 1945.

Sinha, Narendra K., *The Economic History of Bengal, From Palassey to the Permanent Settlement, Vol-1,* Calcutta : Sri Lai Chand Roy Gossain &

Sinha, Narendra Krishna, The History of Bengal 1757-1905. Caucutta, University of Calcutta, History of Bengal Publication Committee, 1967.

Sinha. Pradip., Nineteenth Century Bengal : Aspects of Social History. Firma K.L. Mokhopadhyay, Calcutta, 1965.

Sirajul Islam, History of Bangladesh 1704-1971, Vol. 3, Asiatic Society of Bangladesh, 2nd edition, Dhaka, 1997.

Sirajul Islam, The permanent settlement, Dacca, Bangla academy, Dacca, 1979.

Dhaka University Institutional Repository

Tarafdar. M.R. Husain Shahi Bengal, 1494-1538 A.D. : A Socio-Political History, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1965.

Taylor. James. A Sketch of the Topography and Statistics of Dacca, Vol-l. Military Orphan Press, Calcutta, 1840.

Tripathi. A., Trade and Finances in Bengal Presidency. 1793-1833. Oxford University Press. Calcutta. 1979.

Tripta Desai, The East Indian Company. A brief Survey from 1599-1857, New Delhi, Kanak Publications, 1984. University Press, London, 1923.

Vincent A Smith, The Oxford History of India, Oxford, Clarendon Press, 1919.

W.K Firminger, Historical Introduction to the Bengal Portion of the Fifth Report, Culcutta : Indian Studies edition, 1962.

Wise. James. Notes on the Races. Castes and Trades of Eastern Bengal Harrisaon and Sons, London, 1883.

প্রবন্ধ (ইংরেজি)

Addy, Premen and Azad, Ibne, "Politics and Culture in Bengal" *New Let Review,* No. 79, May-June. 1973.

Ahmad Imtiaz, "The Ashraf-Ajlaf Dichotomy in India", *Indian Economic and Social History Review.* Vol. Ill, No. 3, 1966.

Ansari, M.I. "Permanent Settlement of Bengal, *English Historical Review,* vol. X. 1895.

—Some Aspects of Peasant-Economy of Bengal after the Permanent Settlement". *Bengal Past and Present,* vol. 76. 1957.

Ghosal, J.C. "Rent and Land Revenue in Bengal". *Indian Journal of Economics,* vol. 10. July. 1929.

—Immediate Effects of the Permanent Settlement in Bengal", *Indian*

Journal of Economics, vol.10, April. 1930.

Grover, B.R. "Nil-Darpan: The Image of a Peasant Revolt in a Liberal

Mirror". *Journal of Peasant Studies,* vol.11. No. 2. 1974.

Hasan, S. Nurul, “The Position of the Zamindars in the Mughal Empire” Indian Economic and Social History Review, Vol.I, No.4, 1964.

— “Rural Society and British Rule in Nineteenth Century India”. Journal of Asian Studies, Vol. XXXIX, No. I. November, 1977.

Morris D. Morris, “Towards a Reinterpretation of Nineteenth Century Indian Economic History”, Indian Economic and Social History Review, Vol. V, No. I. 1968.

Sinha, J.C., “The Muhammadans of Eastern Bengal” Journal of Asiatic Society of Bengal, Vol. LXII, Part III, No. I, 1894.

পত্র-পত্রিকা (বাংলা)

সামাজিক বিজ্ঞান পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৫।

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, ১ম খণ্ড, জুন ২০০২।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ২২ সংখ্যা, অক্টোবর, ১৯৮৮।

বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৮৫।

বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ২০ সংখ্যা, ১৯৯৭।

সাহিত্য পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, কার্তিক ১৪০৮।

সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র, পঞ্চম খণ্ড, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। কলিকাতা : প্যাপিরাস, ১৯৬৩। বিনয় ঘোষ।

জামদানি, দৈনিক নয়া দিগন্ত, ৩ নভেম্বর ২০০৯, রায়, মৃত্যুঞ্জয়।

পূর্ব বঙ্গ গীতিকা, চতুর্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, কলকাতা : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩২, সেন দীনেশ চন্দ্র, সম্পা.।

আমাদের আধুনিকতা-সংকট, দৈনিক আমার দেশ, ২২ জানুয়ারি ২০১০, হাবিব, রহমান।

পত্র-পত্রিকা (ইংরেজি)

Bengal Past and Present, Vol, CIII, July-December, 1983.

Englishman, July 10,1873, July 11, 1873.

Indian Economic and Social History Review, Vol. V, No, I. 1964.

Indian Gazette, October 12, 1829.

Journal of Asiatic Society of Bengal Vol, LXII, Part III, No. I, 1894.

Modern Asian Studies, Vol, IX, Part. 1, 1974.

The Modern Review, Vol. XXXVIII, No. 4, 1925.

Websites:

www.wbpublbnet.gov.in

www.wbja.nic.in

https://www.jstor.org>stable

https://en.m.wikipedia.org>wiki>india

https://www.qdl.qa>india-office-records

www.eastindiacompany.amdigital.co.uks

discovery.nationalcrchives.gov.uk>details

https://www.wdl.org>item

https://www.theguardian.com>jal

www.rotschat.com>forum

www.bbc.co.uk>magazine-29702694

www.tanap.net>archives>archive